আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

কাজী সিরাজ

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

BANSDOC Library

কাজী সিরাজ

BANSDOC Library			
Acc. No.	১৮৬৭৫		
Call No	৪১১.৪৪ সিরাজ		
Date	১০.৬.০৪	Sign.	RK

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/জুন ১৯৯৭

বাএ ৩৫২১
(সম্মাবা উপবিভাগ, অর্থবর্ষ : ১৯৯৬-৯৭)

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
সেলিনা হোসেন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবদুর রৌফ সরকার

মূল্য
পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র

ADHUNIK BHASABIJNAN (A Philological Analysis of Bengali Language) by Kazi Siraj. Published by Selina Hossain, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : June 1997. Price : Taka 65.00 only.

ISBN 984-07-3530 X

LANSDOWNE LIBRARY
Accession No. 1/837
Date 10-6-04

সূচনা

ধ্বনির বিশাল জগত ভাষা। বিভিন্ন ধ্বনির অভিঘাতে নিস্তরঙ্গ মানুষের মনেও ছন্দের তরঙ্গপ্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই তাই ভাষা এক বিরাট রহস্যের অজ্ঞেয় আঁধার হয়ে থেকে যায় বিরাট পৃথিবীর বিভিন্ন দিকদিগন্তের মতোই। কেননা যে ভাষা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে' মন আকুল হয়ে ওঠে, সেই একই ভাষা আবার দুতিনটি শব্দের পুনর্বিন্যাসে অথবা উচ্চারণের ন্যূনতম তারতম্যের কারণে হয়তো বিপরীত অর্থ কিম্বা যন্ত্রণারও উদ্রেক করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভাষার ন্যূনতম একক শব্দ, আর শব্দের ন্যূনতম একক ধ্বনির বিভিন্ন ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গীর জন্যেই একই ভাষা বিচিত্রতর অনুভূতি সৃষ্টির কারণ। কিন্তু এই পৃথিবীর হাজার হাজার মানব গোষ্ঠীর কাছে এই ভাষা ব্যবহারে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ভাষারও। একই ভাষা তাই সারা পৃথিবীতে বংশ বিস্তারের মাধ্যমে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তা কিন্তু আরো বেশি করে এই ভাষাসমূহের ইতিবৃত্তের প্রতি আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি করে চলেছে। বস্তুতপক্ষে আদি মানব সন্তান কোন ভাষায় কথা বলতো, রহস্যের আবরণে আচ্ছন্ন এই অজানার প্রতিও আমাদের কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন, তেমনি আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা পেছনের স্মৃতি ধরে রাখবার যে চাঞ্চল্যকর অভিযান চালাচ্ছেন, তেমনি ভাষার আদি উৎসের সন্ধানেও ব্যাপৃত হচ্ছে আজকের ভাষা বিজ্ঞানীরা।

একটি ভাষার আলোচনার জন্যে সেই ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা করার ব্যাপারে ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব এই দুটিই প্রধান দিক। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি শিশু যখন প্রথম কথা শেখে তখন প্রথমেই অ, আ তারপর মা, এরপর এ জাতীয় আরো কিছু কিছু সহজ ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে তার বাক-প্রত্যংগ ক্রিয়াশীল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য শব্দ উচ্চারণে এগিয়ে আসে একটি শিশুর একটি বিশেষ শব্দের উচ্চারণই কিন্তু আমাকে ভাষাতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বের প্রতি প্রথম কৌতূহলী করে তোলে। 'পানি' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে একটি দেড় বছরের শিশু প্রথম যখন উচ্চারণ করলো সে কেবল বললো 'অম' ; কয়েক দিন পরই পানি দেখলেই বা প্রয়োজন হলেই সে উচ্চারণ করলো 'আনি' ; এর কিছুদিন পর 'মানি', ; অতঃপর শেষ ধাপে এসে 'পানি' । লক্ষণীয় হচ্ছে, একটি শিশু মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে একটি শব্দের শিক্ষাকালে কতোই না বিকৃতির মধ্য দিয়ে এগুলো। এ ছাড়া বিভিন্ন অনুভূতির (যেমন, পানি খাবার প্রয়োজন হলে এক রকম, হাত দিয়ে খেলবার সময়ে আরেক রকম, পানি দেখে ভয় পেলে আবার আরেক রকমভাবে উচ্চারণ) প্রকাশ হিসেবে তার উচ্চারণের পার্থক্য এ কেবল ঐ শিশুর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাষার সচল গতিস্রোতে এ ভাবেই কেবল বাঁক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে চলেছে। ভাষা সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনা এ কারণেই আমার ভালো লাগতো বলে আজ এ গ্রন্থের সূচনা। এই বিশেষ গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকাটা তাই খুবই স্বাভাবিক।

Accession No. 18375

আমি ১৯৬৮-৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ উপমহাদেশের স্বনামধন্য ধ্বনিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় দেড় বছরের মতো বাংলা ভাষাতত্ত্বের উপর গবেষণা কার্য চালিয়ে যাই। এই সময়ে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহযোগিতা লাভ করি। ফলে বিষয়টির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করা আমার জন্যে সহজ হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তের কিছু চিন্তা এবং পরবর্তীকালের কিছু ভাবনা এই গ্রন্থ রচনার পেছনে আমাকে তাড়িত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবু জাফর ও মনসুর মুসা, আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক ফজলুর রহমান, অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক সরফুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক কবির মজুমদার এবং আমার কয়েকজন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুজনের প্রেরণায় শেষ অব্দি গ্রন্থটি এই পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলো নিয়ে বহুবার ভেবেছি; ভাবতে ভাবতে এর দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার হয়েছে উন্মোচিত — আরো গভীরভাবে অধিকতর উৎসাহ নিয়ে ভাববার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে মনোরাজ্যে।

এ গ্রন্থের মান এবং উপযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের বিবেচ্য। পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লেখা বলে অবাস্তব ও অযথা অনাবশ্যক বিষয়ে অবতারণা থেকে বিরত থেকেছি। তবে যেটুকু বলা হয়েছে, তাতে কোনো ফাঁক নেই। সহজভাবে বোধগম্য ক'রে লিখবার চেষ্টা সর্বত্র লক্ষণীয়। স্থানে স্থানে আমার দুজন শিক্ষাগুরু মরহুম প্রফেসার মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের "ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের "ভাষাতত্ত্ব" গ্রন্থদ্বয়ের সাথে কোনো কোনো বিষয় হুবহু মিলে গেলেও অবাক হবার কারণ থাকবে না, কেননা তাঁদের শিক্ষা যথাযথ মনে রাখবার চেষ্টা করেছি সর্বদা।

এ গ্রন্থ প্রকাশিত অবস্থায় দেখবার আনন্দ নির্মল হবে, যদি গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের কিছু না কিছু উপকারে লাগে। যে কোনো মতামত সাদরে গ্রহণযোগ্য।

কাজী সিরাজ

সূচিপত্র

ভাষাতত্ত্ব

ভাষা ১
ভাষাতত্ত্ব : এর পরিধি ও বিবর্তন ৮
তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ১৭
ধ্বনি পরিবর্তন ১৯
ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র ২৩
শব্দতত্ত্ব ৩৬
ভাষার শ্রেণীবিন্যাস ৪৬
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ৫৩
সন্ধি ৬২
রূপতত্ত্ব ৬৬
বাক্যতত্ত্ব ৭২
বাংলা বাক্যের সংগঠন ৭৫
বাংলা পদ বিচার ৮৬
লিঙ্গ ৯০
বচন ৯১
কারক ও বিভক্তি ৯৩
উপসর্গ ৯৬
কৃৎ ও তদ্ধিত অনুসর্গ ৯৯
সর্বনাম ১০১
সর্বনামজাত ও ক্রিয়া বিশেষণ ১০৭
বাংলা সংখ্যা শব্দ ১০৯
ধাতু, ক্রিয়া ও তার কাল ১১৮

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি ১৩৭
ধ্বনি বিজ্ঞান ১৩৯
বাক্‌প্রত্যঙ্গ পরিচিতি ১৪৩
বাংলা স্বরধ্বনি ১৪৭
বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ১৬৪
বাংলা ভাষা স্পর্শধ্বনি ১৭৬
বাংলা ভাষায় কম্পনজাত ধ্বনি ১৮৬
বাংলা ভাষায় উষ্মধ্বনি বা শিসধ্বনি ১৯১
বাংলা ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ১৯৪
ভাষায় অক্ষর ও বাংলা শব্দের প্রতিকৃতি ১৯৭
ধ্বনিগুণ ২০৩
বাংলা বানান ২০১
গ্রন্থপঞ্জি ২১৫

RAMDOO Library

ভাষা

অনেক অনেক দিন আগে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবারও অনেক আগের কথা। স্রষ্টা যখন এক থেকে বহু হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন মাত্র, তখন একদিন তিনি একটি ধ্বনির সৃষ্টি করলেন 'কুন' আর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তারপর গাছপালা, জীবজন্তু মানবসমাজ।

সেই আদিভাষা পরবর্তীকালে মানবের প্রয়োজনে নেমে এলো। বিশ্বের প্রথম মানব–মানবী কোন ভাষায় কথা বলতেন, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। তাঁদের মুখনিঃসৃত ধ্বনিগুচ্ছ, হাতের ইঙ্গিত, ইশারা নিশ্চয়ই একের মনের অনুভূতিকে অন্যের মনে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে থাকবে। ধর্মীয় দিক থেকে এটাই মুসলমানদের বিশ্বাস। অন্যান্য ধর্মে অবশ্য এর অন্য রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে রুশোর (Rousseau) সামাজিক চুক্তির (Social Contract Theory) মতেই মানবের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের মুখনিঃসৃত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি পরস্পর পরস্পরের চিন্তা–ভাবনা, ধ্যান–ধারণা, অনুভব-অনুভূতিকে যদি এক মন থেকে অন্য মনে প্রচার করে দেবার জন্যে অর্থবহ শব্দের সৃষ্টি করে, তার নাম ভাষা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে এই ভাষার মূল্য অপরিসীম। গতিমান জীবনে অবশ্য এই ভাষাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাই এর গুরুত্ব পৃথকভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কেউ দেখি না। আর এ কারণেই এই ভাষা নিয়ে বিশদ আলোচনার আবশ্যিকতা আমরা তেমন অনুভব করি না। ভাষার যথার্থ সংজ্ঞা (definition) দেয়াও এ কারণেই আজো হয়ে ওঠে নি। মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিদ বার্নার্ড ব্লক এবং জর্জ এল. ট্রেগারের মতে ভাষা হচ্ছে :

"A Language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group co-operates."

আরো একজন মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে :

"A Language is a structural system of arbitrary vocal sounds, and sequences of sounds which is used, in interpersonal communication by an aggregation of human beings, and which rather exhaustively catalog the things events and processes in the human environment."

এখানে আশ্চর্যভাবে কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনিগুলোকেই কেবলমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আকারইঙ্গিত, হাবভাব এগুলোর কোনো স্থান ভাষায় নেই। আমরা কথায় কথায় বলি — প্রকৃতির ভাষা, আকাশ কিংবা বাতাসের ভাষা অথবা চোখের ভাষা, মুখের ভাষা ইত্যাদি। ক্যারলের মতে ভাষা কেবল "Structural system of arbitrary vocal sounds and sequences of sounds."

ড. সুকুমার সেন ভাষাকে জন্মসূত্রে পাওয়া সম্পদ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভাষা এতোই স্বাভাবিক যে, ভাষা আমাদের প্রতিদিনের চলাচলন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো

সহজাত প্রবৃত্তি বলেই মনে হয়। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর বিবিধ মানসিক ও সামাজিক ধারণার মতোই তা জন্মাবধি অধিগত হয়ে যায়। শিশুমনের বৃদ্ধি তার ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় বলে মাতৃভাষা শেখার মুহূর্তে সে কখনোই সজ্ঞান চেষ্টা অনুভব করে না।

মানুষ সামাজিক জীব। ভাষা মানুষের গোষ্ঠী ও সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার ভাব, উদ্দেশ্য এবং কর্মগত সমতা সাধন করে। পশুর সমাজ নেই। তাই পশুর কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি তার জীবনধারণের পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক বলে তা ভাষা নয়। সুতরাং **"মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।"**[১]

অন্যভাবে বলা যায়, **"মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"**[২]

"মানুষের উচ্চারিত, নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টিই হচ্ছে ভাষা।"[৩]

মুখের ভাষা, বইয়ের ভাষা ইত্যাদি

ব্যবহারিক দিক থেকে ভাষাকে আমরা পাই বিভিন্ন ভাবে। যেমন, কথা বলার সময়, ভাষাকে উচ্চারণগত ভাবেই হোক কিংবা বলার ভঙ্গির দিক থেকেই হোক আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, সেই একই ভাষাকে যখন সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলা হয় তখন তা অনেকাংশে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য আরো লক্ষণীয়। এভাবে ভাষার শ্রেণিবিভাগ নির্ণীত হয়েই চলেছে যুগ যুগ ধরে।

তা ছাড়া নানা কারণে ভাষা তার নিজস্ব গতিপ্রবাহে নদীস্রোতের মতোই কেবল দিক পরিবর্তন করে চলেছে। ভাষার বিবর্তন এভাবেই হয়ে থাকে। একজন পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর গবেষণায় জানতে পেরেছেন, প্রতি দশ মাইলে ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, উচ্চারণগত কিংবা ঝোঁক (intonation) ইত্যাদির ন্যূনতম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

তবু ভাষা বলতে মূলত মুখের ভাষাকেই বোঝায়। অর্থাৎ পরস্পর সামনাসামনি কথা বলাকেই বোঝায়। আর লেখ্য ভাষা যেনো মুখের ভাষার স্থায়ী প্রতিনিধি। মুখের ভাষা যেহেতু বক্তা আর শ্রোতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপক, ভাব বিনিময়ের বাহক, সে কারণে আবেগ–অনুভূতি কিংবা উত্তেজনায় তার উচ্চারণে ও ব্যবহারে একটা সচলতা সর্বদা বিরাজমান; বইয়ের ভাষায় কেবলমাত্র লেখকের নিজস্ব বাকরীতির একটি স্থায়ী স্বরূপ পরিবেশিত হয়, যা পরিবর্তনশীল নয়। বেতার, টেলিভিশন, ছায়াচিত্র কিংবা গ্রামোফোন বা টেপ রেকর্ডারের ভাষা প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। বক্তা শ্রোতার কাছে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেই নিশ্চিন্ত, প্রতি উত্তরে শ্রোতাকে একেবারে নীরব ভূমিকা পালন করতে হয়, যদিও বক্তার মনোভাব প্রকাশের সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতার অনুভূতি যথেষ্ট রকম নাড়া দিতে সক্ষম।

---

১. ড. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত
২. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার : সরল ভাষা একাংশ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
৩. অতীন্দ্র মজুমদার : ভাষাতত্ত্ব

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোনো সুনির্দিষ্ট সাধারণ রূপ নেই. বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে তাই কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। **"ভাষার কাছে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীকে বলে ভাষাসম্প্রদায়"** (Speech Community).[১] আর এই ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা আঞ্চলিকভাবে একেকটি ছোট অঞ্চলে বিভক্ত জনসমষ্টির প্রায় একইভাবে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত ভাষাছাঁদকে উপভাষা (dialect) বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার একটি সাধু রূপ রয়েছে, যা কেবলমাত্র বইয়ের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন —

গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার — অবেণী সম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না — তথাপি মেঘ বিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, যাহা বলিতে পারা যায় না অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকাশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদি সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

শচীকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দৃশ্যমধ্যে দেবীমূর্তি দেখিয়া নিস্পন্দ শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বাকশক্তি রহিত হইল.— স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রমণীও স্পন্দনহীন, অনিমেষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রহিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপ বহুক্ষণ দুইজনে চেষ্টায় রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক : তুমি পথ হারাইয়াছ?"[১]

বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে আরো একটি ভাষারূপের সন্ধান মিলবে, যা বর্তমানে বাঙালি সমাজের মুখের প্রচলিত ভাষা (Standard dialect), ইদানীংকালে সাহিত্যের ভাষা হিসেবেও যা স্বীকৃত।

১. ঘাটের তাঁবুতে রেখেই কি করবে? ভাবছি — এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "Boy, গাড়ি যে এনে রেখেছ?"

পাশের ঘর থেকে উত্তর এলো — "যো হুকুম।"

তিনি বললেন, "এতো তাড়া কেন? এ হাওয়া খেলেই যাও না।"

সীতেশ। "বেশ! দেখছ না কত রাত হয়েছে! আমি আর এক মিনিটও থাকব না। এমনিই তো [illegible] দিয়ে বকুনি খেতে হবে।"

---

১. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "কার কাছে?"

পীতেশ। "স্ত্রীর—"

সোমনাথ উত্তর করলেন, "ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারো নেই?"

পীতেশ "তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে তোমরা কখন আস যাও, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।"

সেন বললেন, "সে কথা ঠিক তবে একদিন একটু দেরী হয়েছে, তার জন্য —"

পীতেশ। "একটু দেরি! আমার মেয়াদ আটটা পর্যন্ত — আর এখন দশটা। আর এতো এক দিন নয়, প্রায় রোজই বাড়ি ফিরতে তেপ পড়ে যায়।"

"আর রোজই বকুনি খাও? তাহলে সে বকুনি তো গায়ে লাগবার কথা নয়। এতদিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায় নি?"[১]

২. নেপথ্যে : নন্দিনী, তুমি কি জান? — বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী : ও কি বলছো তুমি!

নেপথ্যে : তোমার ওই রঙকরবীর আভাসটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারিনে কেন? সামান্য পাপড়ি কটা আঁচল চাপা দিয়ে বার দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে কোমল বলেই কঠিন ...

আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কি মনে হয়, খুলে বলো তো।[২]

কিন্তু বাংলার এই স্বীকৃত উপভাষাটিও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়ে অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আঞ্চলিক ভাষার (local dialect) সৃষ্টি করেছে।

আঞ্চলিক ভাষার একটি নমুনা দিচ্ছি, একই অর্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কিভাবে রূপান্তরিত ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তা দেখা যাবে এখনে :

বোকাইনগরী সাহেব বিলেত গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'কেলকাতা শহরে গেলাম। উড়ো জাহাজের মধ্যে গিয়ে উঠে বসলাম। উড়ো জাহাজ ছুটলো। আকাশ দিয়ে বোঁ বোঁ শব্দ করে যেতে যেতে একেবারে বিলেতের শহরটির মধ্যে নামলো।' বোকাইনগরী সাহেব জাহাজ থেকে নামলেন। বিলেতের শহর দেখে তো তিনি অবাক। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, দলানে ভরা, কি কলকে, যেমন নাজিরগঞ্জের বাজারটি।

বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করে এর ভিন্নতর রূপের সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

ক. ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করা হলো (বিশেষভাবে কেন্দুয়া, মদন থানার অন্তর্গত) :

বোয়াইনগরী সাব বিলাত গেছলাইন। তাইন কইন, 'কইলগত্তা শরঅ গেলাম। উড় জাজ্জর মুইদ্যে উইঠ্যা গেয়া বইলাম। উড়াজাজ্জ, হুঁপ্পো। আসমান দা ঘুঁত ঘুঁত ঘুঁত ঘুঁত আওয়াজ কইর‍্যা যাইতে যাইতে অকখবারে বিলাতের শহরের মুইধ্যে গেয়্যা নামলা।' বোয়াইনগরী সাব আঁইত্তা লামলাইন। বিলাতের শহর দেইক্যাত তাইন তাইজ্জব। তাইন কইন, "ইয়া আল্লা, দলানে বরা, কি কইহাম, যেমন নাজিরগনজের বাজ্জার।"[৩]

---

১. প্রমথ চৌধুরী : 'চার – ইয়ারি কথা'

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রক্তকরবী' পৃ. ২২ ২৩, বিশ্বভারতী ১৯৬৬

৩. আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করেছেন অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত করা হলো :

[boa:i no:ri sab bilat gechlain I tain koin, "koilgatta: ʃɔ:rɔ gælam I uʃa dzadzar muidhe uitt geya boilam I uʃɔ dzadz

challo a:sman dæ but but but but a:oæ:dz kɔ iræ:dz kɔ iræ zaite zaite akkhobare bila:ter ʃɔ ddar muikke gea: la:mlo I " boa:i n :ri sab dzadz tt lamla:in I bilater ʃɔ r deikæ tc ta:in taidzadz b I tain koin, "ia: alla:, dolane b ra: , ki kaibam--zæm n. nadzir g :ndzer ba:za: ddɑ :".]

ঘ. সাধারণ সিলেটি ভাষায় রূপান্তরিত :

বুখাই নগরী সব বিলাত গেছলা। তাইন কুইলা, "কইলকত্তা শর (অ) গেলাম। উড়াজাজের মধ্যখানে হ উড়ি বইলাম উড়াজাজ ছাড়িল। আসমান দি বুঁত্ বুত্ বুঁত্ বুত্ করি যাইতে যাইতে একেবারে বিলাতর শরর মধ্যখানঅ গি লামিল।" বুখাই নগরী সাব জাজ থাকি নামলো। বিলাতর শর দেখিও তাইন তজ্জব তাইন কইলা, "ইয়া আল্লাহ, কিতা কুইমু, দলানে ভরা যেমন নাজির গনজের বাজারখন্।"

আন্তর্জাতিক লিপিতে বিবর্তিত করলে যা দাঁড়াবে, তা হলো :

[bukha:i nɔ:gri sab bila:t gechla I ta:in khɔila, "khɔilkattagela:m ʃɔ:rɔ gela:m I uʃa dzadz r majhkhanɔ uʃi boilam uʃa dzadz

chaʃilo I a:sman di but but but but kɔri zaite zaite akkh ibare bilat r ʃ ɔ:r majhkhanɔ gi lamilo " bukha:i nɔ:gri sab dza:dzɔthaki namlo I bilatɔr ʃɔr dekhito ta:in tadzdzab I ta:in khɔila, "ia: a:llah, kkita khɔimu: , dɔla:ne bhara: zæmɔn nadzir gɔnzer baza:rkha:n."]

ঙ. ফেনী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হলে :

বুখাই নগরী সাব বিলাত গেছিলেন। হেতেন কইলেন, "কলিকাতত্তা শরে গেছিলাম। উড়াজাজের মধ্যখানে উড়ি বইছিলাম। উড়াজাজ ছাড়ি দিছে আসমান দি বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ ডাক দিতে দিতে একেবারি বিলাত শরের মাজকানঅ যাই নাইমলো।" বোখাই নগরী সাব জাজেত্তন নাইমলেন। বিলাতের শর দেইক্কাতো হেতেন অবাক হেতেন কইছেন, "ওরে আল্লারে, দেলানে ভরা, কি তো, যেইক্কা নাজির গনজের বাজারডি।"

আন্তর্জাতিক লিপিতে লিখলে দাঁড়াবে

[boga:i n nɔ:ri sab bila:t gechilen I hæten kɔilen, "kɔlikatta: ʃɔ:re gechila:m uʃa dza: dzar majbga:ne uʃi bɔ:ichila:m I uʃ a:dza:dz cha:ʃi diche I a:sman di bõ bõ bõ bõ da:k dite dite ækka:ri bila:t ʃɔ:rer ma:dzka:nɔ : za:i na:imlo" I boga:i nɔri sab dza:dzettɔn na:imlen I bila:ter ʃɔ:r deikkha:to hæten ɔ:ba:g I hæten kɔichen, "ore: a:lla:re:, dela:ne, hu:ra:, ki kɔin, dzɔkka: nazirgɔzer ba:za:rdi I"

---

* আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করেছেন অধ্যাপক গোলাম কাদের, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ
* রূপান্তরকারী : অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

ঘ. পটুয়াখালীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষায়

বোকাই নগরী সাহেব বিলাত গ্যালহে হে কইলহেকি, "কইলকাত্তা শহরে গ্যলহাম। উড়োজাহাজের মাঝে যাইয়া উইট্যা বইলাম। উড়োজাহাজ ছাইড়া দেলে, আহাশইন্যা ভোঁন ভোঁন ভোঁন ভোঁন শব্দ হইরা যাইতে যাইতে এককালে বিলাতের শহরডার মাঝে যাইয়া নামলে।" বোকাই নগরী সাহেব জাহাজে গেনে নামলেন। বিলাতের শহরডা দেইক্যা হে-ত্যে আরচর্য। কয় কি, "হায় আমার আল্লা, দালান-কোডায় ভরা, কি কমু, এ্যা ফ্যানো নজিরগেনজের আ-আ-আ-ট্যা।"[১]

আন্তর্জাতিক লিপিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে

bokaːi nɔgɔri ʃaːib bilaːt gæːlhe l heː kɔilheːki, "kɔillkaːtta:

ʃɔhɔreː gælhaˈˈm l urraːdzaːhaːdzeːr maːjhe zaːjaː uˈˈæː bɔilaːm l

urraːdzaːhaːz chaːirraː dole, aːha ʃiddæ bhoːñ bhoːñ bhoːñ bhoːñ ʃɔbdɔh irræː zaːite zaːite .æːkkaːlɔ bilaːtɔr ʃ hɔrɔq aːr maːjhe zaːjaː namle l" bokaːi .nɔ gɔri ʃaːib zaːhaːze gone naːmlen l bilaːter ʃɔhɔrdaː deikkhæ heːto aːrchɔrzɔl k i ki, "haːy aːmar aːlla, dalan-ko dai bhɔ ra : ki komuː, ææzæno nazirg nzer aː aːa l[২]

ঙ. বৃহত্তর রংপুরের দক্ষিণ অঞ্চল গাইবান্দার ভাষায়

বোকাই নগরী সাহেব বিলাত গেছিল। তাঁয়ই কইছিল, "কলিকাতা শহরত গেইনু। উড়ো জাহাজের মদ্যিও উঠি বসনু উড়োজাহাজ ছাড়ি দিল আকাশের মদ্যি ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করি যাইতে যাইতে এক্কেবারে বিলাতের শহরটাত মধ্যত গিয়া নামনু"। বোকাই নগরী সাহেব জাহাজত থাকি নামিল। বিলেতের শহর দেখি তাঁয়ই তোঁ তাক লাগি গেল। তাঁয়ই কয় "হায় আল্লা, দালানে ভরা! কি আর কইমু, একিবারে য্যানু নজির গনজের হাট।"[৩]

আন্তর্জাতিক লিপিতে পরিবর্তিত করা হলো

bokaːi nɔgɔri ʃɔhɔb bilat gechilo ~taiyi koichilo, "kɔlikataː Sɔhɔrɔt geinu ll uɔ̃ zaːhaːzeːr moddiot uhi b j nu l uɔ̃ zaːhaːz chaːli dilo l aːkaː ʃeːr moddi bhɔ̃ bhɔ̃ bhɔ̃ bhɔ̃ aːɔaːz ko ri zaːite ækkebaːre bilater ʃɔhɔr aːt moddɔt gitaː naːmnu l" bokaːi nɔgɔri ʃɔhɔb zaːhaːzɔt thaːki naːmilo l bileter ʃɔhɔr dekhi tãiyi tõ tãːk naːgi gelo l tãːi k i, "haːi aːlla, dalano bhɔraː ki aːr k imu, ekibaːre zæːnu naziro nzer haːt l"

চট্টগ্রামের সাধারণ উপভাষায় রূপান্তরিত

বোখাই নগরী সাব বিলাত্ গেইয়েল্ তাঁই খইলে, "খেলইগাতা শঅরত্ গেইলাম। হাওয়ার জাঁজত যাই উড়ি বইলাম হাওয়ার জাঁজ ছাইরলোয়। আহ্ছনর উয়রদি বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ শব্দ করি অ্যাক্বারে বিলাত শঅরর মধ্যে যাই নাইমল্যো।" বোখাই নগরী সব জাঁজতুন নাইমলন। বিলাত শঅর দেই তেঁই তাজ্জব অই গেলোগই। তাঁই খইলো, "এ আল্লা, অট্টালিকায় ভরা, কি খইইয়ুম, ইয়ান য্যান্ নজিরগনজের বাজার।"[৪]

---

১. রূপান্তর করেছেন বাংলাদেশ বেতারের দুজন কর্মকর্তা মহফিল হক ও শামসুল আলম

২. প্রাগুক্ত।

৩. মোহাম্মদ ইসহাক, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উর্দতন কর্মকর্তা এই অংশ রূপান্তর করেছেন।

আন্তর্জাতিক লিপিতে লিখলে হবে

bokhai nagri saib bilat geiel I tãir kh ilo, "khoilgaita ʃoirprot geilaim I I
[illegible] zãiz t zaii udi boilaim I haoiar zãia chairillo I aichchaimor uyordii bõ—
[illegible]—bõ ʃobdo gari æikbaire bilait ʃoiror modde zaii naimillo I" bokhai nag
[illegible] zõttuin naimlon I bilat ʃoir dei tei taizzob oi gælogci I tãii khoilo, "e
[illegible] ʃiffalikaii y bhorai, ki khoium, iyain zæn naizirg nzer baizair I"

৫ লিপি ও ভাষায় লিপির ব্যবহার

ভাষার দুই রূপ — স্থায়ী (লিখিত) ও ক্ষণিক (মৌখিক) কাগজপত্রে, শিলালিপিতে কিংবা পাথরের গায়ে খোদাই ক'রে যে ভাষাকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করা হয় এবং যা যুগ হতে যুগান্তরে অনড় অচলভাবে এগিয়ে গিয়েও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে তাই স্থায়ী ভাষা; আর স্থায়ী ভাষার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র লিপির মাধ্যমেই সম্ভব। এই ভাষাকে বলা হয় লেখ্য ভাষা বা written language. আর যে ভাষা কেবলমাত্র মানুষের মুখেমুখেই প্রচলিত থাকে, যাকে লিখিতভাবে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয় না এবং এক মুখ থেকে অন্য মুখে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে রূপান্তরিত হবার মুহূর্তে যথেষ্ট পরিবর্তন ও বিবর্তন লাভ করে, তাকে ক্ষণিক বা অলিখিত অথবা unwritten language বা spoken language বলে। এ ভাষা জীবন্ত বলে প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রূপ পালটাতে থাকে।

কথ্য ভাষা সবসময়ই সমকালীন ও সমস্থানবর্তী হয়ে থাকে। কেননা কথ্য ভাষা সাক্ষাৎ আলাপেই কেবল ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ইদানীং টেলিফোনে, টেপ রেকর্ডারে, বেতারে কিংবা টেলিভিশনে কথ্য ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে সমস্থানবর্তী না হলেও সমকালীন বলে তা সম্ভব হয়। কিন্তু লেখ্য ভাষার ব্যাপারে সমকালীন বা সমস্থানবর্তী না হলেও ভাষা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হয় না। যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে এই ভাষা অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। চর্যাপদের রচনাকাল এক হাজার বছরের আগে হওয়া সত্ত্বেও তা অপরিবর্তনীয়ভাবে সেই তখনকার রূপ ও আকৃতিতে আজো আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু তখনকার মৌখিক ভাষা আজকের যুগে এসে আপনার জনের মুখের ভাষার সাথে কেমন অবলীলাক্রমে এক হয়ে মিশে গেছে। সেক্সপিয়রের রচনা দেশকালকে অগ্রাহ্য ক'রে আজো আমাদের মনে সমানুভূতির সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এটা সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র লিপির সাহায্যে—লিপিই (script) এই ভাষার বাহন। কথ্য ভাষার অন্য ধরনের বাহন রয়েছে, যার নাম কণ্ঠস্বর (sound)। লিপি (script)-কে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। লিপির মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের ভাষা আর ভাষার সাথে মিশ্রিত তাদের জীবনানুভূতির আবেগ এক সাথে বিধৃত জীবনাচরণের নিবিড় চিত্রটি আবিষ্কার করা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন ভাষার বর্তমান লিপি আজ যে চিত্ররূপ পরিগ্রহ করেছে তা প্রথম থেকেই এই রূপ ছিলো না। বহু যুগের বহু বিবর্তনের মাধ্যমে এই বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিভিন্ন ভাষার এই লিপিকে আজ বিভিন্ন ভাষাভাষীর বোধগম্য করবার জন্যে আন্তর্জাতিক

লিপি বা International Alphabet সৃষ্টি করা হয়েছে. এখানে কয়েকটি বাংলা ধ্বনির লিপির ক্রমবিকাশ দেখানো হলো :

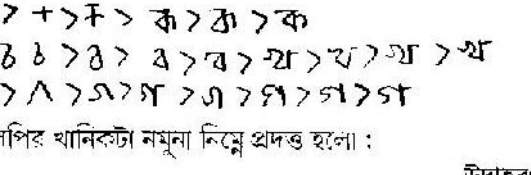

আন্তর্জাতিক লিপির খানিকটা নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

বর্ণ		উদাহরণ
	বাংলা	ইংরেজি
i	চিনি (cini)	it (it)
i:	তিন (ti: n)	meat (mi:t)
e	হেসে (heʃe)	red (red)
e:	তেল (te:l)	X
a	আমি (ami)	X
a :	আম (a: m)	father (fa : ða)
kh	খত (kha : ta)	X
b	বলা (bola)	ball (b : /)
bh	ভালো (bhalo)	X

বিভিন্ন ভাষার লিপির ক্রমবিকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে : কইপু (quipu), চিত্রলিপি (pictogram), ভাবলিপি (ideogram), শব্দলিপি (phonogram), অক্ষরলিপি (syllabic script), ধ্বনিলিপি (alphabetic script)

বাংলা লিপির জন্ম দ্বাদশ শতাব্দীতে। গুপ্ত রাজাদের আমলে যে ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো যাকে বলা হয় কুটিল লিপি, তা থেকেই এর উদ্ভব।

উল্লেখ্য, লিপি যখন পরবর্তীকালে আধুনিক প্রযুক্তির জন্মের মধ্যে দিয়ে ছাপার রূপ পেলো, তখন থেকে এর ক্রমিক পরিবর্তন হারিয়ে ফেললো। একটি জীবন্ত মানুষের কোনো এক মুহূর্তে তোলা ছবি যেমন ক্যামেরার মাধ্যমে তাকে অপরিবর্তনীয় করে তোলে, মানুষের ক্রমপরিবর্তন ঘটতে থাকলেও ছবিতে তোলা বিশেষ মুহূর্তটি যেমন একেবারেই স্থবির, তেমনি ছাপাখানার লিপি হলো অপরিবর্তনীয়, অনড় ও অক্ষয়।

ভাষাতত্ত্ব : এর পরিধি ও বিবর্তন

ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যোদ্ধার এবং বৈজ্ঞানিক পঠনপাঠন ও বিশ্লেষণই ভাষাতত্ত্বের কাজ। বিশেষত একটি ভাষাকে যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয় তখনই তাকে

ভাষাতত্ত্ব (linguistic) বলা হয়ে থাকে। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষাকেই প্রধান ভাবে অবলম্বন করে নিতে হয়। এ কারণেই একজন বহুভাষাবিদ হয়েও ভাষাতাত্ত্বিক নাও হতে পারেন, যদি না কোনো একটি বিশেষ ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তার দ্বারা সাধিত হয়।

একজন ভাষাতাত্ত্বিক এ সম্পর্কে একটি দারুণ মূল্যবান উক্তি করেছেন, "It is the scientific enterprise of investigating the languages & dialects which are in use, or have been used, by various speech communities throughout the world ..., by examining & comparing actual manifestations of language as represented by samples of speech or text, but the end result is a description of the 'linguistic code' which more or less uniformly manifects itself in all verbal communications or message overvalue in the speech community."

ভাষাতাত্ত্বিক যখন কোনো ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন, তখন সেই ভাষার কথ্য বা মৌখিক রূপটিই হয় তার আদর্শ। তবে কোনো একটি মৃত ভাষার (dead language) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই ভাষার লিখিত রূপটিকে অবলম্বন করতে হয়। একজন মানুষ কোনো একটি বিশেষ ভাষা (যা তার মাতৃভাষা) যে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রকাশ করে, তাকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিই আধুনিক ভাষাতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য। ভাষাতত্ত্বের কাজ হলো, **"ভাষার অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে, ভাষার অবয়ব সংস্থানের শৃঙ্খলা আবিষ্কারে, তার ব্যবহার প্রণালী বর্ণনায়"।**[১]

জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনার শুরু গ্রিসদেশে। ভাষার আলোচনায় তাই বলে গ্রিক পণ্ডিতেরা বাকবিতণ্ডার সীমানা ছাড়িয়ে যান নি। তখন থেকেই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এই আলোচনায় একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই ভাষা স্বভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়মিত বলে যখন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে, ঠিক তখনি সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিকেরা এই ভাষা চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের যুক্তিতে ভাষা হচ্ছে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত প্রতীকের সমষ্টিমাত্র, নিয়মিত নয়। গ্রিক পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেন এবং ভাষার চুলচেরা বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্য তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ণয় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

প্রাচীন যুগে ভাষাতত্ত্বের আর এক নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করেন ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনি, যাস্ক, পতঞ্জলি প্রমুখ। ধারণাপ্রসূত জ্ঞান থেকে নয়, বরং ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রথম বর্ণনামূলক পদ্ধতির উদ্গাতা এই পাণিনি, যা সম্পূর্ণভাবে গ্রিক, ল্যাটিন বা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে পাণিনির পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্তও অজ্ঞাত ছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পাণিনির ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে ভাষাতত্ত্বের জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধানও তখন পাশ্চাত্য জগতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) গবেষণার দ্বারোন্মোচন করে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে উদ্ভব ঘটে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের (descriptive linguistics)।

---

১. হুমায়ুন মুনীর চৌধুরী : সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্কিন দেশে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয় উইলিয়াম ডুইট হুইটনির[১] গবেষণার মাধ্যমে। এই সঙ্গে নাম করতে হয় আরো তিনজন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের — ফ্রাঙ্ক বোয়াস, এডওয়ার্ড স্যাপির ও লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড. এঁরা বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণকে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে দাবি করেছেন। এই পদ্ধতির লাভজনক দিক হলো, কোনো একটি ভাষার আক্ষরিক বা শাব্দিক বা ভাবার্থ না জেনেও কেবলমাত্র সেই ভাষার পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও ভাষা বিশ্লেষণ সম্ভব। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড রচিত "language" (১৯৩৩) গ্রন্থটিকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রথম নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির সবচাইতে বড় বিশেষত্ব এই যে, এর প্রথমাংশ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভাষার সামাজিক ভূমিকা (social function of language), বাক্যরীতি (syntax), রূপতত্ত্ব (morphology), ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics) ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে ভাষার যথার্থ মূল্যায়নের দিকনির্দেশ করেছেন। শেষাংশে তাঁর আলোচনার পরবর্তী সূত্র হিসেবে এসেছে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা ; যেমন, ধ্বনি পরিবর্তন (changing of sound), সাদৃশ্য (analogy), কৃতঋণ (borrowing) ইত্যাদি। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে বর্ণনামূলক পদ্ধতি। শুধু তাই নয়, ভাষাতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও তার রূপ নির্ণয়ে বর্ণনামূলক পদ্ধতি যতো সাহায্য করতে পারে, তুলনামূলক কিংবা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। এ কারণেই ব্লুম ফিল্ডের "Language" গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্বের কেবলমাত্র একটি বিস্ময়ই নয়, বরং " It has served as a model and a guide for all American work since its appearance. even where later comers have avanced beyond the Bloomfield, it has been on the basis of his solid foundations."

ভাষাতত্ত্বের আরেক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেন ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্ডিত পাণিনি। প্রায় এক হাজার বছর আগে ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁর যে প্রক্রিয়া অবলম্বন, তা আজকের যুগেও রীতিমতো বিস্ময়কর। তাঁর রচিত ব্যাকরণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। পরবর্তীকালে তাঁর ব্যাকরণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যাস্ক, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ পাণিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে ব্যাকরণ বই রচনা করেন তা এখনো সুধী মহলে সমধিক আদৃত।

পরবর্তীকালে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের এই আদর্শে রচিত হওয়ায় তা মৌখিক বা লিখিত বাংলাভাষার রূপ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে। বাংলাভাষায় রচিত কোনো ব্যাকরণই তাই পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। বাংলা ভাষার উৎপত্তি যেমন সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়, এ কারণেই বাংলা ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। কারণ বাংলা ব্যাকরণের আদর্শ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ থেকে একেবারে আলাদা। বাংলা ভাষার সঙ্গে মিল রেখে এর কথ্য বা লিখিত যে কোনো একটি ভাষাকে মূল হিসেবে ধরে নিয়ে বাংলা ভাষার প্রকৃত গবেষণা হওয়া উচিত। বাংলা ব্যাকরণের ভুল এবং নানাবিধ অসম্পূর্ণতা একমাত্র তখনি দূর হতে পারে।

---

১. উইলিয়াম ডুইট হুইটনি (১৮২৭–১৮৯৪)

ক) Language and the Study of Language

(খ) The Life and Growth of Language (১৮৭৪)

তিন খণ্ডে প্রকাশিত জন বিমস্ রচিত "A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India"[১] গ্রন্থে প্রথমবারের মতো বাংলা মুখের ভাষা থেকে ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। পরবর্তী প্রচেষ্টা গ্রীয়ার্সন সাহেবের 'Linguistic Survey of India' –এর পঞ্চম খণ্ডে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা [illegible] ইংরেজ ধ্বনিতাত্ত্বিক ডানিয়েল জোনসের ভবিষ্যৎ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible] ভাষার ধ্বনিমূল আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা চালান তাঁর 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' (১৯২৮) গ্রন্থে। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক সুনিপুণ আলোচনাসমৃদ্ধ তাঁর আরেকটি গ্রন্থ 'Origin and Development of Bengali Language' (১৯২৬) 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' রচনার দুবছর আগে প্রকাশিত হয়। ভাষাতত্ত্বের উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. সুকুমার সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, অতীন্দ্র মজুমদার, রফিকুল ইসলাম, মনসুর মুসা কমবেশি আলোচনা করেছেন এবং এখনো এ সম্পর্কে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ভাষাতত্ত্বের মতো ব্যাপক একটি বিষয়ের উপর গবেষণার আরো বিস্তৃত কর্মসূচি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলা ভাষার গবেষণা ফলপ্রসূ হলে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুস্থ হবে, তার আগে নয়।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ব্রিটিশ পদ্ধতি অর্থাৎ ডানিয়েল জোনসের প্রদর্শিত পথে প্রথম যাত্রা শুরু করতে দেখা যায়। ড. সুনীতি কুমার, মুহম্মদ আবদুল হাই, ড. কাজী দীন মুহম্মদ এই পথে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ শুরু করেন। মুনীর চৌধুরী, ড. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ কিন্তু আমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিদ চার্লস এফ. হকেট, রবার্ট হল, উইলিয়াম জে. মউলটনের পথ অবলম্বন করেছেন।

এরপর আসে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের কথা। ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক (Historical Linguistics) ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় দিক হলো ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষা বা ভাষাসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারায় সময়ের ব্যবধানে ভাষা বা সম্পর্কিত ভাষাসমূহের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা। এই পদ্ধতির উদ্গাতা জ্যাকব গ্রিম (Jacob Grimm) Dentch Gramatic (১৮১৯) গ্রন্থে ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভাষার ক্রমপরিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। শুধু তাই নয়, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে সতত তাল মিলিয়ে চলেছে, তিনি প্রমাণ করেন। তাঁর 'Dentche Grammatic' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮২২) ভূমিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করেন।[২] "ব্যাকরণ সম্পর্কে সাধারণভাবে যে সব যুক্তি দেয়া হয়, আমি তার বিরোধী। কেননা ঐ সব ধারণা আপাতদৃষ্টিতে ব্যাকরণের সংজ্ঞায় অনড় শৃংখলার সমর্থক। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের পর্যবেক্ষণে তা করণভাবে ব্যাহত করে ; যাকে আমি ভাষাতত্ত্বের প্রাণ বলে মনে করি। ... পরিবর্তনশীল মূলতত্ত্বের উদ্ঘাটন, যা স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয় এবং একটি পরিভাষার পর আর একটি পরিভাষার অনুমোদনের জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়ে; অবশ্য সেইসব বিদেশী ভাষা শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের বেছে নিতে আমি অসমর্থ নই।"[৩]

---

১. A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, 2872-79.

২. I am hostile to general logical notations in grammar ; they conduce apparently to strictness and solidity of definition, but hamper observation, which I take to be the soul

গ্রিম তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ 'Grammatik'–এ প্রথম Phonology বা Erstesbuch von den buchstaben–এর নাম উল্লেখ করেন। এই 'Grammatic' গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮২২) তিনি ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন, সেটা হ'লো 'ধ্বনি পরিবর্তন তত্ত্ব' বা 'Sound Shifting' (lautverschiebung)। গ্রিমের ভাবশিষ্য ম্যাক্স মুলার (Max Muller) একে নামকরণ করেন 'গ্রিমের সূত্র' বা 'Grimm's Law' বলে। কিন্তু এ ব্যাপারে গ্রিমকে ঠিক আবিষ্কারকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়তো ঠিক হবে না। কেননা ম্যাক্স মুলার গ্রিমের ভাবশিষ্য বলে ইতিহাসকে খানিকটা বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। কারণ গ্রিম তাঁর এই সূত্র রাস্কের (Rask) 'Undersogelse' গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করেছেন। ধ্বনি পরিবর্তনের এই সূত্রকে যদি কোনো পণ্ডিতের নামের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে সে গৌরব কেবলমাত্র রাস্কেই দাবি করতে পারেন, গ্রিম নন এবং সে হিসেবে এর নামকরণ করা যেতে পারে 'রাস্কের সূত্র' বা 'Rask's law'. তিনি স্পষ্টই তাঁর Mudersogelse (১৮১৮) গ্রন্থে দেখিয়েছেন :

Lat. Grk. p = f, t = p (th), k = h ইত্যাদি

রাস্ক ধ্বনি পরিবর্তনের সমান্তরাল প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলেও সমস্ত পরিবর্তনকে একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় এনে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র দান থেকে বিরত থেকেছেন। এ ব্যাপারে গ্রিম অনেক অগ্রগামী এবং বৈজ্ঞানিক হাজারো উদাহরণের সাহায্যে তাঁর সূত্র প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় নিয়োজিত। তিনি ধ্বনি পরিবর্তনের সবগুলো প্রক্রিয়াকে একটি সূত্রে দেখবার চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন, যার ফলে 'High German–এর second shift' বা দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তনও ঐ একই সূত্রে বিধৃত। গ্রিমের সূত্র তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

Greek	p b f	t d th	k g ch
Gothic	f p b	th t d	h k g
High German	b (v) f p	d z t	g ch k

[২]

গ্রিমের এই সূত্রকে পুরোপুরি অভ্রান্ত বলা যাবে না। কেননা

১. হাই জার্মান ভাষায় গ্রিক p এবং গথিক f ধ্বনি (media)-র অস্তিত্বই নেই ;

২. হাই জার্মানে গথিকের h ধ্বনি গ্রিক k ধ্বনির সমান্তরাল হলেও হাই জার্মানের g ধ্বনি গথিকেও উপস্থিত, গ্রিমের সূত্রে এর ব্যাখ্যার অবকাশ নেই ;

---

of linguistic science ... As my starting point was to trace the never resting element of our language which changes with time and place, it became necessary for me to admit one dialect after the other, and I could not ever forbear to glance at those foreign languages that are ultimately related with ours.'

ভূমিকা, ২য় সংস্করণ (১৮২২), "Dentache Grammatic" by Jacob Grimm (১৭৮৫)

২. একে অন্যভাবে বর্ণনা করে গ্রিম দেখাবার চেষ্টা করেছেন, tenuis (ওষ্ঠ্য) T becomes aspirated (কণ্ঠ) A and then media (দন্ত) M etc.

or tabulated :

Greek	T	M	A
Gothic	A	T	M
High German	M	A	T

৫. গ্রিমের এই সূত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মশৃংখলার যে রূপগত ব্যাখ্যা রয়েছে তা মহাপ্রাণ ধ্বনির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রিম মহাপ্রাণ ধ্বনি বলতে যা বুঝিয়েছেন তা হলো :

ক. স্পৃষ্ট + h
খ. স্পৃষ্ট + উষ্মধ্বনি pf, ts (z)
গ. অঘোষ উষ্মধ্বনি f, s
ঘ. ঘোষ উষ্মধ্বনি v, th
ঙ. h

৬. গ্রিমের সূত্রের অপূর্ণতার আরেকটি প্রমাণ হলো, জার্মান ভাষার তিনি দুটি বিশেষ ধ্বনির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন, যার একটির থেকে অন্যটিতে পরিবর্তনের সময় সীমার ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর (খ্রিষ্টপূর্ব কোনো সময় ও খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী), এ দুটি পরিবর্তনই, তাঁর মতে ক্রমপরিবর্তনের ফলমাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন (First sound shift and second sound shift):

প্রথম ধ্বনি পরিবর্তন হলো, টিউটনিক বা জার্মান শাখার যে তিনটি অংশ পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম জার্মান বলে আখ্যায়িত, পূর্ব জার্মান ভাষার নিদর্শন লুপ্ত ভাষা যার নাম গথিক, উত্তর জার্মান ভাষার শাখা নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডের ভাষা এবং পশ্চিম জার্মান উপশাখা হলো ইংরেজি, জার্মান ও ওলন্দাজ ভাষা ; এর বিবর্তনে জার্মান ভাষায় যে দুটি ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে তার প্রথম পরিবর্তনের ফলশ্রুতি জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি পদ্ধতি, ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছিলো—এটাই হলো 'প্রথম ধ্বনি পরিবর্তন' বা first sound shift এবং দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে উচ্চ জার্মান উপভাষাগুলো নিম্ন জার্মান উপভাষাসমূহ থেকে আরেকবার পৃথক হয়ে যায়, এই পরিবর্তনের নাম হলো 'দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন' বা second sound shift. গ্রিম এই উভয়বিধ পরিবর্তনের সূত্র প্রদান করেছেন, নিম্নে যার নমুনা দেয়া হলো :

প্রথম ধ্বনি পরিবর্তন (First Sound Shift)

মূল ভাষা	মূল ভাষার অন্যান্য শাখা সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন	গথিক ও নিম্ন জার্মান
ক. ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি		ঘোষ স্বল্পপ্রাণ
gh →	gh →	g
dh →	dh →	d
bh →	bh →	b
খ. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি →		অঘোষ স্বল্পপ্রাণ
g →	g →	k
d →	d →	t
b →	b →	p

(গ) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি →		অঘোষ মহাপ্রাণ
k →	k →	kh
t →	t →	th
p →	p →	ph

দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন (Second Sound Shift)

মূল ভাষা	গথিক ও নিম্ন জার্মান	উচ্চ জার্মান
(ক) ঘোষ মহাপ্রাণ →		অঘোষ স্বল্পপ্রাণ
gh →	g →	k
dh →	d →	t
bh →	b →	p
(খ) ঘোষ স্বল্পপ্রাণ →		অঘোষ মহাপ্রাণ
g →	k →	kh
d →	t →	th
b →	p →	ph
(গ) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ →		ঘোষ স্বল্পপ্রাণ
k →	t →	p
kh →	th →	ph
g →	d →	b

গ্রিমের এই সূত্রকে সংক্ষেপে বর্ণনা করলে যা দাঁড়ায় তা হলো. মূল (ইন্দো–ইউরোপীয়) ভাষার বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি জার্মানি ভাষা–শাখায় যথাক্রমে বর্গের দ্বিতীয়, প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়।

গ্রিমের সূত্রের ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্যে যে দুজন পণ্ডিত প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান, তাঁরা হলেন গ্রাসম্যান (Grassman) ও ভার্নার (Verner)। গ্রাসম্যান ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত যে সূত্র খুঁজে বের করেন তা হলো, "মূল ভাষার বর্গের মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রাচীন গ্রিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে স্বল্পপ্রাণ হয়েছে এবং মূল ভাষার কোনো শব্দে পাশাপাশি দুটি অক্ষরে (Syllable) বর্গের চতুর্থ ধ্বনি থাকলে তাদের মধ্যে একটি বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে যেমন IE ভেনধ্ > SK বন্ধ্।"

এর পক্ষে Accent বা স্বরাঘাতের প্রভাব খুঁজে বের করলেন ভার্নার ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর ভাষায়, "অব্যবহিত পূর্ববর্তী অক্ষরে accent বা স্বরাঘাত না থাকলে মূল ভাষার বর্গের প্রথম ধ্বনি জার্মান শাখায় বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি না হয়ে তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং 'ts' ধ্বনি 'z' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অক্ষরে স্বরাঘাত থাকলে গ্রিমের সূত্রানুযায়ী মূল ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষার k t p যথাক্রমে নিম্ন জার্মানে kh th ph তে পরিণত হয়; কিন্তু যদি পরবর্তী অক্ষরে স্বরাঘাত পড়ে তাহলে k t p যথাক্রমে উচ্চ জার্মানে g d b–তে পরিবর্তিত হয়।"

উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যে ফ্রান্ৎ বপ্‌ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Tutonic Languages' (১৮২৫) গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটির নাম 'Conjugations system,' ইংরেজিতে অনূদিত, পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণের নাম 'Analytical comparison of Sanskrit, Greek, Latin and Tutonic Languages'. ল্যাটিন, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষার অভিন্নতার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ভাষাসমূহের পূর্ব রূপ পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়েছেন এই গ্রন্থে. তাঁর ভাষায়, 'আমি একথা কল্পনা করি না যে, গ্রিক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এমন কি সংস্কৃতকে আমরা যেভাবে ভারতীয় পুস্তিকাদিতে লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। বরং আমি মনে করি যে, ঐসব ভাষা একত্রে সেই মূল ভাষারই পরিবর্তিত রূপ, যা তার ভগ্নীস্থানীয় অন্যান্য ভাষার চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃতে রক্ষিত হয়েছে।' কিন্তু বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ প্রায়শই আমাদেরকে এ কথা বুঝতে সাহায্য করে যে, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন রূপ ঐসব গ্রন্থের প্রাচীনতম লেখকের রচনায় ও স্থাপত্যে পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্থাপত্যে উৎকীর্ণ ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা দান করে দেয়।[১]

ফ্রান্ৎ বপ্‌ বিশ্বের ভাষাগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন :

ক. যে সব ভাষায় সাক্ষাৎভাবে কোনো ধাতু পাওয়া যায় না, যেগুলোর রচনারীতি অনির্ণেয় থাকে, যার ফলে ভাষায় দৃঢ়বদ্ধতা ও ব্যাকরণের অভাব দেখা দেয়, সেসব ভাষার মধ্যে পড়ে চীনা ভাষা, যা অধিকাংশ বৈয়াকরণিক সম্বন্ধ শব্দের পরম্পরা দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে।[২]

খ. যে সব ভাষায় একক ধাতু রয়েছে, যার রচনারীতি সুনির্ণীত এবং যাদের দৃঢ়বদ্ধতা ও ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে শব্দরূপ গঠনের নিয়মাধীন, বিশেষ করে, ক্রিয়ারূপ ধাতু ও সর্বনামের মূলের অনুগত, সেইসব ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রথম ও তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন সব ভাষাও এই শ্রেণীতে পড়ে।[৩]

গ. আর যে সব ভাষায় দুই ঝোঁক বিশিষ্ট ধাতু রয়েছে এবং তিনটি আবশ্যকীয় ব্যঞ্জনধ্বনি যেখানে শব্দের বৈশিষ্ট্য, তেমন ভাষা একমাত্র সেমেটিক ভাষা। এইসব ভাষায় বৈয়াকরণিক

---

১. I don't believe that the Greek, Latin and other European languages are to be considered as derived from the Sanskrit in the state in which we find it in Indian books ; I feel rather inclined to consider them altogether as subsequent variations of one original tongue, which, however, the Sanskrit has preserved more perfect than its kindred dialects. But whilst therefore the language of the Brahmans more frequently enables us to conjecture the primitive for the Greek and Latin language than what we discover in the oldest authors and monuments, the latter on their side also may not unfrequently elucidate the Sanskrit Grammar. Conjugations System or Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Tutonic Languages by Franz Bopp (1791).

২. Languages without roots proper and without the power of composition and thus without organism and grammar ; to this class belongs Chinese, in which most grammatical relations are only to be recognised by the position of the words.

৩. Languages with monosyllabic roots, capable of composition and acquiring their organism, their grammar, nearly exclusively in this way ; the main principle of word formation is the connexion of verbal and pronominal roots. To this class belong the Indo-European languages, but also all languages not comprised under the first or the third class.

রূপগুলো শুধু রচনারীতির ফল নয়, যা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার বৈশিষ্ট্য, বরং এসব ভাষায় শব্দ গঠিত হয় ধাতুর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে।[১]

বপ্ তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা-জীবন শুরু করেছিলেন flexional উপাদানসমূহের আদি উৎস উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ভাষার শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় 'agglutinating' ও 'flexion' এই দুটি শব্দ তাঁর শব্দবিন্যাস থেকে একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য এর কারণ, প্রথমত, প্রথম শব্দ অর্থাৎ 'agglutinating' শব্দ ব্যবহার করলে আর্য ভাষার বিপরীতধর্মী ভাষাসমূহকে একই শ্রেণীতে ফেলা হতো, তিনি চেয়েছিলেন ঐ ভাষাগুলোর মধ্যে মিল দেখতে ; আর দ্বিতীয় শব্দ অর্থাৎ 'flexion' শব্দটি ব্যবহার না করার কারণ schlegel অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বোঝাতেই কেবল এই শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে।

পরবর্তী সময়ে ভাষার রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে Whilhelm Von Humboldt (১৭৬৭) 'Agglutination' ও 'flexion' শব্দ দুটো তো ব্যবহার করেছেনই, বরং এর সাথে বারবার 'Incorporation' শব্দটির ব্যবহারও লক্ষণীয়। তাঁর মতে, চীনা ভাষা ছাড়া (যে ভাষার কোনো ব্যাকরণ নেই) পৃথিবীর ভাষাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন--

a. The flexional,
b. The agglutinative, and
c. The incorporating.

ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। ভাষার ক্রমবিবর্তনের প্রবাহে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ভাষা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণার ভিত্তিভূমি হিসেবে যে বিষয়গুলো কাজ করেছে, তা হলো :

১. ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের সাথে তাল রেখে ভাষা ক্রমাগতভাবে বিবর্তিত হতে থাকে।

২. এই পরিবর্তনগুলো আপাতদৃষ্টিতে বহু ব্যতিক্রমের শিকার বলে মনে হলেও আশ্চর্য রকম নিয়মিত। এবং তা নিয়মিত বলেই ভাষাসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা আবিষ্কার ক'রে ভাষা গোষ্ঠীসমূহ স্থির করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

৩. ভাষার পরিবর্তন ভাষাভাষীদের ভুল প্রয়োগ, অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশত সৃষ্ট হয় না। বরং কালের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অবসম্ভাবী বলেই জন্ম হয় তার।

---

১. Languages with disyllabic roots and three necessary consonants as sole bearers of the significant of the word. This class includes only the semitic languages. Grammatical forms are here created not only by means of composition, as in the second class, but also by inner modification of the roots.

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও তার বিবর্তন
(Comparative Philology)

একটি ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন একই গোত্রের বিভিন্ন শাখার ভাষা কিংবা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তার বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকেই বলা হয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে কোলকাতায় স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত সভায় যে ভাষণ দেন, তাতেই প্রথম বারের মতো তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণার সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। স্যার জোন্সের ভাষায়, প্রাচীন ইতিহাস যাই হোক না কেন, সংস্কৃত ভাষার গঠনরীতি চমৎকার। এ ভাষা গ্রীক ভাষা থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ, ল্যাটিন ভাষা থেকে পূর্ণতর, এবং এই দুটো ভাষা থেকেও অধিকতর মার্জিত। তবে ভাষার সঙ্গেই তার গভীর আত্মিক সম্পর্ক বর্তমান। ইহার ক্রিয়ারূপ-ধাতু এবং বৈয়াকরণিক সাদৃশ্য একথা প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারটি আকস্মিক নয় এবং এইসব সাদৃশ্য এতো প্রকট যে, কোনো দার্শনিকই এসব পর্যবেক্ষণ করে একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এরা একই মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। যদিও তেমন কোনো চাক্ষুষ চিহ্ন এতে নেই। এমনো যুক্তি রয়েছে, যদিও সে যুক্তি এমন শক্তিশালী নয় যে, গথিক ও কেল্টিক ভাষা সংস্কৃত একই মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে; এবং প্রাচীন পারসিক ভাষা সম্বন্ধে: এইসব গোষ্ঠীর অন্তর্গত সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে।[১]

এরপর সংস্কৃত এবং আরো কয়েকটি ইউরোপিয়ান ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যজনিত মিলগুলো আবিষ্কার করে তার তুলনামূলক আলোচনা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ভাষা-পণ্ডিত Friedrich Von Schlege's তাঁর 'Ueber die sprache und weishcit der Indier' (১৮০৮) গ্রন্থে। তিনি দেখে অবাক হন যে, সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ কি আশ্চর্য ভাবে জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই সাদৃশ্য, তাঁর ভাষায়, মোটেই আকস্মিক বা কৃত্রিম নয়; বরং এর কারণ 'ঐ ভাষাসমূহের উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত'। তাঁর মতে, পৃথিবীর ভাষাগুলো দুশ্রেণীতে পড়ে—সংস্কৃত ও এ থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহ এবং অন্যান্য ভাষা। প্রথম শ্রেণীর ভাষার ধাতু (root)-র অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন flexion আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের পরিবর্তে বহিরঙ্গ

---

১ "The Sanskrit language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three without billieving them to have sprang from same common source, which, perhaps, no longer exits. There is similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtic ... had the same origin with the Sanskrit; and the old Persian might be added to the same family."–Speeches by william Johns at Asiatic Society on the 3rd Feb, 1786.

পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তিনি। তিনিই ভাষার ব্যাকরণগত শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা করেন এবং Organic ও Affix এই দু'ভাবে তাকে ভাগ করেন। চীনা ভাষাকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য এর আলোচনায় আবার এই ভাষাকে তিনি আলাদা একটি তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলবার চেষ্টা করেন। তাঁর আলোচনায় চীনা ভাষা যেহেতু affix languages–এর মধ্যে পড়ে, অতএব একটি নতুন শ্রেণীতে একে ফেলা যেতে পারে।

A. W. Schlegel[১] কেবলমাত্র Organic ভাষাগুলোকে Flexional বলে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন Synthetic এবং Analytic.

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে Rasmus Rask তুলনামূলক বিশ্লেষণে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায়।

Franz Bopp[২] সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়, এইসব ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ভাষাগুলোর মূল উৎস ও ব্যাকরণ অনেকটা একরকম। আর এই মিল থেকে এদের পূর্বরূপ পুনর্গঠন করা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্য ভাগ পর্যন্ত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য ধরা হতো। সংস্কৃতের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো ভাষার আলোচনায় সংস্কৃত শব্দ, রূপ ও ব্যুৎপত্তি থেকে চলতো তার অনুসন্ধান। সেকালের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যেতো।

ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন August Schleicher.[৩] তিনি ভাষাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন একটি সূত্রের আকারে এবং এর সাহায্যে সংস্কৃত, গ্রিক, গথিক ও ল্যাটিন ভাষার প্রত্নরূপ পুনর্গঠন করেন তিনি।

বিভিন্ন ভাষা, তার প্রাচীন ও বর্তমান রূপ এবং অর্থগত বিশেষত্ব নিয়ে স্বতন্ত্র থাকায় তুলনামূলক আলোচনায় কেবল ভাষার রূপগত বা অর্থগত সাদৃশ্যই নির্ণীত হয় না, বরং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানব–সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সমিলতাও খুঁজে বের করা সম্ভব। অতীতকালের সাথে বর্তমানকালের পার্থক্য নির্ণয় এবং সমিলতা খুঁজে বের করে মানব–সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূল ধারণাটিও স্পষ্টতর হতে পারে ভাষাতত্ত্বের এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে।

---

১. A. W. Schlegel-এর গ্রন্থের নাম : Observations sur la langue et la litterature provencale (1818)

২. Franz Bopp (1791)-এর গ্রন্থের নাম : Analytical Comparison of the Sanskrit, Geek, Latin and Tutonic Languages

৩. August Schleicher (1821) : Die indogermanische ursprache (Compendium).

ধ্বনি পরিবর্তন

ভাষাতত্ত্বিকরা ভাষার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন, এই ভাষা যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে যেমন, ধ্বনিগত দিক থেকেও ঠিক একইভাবে এ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাই ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ধ্বনিতত্ত্ব এবং ধ্বনি পরিবর্তন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ভাষার সাথে নদীস্রোতের একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। নদীস্রোতের মতোই ভাষা নিয়ত পরিবর্তনের বাঁক সৃষ্টি করে চলেছে। গতিমান নদীস্রোতের মৃত্যু মানে গতি হারিয়ে ফেলা, ভাষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ; অর্থাৎ ভাষা যখন পুঁথিতে কিংবা মানুষের মুখে ব্যবহারের সচল গতি হারিয়ে ফেলে তখন তা মরা নদীর মতোই স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হয়। যেমন, পালি, সংস্কৃত কিংবা হিব্রু অথবা ল্যাটিন ভাষা আজ সেই স্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়ে মরা নদীর পর্যায়ে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এতো গেলো সাধারণভাবে ভাষার বাইরের প্রকৃতিগত রূপের পরিচয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষা কি আসলেই চিরতরে মৃত্যুবরণ করে? স্মৃতির গহ্বরে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার সবটুকু পরিচয়? আসলে কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। সংস্কৃত ভাষার কথাই ধরা যাক না কেন। সংস্কৃত সত্যি কি মৃত? আমরা কি সত্যি তার ব্যবহার ভুলে গিয়েছি? জীবনের কোনো বিশেষ পর্যায়েও কি তাকে আমরা ব্যবহার করি না? আমাদের বাংলা ভাষায় কি প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রচলন নেই? প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত বহু শব্দ, প্রয়োগবিধি এবং স্টাইল বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই বাংলা ভাষা এতটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম। তেমনি প্রাকৃতে অপভ্রংশে আমরা কথা বলি না বটে, কিন্তু তাদের পরিবর্তিত রূপ বাংলা কিংবা হিন্দি আমাদের আজকের কথ্য ও লেখ্য ভাষা। কেবল নদীর বাঁক বদলের মতোই এই ভাষা যুগ থেকে যুগান্তরে তার প্রকৃতি বদলিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু বলা যায়, নদী বদলায় তার স্রোত, ভাষা বদলায় তার ধ্বনি। নদীর স্রোত ভিন্নমুখী হলে যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, তেমনি কালক্রমে মূল ভাষার ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভাষায় রূপ নেয়।[১]

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের পেছনে যেমন নানাবিধ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা কাজ করে, তেমনি ভাষার এই ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অসংখ্য কারণ বিদ্যমান :

১. ভাষার সচল গতি এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ। মহাকালের গতি প্রবাহের ধারা অবলম্বন করে ভাষা অবিরাম 'অকারণ অবারণ' চলছে। এ চলার পথ কন্টকহীন নয় বলেই ইতিহাসের ধাপের মতোই মহাকালের পাতা জুড়ে সেও লিখে নিচ্ছে তার নাম। আর তাই এই মহাপ্রবাহে ভাষা কেবল পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। অবশ্য এই পরিবর্তন

---

১. ভাষাতত্ত্ব : অতীন্দ্র মজুমদার

কোনো অমোঘ নিয়মে না হলেও কতকগুলো নীতি মেনেই চলেছে সর্বদা। তবে এই নিয়মকে যদি কেউ অঙ্কের নিয়মের সাথে একাত্ম করে দেখতে চান, তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। কেননা এই 'ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রটি কোনো বিশেষ ভাষার বিশেষ অবস্থায়ই খাটে, অন্য অবস্থায় খাটে না' এবং 'শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলোর সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই সূত্রের অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে, অন্যথা নয়।'[১]

২. ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ নিহিত রয়েছে ভাষার আয়ত্তকরণের প্রকৃতির উপর। জিহ্বার জড়তা, শ্রবণশক্তির অপ্রখরতা, শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনিগুলোর পারস্পরিক প্রভাব, ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ বিশেষত্ব এ সবই ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ। কারো হয়তো উচ্চারণে দোষ আছে (যেমন, যদি কারো দাঁত না থাকে তাহলে দন্তধ্বনির উচ্চারণে তার বিকৃতি স্বাভাবিক) অথবা কারো যদি জিহ্বার জড়তা থাকে (যদি কেউ তোতলা হয়) তাহলে উচ্চারণে স্বাভাবিকভাবেই ব্যতিক্রম আসতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যক্তিটি যদি প্রভাবশালী হন কিংবা তিনি যদি কারো ভাষা শিক্ষা দানের গুরুদায়িত্ব (তার সন্তানাদি অথবা অধীনস্থ কর্মচারী বা শিষ্য) নেন, সেখানে উচ্চারণে বিকৃতি আসা খুবই স্বাভাবিক। কানে কম শুনলেও সঠিক ধ্বনি উচ্চারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। 'খ' ধ্বনিকে 'ক' ধ্বনিতে, ক-কে খ-তে, র কে ন-তে উচ্চারণ লক্ষণীয়। এভাবে 'এই ব্যক্তিবিশেষের দোষই যখন তার পরিবারে, পরিবার থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন মূল ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনির রূপ নেয় ... উচ্চারণের এই দোষ যে কেবল পুরোনো ধ্বনি বদলে নতুন ধ্বনি আগম ঘটায় তাই নয়, ভাষা ব্যবহার অর্থাৎ পদ প্রয়োগ ইত্যাদিও বদলে দিতে পারে। উচ্চারণ প্রণালী, পদ প্রয়োগের ভঙ্গি পিতা থেকে শিশু শেখে, সে বড় হলে তার কাছ থেকে আবার তার ছেলেমেয়েরা শেখে-- এইভাবে বংশপরম্পরায় রূপান্তরিত হতে থাকে।'[২]

৩. ভাষাতে নিহিত দুটি আপাতবিরোধী শক্তি রক্ষণশীলতা (conservativeness) ও প্রগতিশীলতা (progressiveness)-র আপাত দ্বন্দ্ব এই পরিবর্তনের আরেকটি কারণ। প্রাচীনত্বের সাথে নতুনত্বের এই সংঘর্ষ থেকে ভাষা নিয়ত পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। Intelligibility ভাষার একটি মহৎ গুণ—আর এই গুণ হচ্ছে সমাজজীবনের প্রধান বাহন। তাই ভাষার বিবর্তন সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। প্রতিটি ভাষার অন্তরে একটি সংস্কারবোধ বা সংরক্ষণশীলতা রয়েছে। এ কারণেই শত পরিবর্তনের মধ্যেও ভাষা তার মূল থেকে বিচ্যুত হয় না। তবু ভাষার সচল গতিধারায় আর একটি গুণ প্রগতি বারবার তাকে আঘাত করে যায় বলে ধীরে ধীরে ভাষার ধ্বনি-সমষ্টিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ ভাবে বহু যুগের পরিবর্তন যখন নিয়মিত পরিবর্তনের আকার ধারণ করে তখন তা এক বিশেষ সূত্রে পরিণত হয় বলে ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সাদৃশ্য বা Analogy ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণ। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, মানুষ তার প্রকৃতিগত অনেক কারণের মতো ভাষার মধ্যেও একাত্মতা খুঁজে বের করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। যে সাম্যবোধ মানুষের মনে, তার প্রকাশ ভাষায় হবে, এটাইতো স্বাভাবিক। একই শ্রেণীর পদের বিভিন্ন রূপকে একরূপ দেয়ার চেষ্টার ফলশ্রুতি

---

১. ভাষার ইতিবৃত্ত : ধ. সুকুমার সেন
২. ভাষাতত্ত্ব : অতীন্দ্র মজুমদার

সকল উক্তি ভাষার ব্যাকরণকে সহজতর করার প্রচেষ্টা। কোনো শব্দ যখন অন্য আরেকটি শব্দের আকার পায় তখনই তাকে বলে সাদৃশ্য বা Analogy. এর প্রভাব এতো মারাত্মক যে, অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মকে অস্বীকার ক'রে অন্য শব্দের প্রভাবে শব্দের সৃষ্টি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এখানে সংস্কৃত 'সর্ব' থেকে বাংলায় 'সব' হওয়ার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি লক্ষ্য করতে হয়। সংস্কৃতে শব্দ মধ্যস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জন (conjunct) ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃতে দ্বিত্ব (double) ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এবং প্রাকৃতের এই দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলায় একটি মাত্র ব্যঞ্জনে পরিণত হলো, আর এই ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হলো। যেমন নিদ্রা>নিদ্দ>নীদ ; ভক্ত>ভত্ত>ভাত। কিন্তু সং. 'সর্ব' প্রাকৃতে 'সব্ব' হলো ঠিকই, বাংলায় রূপান্তরিত হতে গিয়ে 'সভা' শব্দের প্রভাবে 'সাব' না হয়ে হলো 'সব' (সর্ব>সব্ব>সব)। এভাবে ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'সাদৃশ্য' একটি দারুণ ভূমিকা পালন করে।

৫. একটি ভাষা যখন Standard ভাষায় উন্নীত হয়, তখন সেখানে কোনো একটি বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তির বিশেষ বচনভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট এক পরিবারের অবদান বিশেষভাবে স্বীকার্য। 'উপভাষা গড়ে ওঠে সেই গোষ্ঠীর বা সমাজের সবচেয়ে প্রতিভাশালী বা প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির দ্বারা। তাঁর প্রভাবেই তাঁর সমাজে সেই বিশেষ উচ্চারণ ও বাকভঙ্গি প্রতিষ্ঠা পায় এবং এক কাল থেকে আর এক কালে অনুসৃত হয়।[১] বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে চৈতন্যদেব, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের চিন্তা–ভাবনা যেমন মধ্যযুগের গীতিকবিদের কাব্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভাষার গতিধারায়ও তার প্রভাব অস্বীকার করবার নয়। ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একই কথা বলা চলে। 'এই রকম কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বা পরিবারের উচ্চারণের কায়দাই ধ্বনি পরিবর্তনের গভীরে কাজ ক'রে চলে।'[২]

৬. ধ্বনি পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। অর্থাৎ দুটো বা ততোধিক ভাষা সম্প্রদায়ের যদি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা ক'রে চলে তাহলে এক সম্প্রদায়ের ধ্বনি অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বনিতে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়। ধ্বনিগত বিশেষত্বও যদি কোনো সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। ভারতীয় আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং তা থেকে অপভ্রংশ হয়ে বাংলা হিন্দি অসমিয়া গুজরাতি পাঞ্জাবি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোতে ট ঠ ড ঢ ণ ধ্বনিগুলো রয়েছে। অথচ যে মূল ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়, তার একটি শাখা, যেখান থেকে ল্যাটিন গ্রিক ভাষার সৃষ্টি হয়, সেখানে এই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলো অনুপস্থিত। এর কারণ, পণ্ডিতদের ভাষায় 'ভারতবর্ষে আদি আর্যরা আসার পরই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার সংস্পর্শে আসে। দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি খুব প্রবল। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে মূর্ধন্য ধ্বনি সংস্কৃতে এবং তার থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় এসেছে। কিন্তু গ্রিক ল্যাটিন ভাষা

---

১. সংস্কৃত : অতীন্দ্র মজুমদার
২. প্রাগুক্ত

এ রকম ভাষাগোষ্ঠীর সংশ্রবে আসে নি বা তাদের আসবার কারণ ঘটেনি।[১] এ কারণে এসব ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায় না।

৭. ভৌগোলিক অবস্থান ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিভিন্ন রকমের—তার প্রভাব যেমন প্রকৃতিতে তেমনি মানুষের শারীরিক গঠনে ও মানসিকতায়। বিভিন্ন ধ্বনি কেবলমাত্র এই ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উচ্চারণ-পদ্ধতি গ্রহণ করে। যেমন শীতপ্রধান এলাকার মানুষের উচ্চারণে মুখবিবর নির্গত ধ্বনি ওষ্ঠ যতোটা সম্ভব কম প্রসারিত হয়ে উচ্চারিত হয়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের উচ্চারণে কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণে ব্যাপকতা লাভ করে। তবে অঞ্চলগত এই উচ্চারণ অবশ্যম্ভাবী, এ কথা ভাষাবিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে স্বীকার না করলেও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর কোনো কোনো ধ্বনির পরিবর্তন কখনো কখনো নির্ভরশীল, একথা স্বীকার করতেই হয়।

১. ভাষান্তর : অতীন্দ্র মজুমদার।

ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র

ধ্বনি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে এগিয়ে চলেছে। চলেছে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে। আর সেই নির্দিষ্ট নিয়মকে 'ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র' নামে আখ্যায়িত করা চলে, কেননা তা নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। তবে এ সূত্র গণিতের ফর্মুলা নয়, এ সূত্র তাই অমোঘ সত্য বলে হয়তো সর্বক্ষেত্রে মেনে নেয়া সম্ভবও নয়। তবু এর অসংখ্য ব্যতিক্রম থাকলেও নির্দিষ্ট সূত্রের মাধ্যমেই এর এগিয়ে চলার অভিযান। ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রের যথার্থ যাচাই করার পূর্বে ড. সুকুমার সেন যে দুটো পূর্বশর্ত তুলে ধরেছেন, তা মনে রাখা দরকার : (১) 'ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রটি কোনো বিশেষ ভাষার বিশেষ অবস্থায়ই খাটে, অন্য অবস্থায় খাটে না' ; এবং (২) 'শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলির সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই সূত্রের অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটিতে পারে, অন্যথা নয়।'

তিল তিল করে সৌন্দর্যের সঞ্চয়নে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছিলো ; কণা কণা জলের সঞ্চয়নে সাগরের ; তেমনি জলকণার ধারাবাহিক প্রবাহে বৃষ্টিধারা জন্ম নেয়। কিন্তু তিল তিল সৌন্দর্যের একক অথবা জলকণার আলাদা এককে তিলোত্তমা কিংবা সাগর বা বৃষ্টি নাম দিলে তা মূল্যহীন। জলকণার ধারাবাহিকতা আমাদের মনে যখন বিমুগ্ধ অন্তরঙ্গ কল্পনার রাজ্য সৃষ্টি করে, তখন জলকণার পৃথক অস্তিত্ব যেমন আমরা অস্বীকার করি, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা একটি ধ্বনির প্রবাহকে গুরুত্ব দিই বেশি করে। যেমন, 'শিল্প অপূর্ব দেখতে' এখানে শ+ই+ল+আ, অ+প+উ+র+ব+অ, দ+এ+খ+ত+এ ধ্বনিগুলো একত্রে প্রবাহমানভাবে উচ্চারিত হয়ে একটি মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে ; কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনিগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হলে এর অর্থ হয়তো প্রকাশিত হতো, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তা একেবারেই অসম্ভব, অবাস্তব ও অবান্তর। কিন্তু একসাথে উচ্চারণে ধ্বনিগুলোর বিশেষ উচ্চারণ সবক্ষেত্রে অটুট রাখা সম্ভব নয়। পূর্বের বা পরের কিংবা উভয় ধ্বনির প্রভাবে তা অহরহ পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণ কালে অসাবধানতাবশতও এই উচ্চারণে পরিবর্তন আসে। শব্দ মধ্যস্থিত কোনো একটি ধ্বনির উপর শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের কারণেও ধ্বনির বিকৃতি খুবই স্বাভাবিক। অনুভূতির পরিমাণের সাথে ভাষার আবেগের সৃষ্টিজনিত কারণেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধ্বনির উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে কখনো কোনো ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়ে (শিল্পু ভারী মিষ্টি মেয়ে) উচ্চারিত হতে পারে ; আবার কখনো পুরো একটি ধ্বনি বাদ পর্যন্ত (আজি>আজ) পড়ে যেতে পারে।

এই ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিকে মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১. সমীভবন ; ২. বিষমীভবন ; ৩. স্বরাগম ; ৪. অপিনিহিতি ; ৫. অভিশ্রুতি ; ৬. স্বর সঙ্গতি ; ৭. স্বরলোপ ; ৮. য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি ; ৯. বিপর্যয় ; ১০. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ; ১১. নাসিক্যীভবন ; ১২. মর্ধুন্যীভবন ; ১৩. উষ্মীভবন ; ১৪. সকারীভব ; ১৫. রকারীভবন ;

১৬. তালব্যীভবন ; ১৭. ঘোষীভবন ; ১৮. অঘোষীভবন ; ১৯. কণ্ঠ্যনালীয়ভবন ; ২০. মহাপ্রাণিত ; ২১. স্বল্পপ্রাণিত ; ২২. সমাক্ষর লোপ।

১. সমীভবন (Assimilation)

পাশাপাশি কিংবা যুক্ত দুটো ধ্বনির একটি অন্যটির প্রভাবে অথবা পারস্পরিক প্রভাববশত উভয়েই বদলে গিয়ে সাম্য লাভ করবার চেষ্টা করলে তাকে ধ্বনিবিজ্ঞানে যে নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তা হলো সমীভবন বা সমীকরণ।

তিনভাবে সমীভবন সম্ভব : (ক) পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিতে বদলে দিলে তাকে বলে প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation)। বিদ্যা > বিদ্দা ; পদ্ম > পদ্দ এই শ্রেণীর।

(খ) পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে যদি বদলে দেয় তার নাম পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)। এই শ্রেণীর উদাহরণ হচ্ছে, উৎ+উীন>উড্ডীন ; (সং) অল্প>(পালি) অপ্প ইত্যাদি।

(গ) পারস্পরিক প্রভাবে দুটো ধ্বনিই যদি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনির আগম ঘটায় তাকে বলে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন (Mutual Assimilation)। এর উদাহরণ মক্ষি>মচ্ছি>মাছি ; মিথ্যা> মিছা।

২. বিষমীভবন (Dissimilation)

বিষমীভবন হচ্ছে ঠিক সমীভবনের উল্টোটা। এ ক্ষেত্রে পদের মধ্যবর্তী একই ধ্বনি পাশাপাশি দু'বার ব্যবহৃত হলে তার একটি ধ্বনি বদলে যায়। শরীর > শরীল ; লাল > নাল ইত্যাদি গ্রাম্য উচ্চারণে বেশ সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়াও প্রচুর উদাহরণ রয়েছে—(সং) পিপীলিকা > (পালি) কিপিল্লিকা ; (ল্যাটিন) মারমর (Marmor) >(ইং) মার্বল ইত্যাদি।

৩. স্বরাগম (Prothesis)

ভাষার সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যেই স্বরাগমের উৎপত্তি হলেও ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বরাগম গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত যুক্ত অথবা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে এই স্বরধ্বনির ব্যবহারের রীতির নামই স্বরাগম (Prothesis) যেমন, (সং) স্পর্ধা> (বাং) আস্পর্ধা ; (ইং) স্টেশন>(বাং) ইস্টিশান ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Epenthesis)

শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' ধ্বনিকে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে আগে থেকে উচ্চারণ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে, এর নামই অপিনিহিতি (Epenthesis)। যেমন, রাতি>রাইত; কালি>কাইল ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এর ব্যবহারে খানিকটা ঘাটতি দেখা যায়। অতঃপর কেবলমাত্র বাংলাদেশেই এখনও এর প্রচুর এবং ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রাকৃতে কিন্তু অপিনিহিতি একেবারে দুর্লভ। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় মাঝেমধ্যে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা ও সিংহলি ভাষার মতো এতো নিয়মিত ও প্রবল নয়।

অপিনিহিতিকে কেউ কেউ কেবলমাত্র 'ই' বা 'উ' ধ্বনির আগমকে বুঝিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, "অনেকাক্ষর শব্দে এই স্বরবর্ণ যথাস্থানেই থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব হইতেই যেন ইহার আবাহন ঘটিয়া, অধিকন্তু পূর্বের অক্ষরে এই 'ই' বা 'উ' কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাক্ষর শব্দে এই স্বরবর্ণের স্বস্থান হইতে কেবল পূর্বে আনয়ন ঘটে।"

উদাহরণ : ক. ই-কারের আগম : আলিপনা > আইলপনা ; করিয়া > কইরয়া।

খ. উ-কারের আগম : মাছুয়া > মাউছুয়া ; সাধু > সাউধ।

গ. য-ফলার অন্তর্গত ই-কারের অপিনিহিতি সাধারণত বাংলাদেশে হয়। যেমন, কন্যা > কইন্না ; সত্য > সইত্ত (সৎতিঅ)

ঘ. যুক্ত ক্ষ ও জ্ঞ ধ্বনির উচ্চারণ যথাক্রমে খ্য ও গ্য ধ্বনির অনুরূপ। এদের বেলাতেও ই-ধ্বনির অপিনিহিতি হয়ে থাকে। যেমন রাক্ষস > রাইক্খস্ ; শজ্ঞ > শইগ্গো।

৫. অভিশ্রুতি (Umlaut or vowel mutation)

অপিনিহিতির ই-ধ্বনি ও উ-ধ্বনি পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় একাক্ষর শব্দে সাধারণত: লোপ পায় এবং একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দ আগের স্বরধ্বনিকে প্রভাবান্বিত করে তাকে বদলে দেয়ার রীতি রয়েছে, একে বলা হয় অভিশ্রুতি। যেমন, মাখিয়া > মাইখ্যা > মেখ্যা > মেখো > মেখে এখানে অপিনিহিতির ই-কারের প্রভাবে পদের পূর্বস্থ স্বরের পরিবর্তনজাত নতুন রূপ ধারণই অভিশ্রুতির কাজ।

বাংলা আধুনিক চলিত রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি। এর ফলে একদিকে শব্দ যেমন আকারে ছোট হয়, উচ্চারণও তেমনি সহজ হয় বলে বাংলার চলিত রূপে অভিশ্রুতি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কেবল বাংলা ভাষায় নয়, অভিশ্রুতির সন্ধান বিশ্বের বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ ভাষাতেই মেলে। ইংরেজি, জার্মান, সুইডিশ, ওলন্দাজ ভাষা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজি Man এর রূপ ছিল Mann যার বহুবচন Manniz (পরবর্তীকালে যার রূপান্তর Manni)। অপিনিহিতি ই (e) কারের প্রভাবে a বা আকারের e বা এ-কারে পরিবর্তিত। (Manniz>Manni>Mainn> Menn>Men)।

পশ্চিম বাংলার উপভাষায় অপিনিহিতির স্বর আগের স্বরধ্বনির সাথে মিলিত হওয়ার কয়েকটি নিয়ম লক্ষ্য করা যায় :

ক. করিয়া > করে ; চলিয়া > চলে—অ+ই+আ = ও+এ

খ. চলিল > চললো ; সত্য > সইত্ত > সত্তো—অ+ই+অ = ও+ও

গ. রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে ; রাখিলা > রাখলে—আ+ই+আ = এ+এ

ঘ. নাচিব > নাচব ; রাখিও > রেখো ; আ+ই+অ বা ও = এ+ও

ঙ. উড়াইয়া > উড়িয়ে ; করাইয়া > করিয়ে > করে—অ + আ + ই + উ-+এ অথবা ও+আই+আ = যথাক্রমে আ+ও, আ+ই+ই+উ ; উ-ই+এ

চ. শহরিয়া>শহুরে ; কান্দনিয়া>কাঁদুনে = অ, আ, আই, ই, উ, এ ও + অ+ইয়া = অ>পরে যথাক্রমে ও, আ, ই, এ, উ, উ+উ+এ

ছ. পটুয়া>পোটো ; জলুয়া>জো'লো—অ+উ-আ – ও+ও

জ. বলিয়াছি>বলেছি ; করিয়াছি>করেছি = অ+ই+আ+ই = অ'>ও+এ+ই

ঝ. মাছুয়া>মাউছুয়া>মেছো ; গাছুয়া>গাউছুয়া> গেছো—আ-উ+আ = এ+ও

উপরের উদাহরণে কোনো কোনো স্থানে (') চিহ্নটি ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এর কারণ, চলিত ভাষায় অপিনিহিতির ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ – ও, আ = এ সাধারণভাবে অভিশ্রুতির এই পরিবর্তনে ই-কারও লোপ পেয়ে যায়। অভিশ্রুতির ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রূপ নেয়া ধ্বনি অ = ও হয়ে যায় বলে সেখানে লুপ্ত অ-কারের চিহ্ন হিসেবে (') চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. স্বরসংগতি (Vowel harmony)

বাংলা চলিত ভাষায় (কখনো কখনো সাধু ভাষায়) আগের বা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদের মধ্যবর্তী অন্যান্য স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান বদল হবার রীতিকেই বলা হয় স্বরসংগতি (Vowel harmony)। এই পরিবর্তনের লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হলো, 'উচ্চ' (high) স্বরধ্বনির প্রভাবে 'মধ্য' (middle) ও 'নিম্ন' (low) স্বরধ্বনি একধাপ করে উপরে ওঠে অথবা 'মধ্য' বা 'নিম্ন' স্বরধ্বনির প্রভাবে একধাপ নিচে নেমে আসে। যেমন, সত্য>শোত্তো ; মিলে>মেলে

বাংলা ভাষায় এই স্বরসংগতির যথেষ্ট নমুনা মেলে : পরবর্তী স্বরের সাথে এবং পূর্ববর্তী স্বরের সাথে সংগতির কিছু উদাহরণ এখানে দেয়া হলো :

ক. পরবর্তী স্বরের সাথে সংগতি

এর কয়েকটি ভাগ রয়েছে

১. পরবর্তী অক্ষরে (Syllable) ই, উ, য-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ থাকলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণে ও-কার হয়ে যায়। (নীতি>নোতি ; বসুন>বোসুন। ব্যতিক্রম, না-অর্থে (Negative) অ, অন এবং 'সহিত' কিংবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'স' বা 'সম' বসে সেখানে পূর্বের অ>ও হয় না (ন জ্ঞ>অজ্ঞ—উঁগ্‌গো হয় না)

২. পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও থাকলে পূর্বের ই ধ্বনি এ-তে পরিণত হয় (লিখ্ + আ = লিখা > লেখা ; গিল+আ = গিলা > গেলা)।

৩. পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও থাকলে পূর্বের উ>ও হয় (গুণ-এ = গুণে>গোণে ; শুন+আ = শুনা>শোনা)।

৪. পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও থাকলে পূর্বের এ ধ্বনি এ্যা হয় (দেখ্+এ = দেখে > দ্যাখে)

৫. পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ থাকলে পূর্বের এ>ই হয়ে যায় (দেশি>দিশি ; দে+ই = দেই>দি)।

৬. পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও থাকলে পূর্বের ও-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকলেও ই, উ থাকলে ও>উ হয়ে যায় (শোআ> শোয়া ; কিন্তু শো+ই>শুই)।

৭. তিন বা তার বেশি অক্ষরের শেষে যদি ই বা ঈ থাকে তবে পদের মধ্যে অবস্থিত অ বা আ>উ হয় (নাটক+ইয়া = নাটকিয়া>নাটুকে)।

খ. পূর্ববর্তী স্বরের সাথে সংগতি

১. শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে প্রথমে ই থাকলে পরের আ-কার পূর্বের ই-এর প্রভাবে এ-ধ্বনিতে পরিণত হয় (মিছা>মিছে ; দিলাম>দিলেম)।

২. আগে উ বা ঊ থাকলে শেষের আ>ও হয়ে যায় (হুঁকা>হুকো ; পূজা>পূজো)।

৩. দুই অক্ষর যুক্ত শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে অ থাকলে তা হ্রস্ব বা দীর্ঘ ও-কার হিসেবে পরিবর্তিত হয় (রোদন>রোদোন ; ভারত>ভারোত)

৭. স্বরলোপ

পদের মধ্যবর্তী কোনো অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রবল হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে শ্বাসাঘাত কম হওয়া অক্ষরের স্বরধ্বনির ক্ষীণতর হয়ে যদি একেবারে মিলিয়ে যায়, তাকে বলা হয় স্বরলোপ। তিনভাবে তা হওয়া সম্ভব :

ক. আদিস্বর লোপ (Aphesis) : ইদানীং> দানীং ; অলাবু> লাবু> লাউ ; দ্বাদশ>দুবাওস>বারহ>বার।

খ. মধ্যস্বর লোপ (Syncope) : ফলাহার>ফলার ; পুরোহিত>পুরুইত>পুরুত ; কাঁদনা>কান্না।

গ. অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) : অগ্নি>অগগি>আগ ; মনুষ্য>মানুষ ; নরঃ>নরো>নর।

৮. য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি (Insertion of Euphonic Glides y & w)

আমাদের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শব্দের মধ্যবর্তী পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি অবস্থিত থাকলে এবং কোনো কারণে তা যুক্ত হয়ে যৌগিক স্বরধ্বনি (Diphthong) হয়ে না গেলে, অনেক সময়েই দ্রুত উচ্চারণের মুহূর্তে এক ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিতে জিহ্বা সঞ্চরণ করার ফলে হয়তো আমাদের অজান্তেই এই দুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে ব্যঞ্জনের অভাবজনিত শূন্যতা পূরণ করার ঝোঁকবশত একটি ভুঁইফোড় ধ্বনি উচ্চারণ করতে দেখা যায়। এরই নাম শ্রুতিধ্বনি (Glide)। লিখ্য বাংলায় তার আলাদা লিপি নেই সত্যি, তবু কখনো কখনো এতে প্রাধান্য বিস্তার করে যে, সেটা বানানেও দেখা দিতে পারে। অনেক ভাষায় 'র' এবং 'ন' ধ্বনির মাঝখানে 'দ' শ্রুতিধ্বনি দেখা যায়। যেমন— বানর>বান্দর>বাঁদর ; সুন্দর (বৈদিক)>সুন্দর (সং)। আমাদের ভাষায় একটি অন্যতম বিশিষ্টতা হচ্ছে 'য়' শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতি। পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে 'য়' শ্রুতি বা 'ব' (অন্তঃস্থ –Half Vowel)-শ্রুতির আগমই 'য়'-শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতি।

উদাহরণ : ক. য় শ্রুতি : মা আমার>মায় আমার ; যা আমার ছিলো দুখের বাঁধন>মায়ামার ছিলো দুখের বাঁধন।

খ. ব শ্রুতি : যা+আ = $\frac{\text{যাওয়া}}{\text{ব}}$

খা+আ = $\frac{\text{খাওয়া}}{\text{ব}}$

নও+আব = $\frac{\text{নওয়াব}}{\text{ব}}$ > নয়াব>নবাব

৯. বিপর্যাস (Metathesis)

পদের মধ্যবর্তী দু'টো ধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের নাম বিপর্যাস বা বিপর্যয়। যেমন, বাক্স>বাস্ক ; রিকশা>রিশ্কা ইত্যাদি।

১০. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxix)

বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বিন্যাস, ভাষাকে সহজ ও কাব্যময় করে তোলার জন্যে যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার, তা হলো স্বরধ্বনির প্রচুর ব্যবহার ও প্রয়োগ। সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিকে এ কারণেই ভেঙে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনির ব্যবহার করার রীতি বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। এরই নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। বাংলা ছন্দে স্বাভাবিকতা ও মাধুর্য আনবার জন্যেও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ কেবল আধুনিক বাংলায় নয়, প্রাচীন বাংলায়ও এর প্রচুর প্রচলন লক্ষণীয়। প্রধানত সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে এই ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে বেশি। সাধারণত দেখা যায় অ, ই, উ, এ, ও ধ্বনিগুলোই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

অ = রত্ন > রতন ; মূর্তি > মূরতি
ই = গ্লানি > গিলানি ; স্নান > সিনান।
উ = মুক্ত > মুকুতা ; মুল্ক > মুলুক।
এ = গ্রাম > গেরাম ; ক্লাস > কেলাস।
ও = শ্লোক > শোলোক ; মুর্গ > মোরগ।

১১. নাসিক্য ভবন (Nasalization)

পাশাপাশি অথবা কাছাকাছি অবস্থিত নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে উচ্চারিত হলে তাকে বলে নাসিক্যীভবন। যেমন, চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ ; সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ।

এ ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাব ব্যতিরেকেও স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে উচ্চারিত হয়, এর নাম স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization)। যেমন, খোকা > খোঁকা ; হাসি > হাঁসি।

১২. মূর্ধণ্যীভবন (Cerebralization)

মূর্ধা দ্বারা উচ্চারিত ঋ, র, ষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পর্যবসিত হলে তাকে বলা হয় মূর্ধণ্যীভবন। যেমন, অস্থি>আঁঠি ; প্রতিমা>পটিমা ইত্যাদি।

মূর্ধণ্যীভবনের আরো একটি রূপ রয়েছে, যেখানে মূর্ধা-উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাব ছাড়াও দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি আপনা-আপনিই মূর্ধণ্য ধ্বনি হয়ে উচ্চারিত হয়। এর অন্য একটি নাম আছে তা হলো স্বতোমূর্ধণ্যীভবন (Spontaneous cerebralization)। উদাহরণ, পততি>পড়ই>পড়ে ; অতীতি > অটতি।

১৩. উষ্মীভবন (Spirantization)

ক, গ, ত, দ, প, ব এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের মুহূর্তে নিঃশ্বাসবায়ু একবারে নির্গত না হয়ে খানিকটা বেশি সময় নিয়ে উচ্চারিত হলে হয় উষ্মীভবন। যেমন,

কালীপূজা > খালিফুজা ; কাগজ>খাজজ। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১৪. সকারীভবন (Assiblation)

এইসব উষ্মধ্বনি স, শ কিংবা ইংরেজি z–এর মতো উচ্চারিত হলে তার নাম সকারীভবন (Assiblation)। যেমন, মেজদিদি>মেজ্জদি (মে Z দি) ; পাছে>পাসে।

১৫. রকারীভবন (Rhotacism)

'স' প্রথমে ইংরেজি 'z' এর মতো উচ্চারিত হবার পর 'র' এবং 'দ'–ধ্বনি প্রথমে 'ড' হয়ে পরে 'ড়' এবং শেষে 'র'–এ পর্যবসিত হলে হয় রকারীভবন। যেমন, পঞ্চদশ>পন্নরহ >পন্দ্রহ>পন্দ্রে ; hasa>haza>hare ইত্যাদি।

আরো লক্ষণীয়, শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনের আগে 'রেফ' থাকলে সেই 'র' দুই স্বরধ্বনির মধ্যে এসে 'হ' এবং শব্দের শেষের 'হ' লুপ্ত হয়ে যায়। বহু সংস্কৃত বিদেশী এবং প্রাকৃত শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের ফল হিসেবে বাংলায় রূপ বদল হয়ে যায়। একে বলা হয় 'শব্দ মধ্যস্থ র ও হ–লোপের প্রবণতা', ইংরেজিতে যার নাম 'tendency to drop internal r and h.'

উদাহরণ. ক. র–লোপ : কর্ম > কম্ম>কাম ; নৃত্য>নেত্ত

খ. হ–লোপ : ফল হর>ফলর ; চাহ>চা।

১৬. তালব্যীভবন (Palatalization)

জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি ড, ট, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহ্বার পেছন দিকের তালু স্পর্শ করে শ–এর মতো উচ্চারিত হয়, একে বলে তালব্যীভবন। যেমন, education>এজ্যুকেশন ; Association>এসোসিয়েশন।

১৭. ঘোষীভবন (Vocalization)

অঘোষধ্বনি ঘোষ হয়ে উচ্চারিত হওয়াকে ঘোষীভবন বলা হয়। যেমন, শাক >শাগ; অলক>অলগে

১৮. অঘোষীভবন (Devocalization)

ঘোষধ্বনি অঘোষ হয়ে উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় অঘোষীভবন। যেমন, বাবু>বাপু ; বীজ>বিচি।

১৯. কণ্ঠ্যনালীয় ভবন (Glottalization)

ঘ, ধ, ভ ইত্যাদি ধ্বনি বাংলাদেশের কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এবং সিন্ধি ও পাঞ্জাবি ভাষায় গ', ধ', ধ' ধ্বনিতে পরিণত হয়, এর নাম কণ্ঠ্যনালীয় ভবন। এই ধ্বনি–গুলোরও একটি বিশেষ নাম আছে, তা হলো অবরুদ্ধ ধ্বনি (Recursive)।

২০. মহাপ্রাণিত (Aspirated)

স্বল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির এবং 'হ' ধ্বনি একসাথে উচ্চারিত হলে তাকে বলে মহাপ্রাণিত। যেমন, কিঞ্চিৎ মাত্র>কিত্তি মাত্র ; এবেহোঁ>এবহোঁ>এভোঁ।

অনেক সময় শব্দের মধ্যবর্তী স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়: যেমন, মহিষ>ভৈঁষ।

২১. স্বল্পপ্রাণিত (Deaspirated)

মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হওয়ার নাম স্বল্পপ্রাণিত: যেমন, সুখ>সুক্; দুগ্ধ>দুদ্ধ>দুধ্>দুদ্

অনেক সময় শব্দের মধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বল্পপ্রাণ হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন, ভগ্নী>ভগিনী>বঘিনী>বহিন্

২২. সমাক্ষর লোপ (Haplology)

একই ধরনের ধ্বনি শব্দে পাশাপাশি অবস্থিত থাকলে ভাষার সচলতা ও কথা বলার দ্রুততার জন্য কখনো কখনো তার একটি লোপ পায়, একে বলে সমাক্ষর লোপ। যেমন, ছোটদিদি>ছোটদি>ছোড়দি; বড়দাদা>বড়দা ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষায় কি ভাবে ধ্বনি পরিবর্তন লাভ করে, সে সম্পর্কে জানার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আজো এ গবেষণার শেষ হয় নি চলছে এবং চলবে।

জ্যাকব গ্রিম (Jacob Grimm) এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ধ্বনির বিবর্তন সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবশ্য যিনি আলোচনা করেন, তিনি ডেনিশ ভাষাতত্ত্ববিদ রাস্কমুরাক (Rusmurak)। তাঁর আলোচনা কেবলমাত্র প্রভাতের সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মির সন্ধান দান মাত্র। গ্রিমই সূত্রাকারে এই ধ্বনি পরিবর্তনকে একটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করতে চাইলেন জার্মান ভাষার পরিবর্তন প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য না হলেও গ্রিমের সূত্র সম্পর্কে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ভাষার বিকাশ অনুধাবনে এর অবদান অনস্বীকার্য

গ্রিমের সূত্র (Grimm's Law) নিম্নরূপ

১। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের প্রথম ধ্বনি অর্থাৎ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি p, t, k প্রত্ন জার্মানী ভাষায় দ্বিতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ অঘোষ উষ্ম ধ্বনিতে হয় পরিবর্তিত। যেমন, Pater>Father (P>F ; t>th)।

২। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের তৃতীয় ধ্বনি অর্থাৎ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি b, d, g প্রত্ন জার্মানী ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে হয় বর্গের প্রথম ধ্বনি অর্থাৎ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি p, t, k; যেমন, Dekan>ten (d>t)।

৩। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের চতুর্থ ধ্বনি অর্থাৎ ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনি bh, dh, gh প্রত্ন জার্মানী ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে বর্গের তৃতীয় ধ্বনি অর্থাৎ ঘোষ স্পৃষ্ট বা উষ্ম ধ্বনি ph, th, kh এবং প্রত্ন ইতালি এবং প্রত্ন ল্যাটিনে f, th, h ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন, Bhrater>Brother.

অবশ্য জার্মানি ভাষায় p, t, k ধ্বনি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে s, p, k ইত্যাদি ব্যঞ্জন ধ্বনির অব্যবহিত পরে। এবং প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় অঘোষ স্পৃষ্ট p, t, k ধ্বনিগুলো প্রত্ন জার্মানী ভাষায় বরাবরই অপরিবর্তিত থেকেছে।

ভার্নারের সূত্র (Verner's Law)

ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে আরেকজন পণ্ডিত আন্তরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর নাম, Verner. তিনি গ্রিমের সূত্রের পরিপূরক আরেকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এই সূত্র ভার্নারের সূত্র বা 'Verner's law' বলে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে পরিচিত। সূত্রটি নিম্নরূপ :

অব্যবহিত পূর্ববর্তী অক্ষরে (syllable) প্রস্বর বা ঝোঁক (accent) না থাকলে মূল ভাষার প্রথম ধ্বনি জার্মান ভাষায় দ্বিতীয় ধ্বনি না হয়ে তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন, Pater>Father (Fader) = t>d.

গ্রাসম্যানের সূত্র (Grassman's Law)

আরেকজন ভাষাবিজ্ঞানী ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাঁর নাম গ্রাসম্যান (Grassman) তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

প্রত্ন গ্রিক ভাষার ইতিহাস কোনো একটি স্তরে অব্যবহিত ধ্বনিসমূহের মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথম স্পষ্ট ধ্বনিটি তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে বলে তা নিম্নরূপে বিবর্তিত হয় :

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়>প্রত্ন গ্রিক>গ্রিক ;

bhewdhomaj>phewthomaj>pewthomaj

dhrighm> thrikha>trikha

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গ্রাসম্যানের এই সূত্র আলোচনা করে সংস্কৃতেও এ ধরনের পরিবর্তনের সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়>সংস্কৃত

dhedhe>dadha (dh>d)

bhendh>bandha (bh>b)

অর্থাৎ সংস্কৃতে b, d, g-তে আর গ্রিকে p, t, k-তে মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছিলো। যার ফলে, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি bh, dh, gh প্রত্নগ্রিকে মহাপ্রাণতা লোপ পাবার আগেই অঘোষ ph, th, kh হয়েছিলো ; আর এ কথাও এখানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্নগ্রিকের মহাপ্রাণহানি ও সংস্কৃতের মহাপ্রাণহানি স্বতন্ত্রভাবেই ঘটেছিলো, কেননা সংস্কৃতে অঘোষতা হতে দেখা যায় নি এই পরিবর্তনকে ভাষাতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় Phonetic change' বা 'Sound change'. আর আধুনিক পদ্ধতিতে এর নাম দেয়া হয়েছে Phonemes change বা 'ধ্বনিমূলের পরিবর্তন'।

গ্রাসম্যানের সূত্রকে অন্যভাবে বললে বলা যায়, মূল ভাষার কোনো শব্দে পাশাপাশি দুই অক্ষরে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার মধ্যে একটি গ্রিকে এবং আর্য শাখায় তৃতীয় বর্গ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছিলো।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বছরেরও বেশিকাল ধরে বিস্তৃত। সাহিত্যের ইতিহাসও ধ্বনি পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে চলে। তার প্রমাণ

প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কালানুক্রমিক চিরায়ত সাহিত্য থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো :

চর্যাপদ : কাহ্নপাদ (৬৫০ দ্বাদশ শতাব্দী)

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেণি করণ্ডু কশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহনিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জোজোই রত্তো।
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন : (বংশী খণ্ড) চতুর্দশ শতাব্দী (শেষার্ধ)

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কূলে
কেন বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে
তার পা বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
অকর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হরা নিলো পরাণী॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য : মুকুন্দরাম (ষোড়শ শতাব্দী)

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়
প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নহি সয়॥
চন্দনাদি তৈল দিব হয়্যা সহচরী।
সামলী গাছমা দিব সুবাসিত করি॥

বৈষ্ণব পদাবলী : দ্বিজ চণ্ডীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

পদ্মাবতী : আলাওল (সপ্তদশ শতাব্দী)

স্রোত গত মাত্র রূপ-সুধা-রস বোল।
প্রেমের সাগরে শত উঠিল হিল্লোল॥
প্রেমরূপ-মূল, প্রেম বিরহের মূল।
অমৃত জড়িয়া বিষ করিল আকুল॥
পরম প্রেমের সিন্ধু অগাধ গভীর।
ক্ষেণেকে ভাঙরে ফেলে সমুদ্রের নীর॥
বিষধরে ডংশিলে যেহেন লহরয়।
আপাদ মস্তক আদি হৈলে বিষময়॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ বাতাইব কেনে
যাহার মরমে ব্যথা সেই মাত্র জানে॥
অন্তরে প্রেমের ঘায় হইয়া মুরছিত।
ভূমিতে পড়িল নৃপ চৈতন্য রহিত॥

অন্নদামঙ্গল কাব্য : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (অষ্টাদশ শতাব্দী)

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা ছোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া-পান গাঁথি মালা গলে
কানে নড়ি ঝার রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥

প্রেম : ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্রকের হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
মানস বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা॥

সারদামঙ্গল : পঞ্চম স্বর্গ (১২নং পদ) **বিহারীলাল চক্রবর্তী**

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতী তোমার!

হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার।

বঙ্গভাষা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩)

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি
পরধনে লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি, কুক্ষণে আচরি।

রূপ-নারানের কূলে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন -
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

দারিদ্র্য : কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা, দিয়াছ তাপস
অসংকোচ প্রকাশের দুরূহ সাহস।

বোধ : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)

ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে ;
আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে ;

উপেক্ষা সে করেছে আমারে
ঘৃণা ক'রে চলে গেছে-যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালবেসে তারে ;

পাঞ্জেরী : ফররুখ আহমেদ (১৯১৮-১৯৭৪)

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা : শামসুর রাহমান (১৯২৯ জন্ম)

সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষমাসে!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

কথায় কথা বাড়ে : ফজল-এ-খোদা (জন্ম ১৯৪১ খ্রি.)

কথায় কথা বাড়ে, কথার কথা সব কথা বলা যায়
এই তো প্রকৃতি, ফুল, নদী, বন
আলোকলতা, গাছের ছায়া, বিল
গোলাপ কাঁটা, প্রজাপতি, ঘাস,
কথায় কথা বাড়ে, কথার কথা সব কথা বলা যায়।
দিনের শেষ, রাতের শুরু অন্ধকার
কখনো চাঁদ, কখনো মেঘ, বৃষ্টি
বিশাল দিক, দিগন্ত বাগান
জোছনার করতালি
তবুও শূন্যতা
নিরাকার
কথায় কথা বাড়ে, কথার কথা সব কথা বলা যায়।

শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

আজকের বিশ্বে, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে কে বলতে পারে, কেবলমাত্র মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টির নামই ভাষা। এইমাত্র কদিন আগের খবর Hindusthan Standard Magazine Section (April 7, 1963) বানরের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি যদি অর্থবোধক হয়, তবে তাকেও ভাষার পর্যায়ে স্থান দিতে হবে। এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন রাশিয়ার দুজন পণ্ডিত–বিজ্ঞানী এ. মারকোভ ও পি. নভিকভ। তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন অধ্যাপক স্কিনকিন প্রদত্ত তত্ত্ব আর তথ্যের উপর নির্ভর করে, এক নতুন আবিষ্কারের উদ্দীপনায় মাতাল হয়ে।

কিন্তু সে যাই হোক, আদিম কাল থেকে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টির প্রয়োজন হয়ে এসেছে। সেই আদিম কালের মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ভাষার নমুনা আমরা এ যুগে পাই না, একথা সত্যি; তবু তাদের সেই ভাষার মধ্য দিয়েই রচিত হয়েছে আজকের বিশ্বমানবের ভাষার মূল ভিত। কিন্তু সেই আদিকালের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বরূপ আজকের ভাষায় রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত কতোখানি রক্ষিত হয়েছে, সেটা ভাববার বিষয়। অতি সাধারণ এ কালেরই একটি শব্দের রুট আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, ভাষা কতই না পরিবর্তনশীল। আমাদের অতি পরিচিত একটি শব্দ লাউ, কিন্তু উৎপত্তি কোথা থেকে? সংস্কৃত 'অলাবু' প্রাকৃতে 'লাবু' হয়ে বাংলায় হলো 'লাউ'। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কালের প্রবাহ কেমন করে একেকটি শব্দ তার চেহারা পরিবর্তন করে চলেছে। এতো গেল ধ্বনিতাত্ত্বিক অর্থাৎ শব্দের বাইরের রূপগত পরিবর্তনের কথা; শব্দের অর্থগত পরিবর্তন শব্দকে কালের গতির সাথে সচল প্রবহমাণ করে জীবন্ত করে রাখে। আমি যদি কারো সাথে কথা বলতে গিয়ে বলি 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ... আইস, আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিতেছি' সাথে সাথে কেউ নিশ্চয়ই বলে উঠবে 'এ বঙ্কিমী ভাষায় কথা বলা হচ্ছে।' অথবা 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেল' উচ্চারণ করার সাথে সাথেই বলা হবে 'চর্যাপদের ভাষায় বলা হচ্ছে—' অর্থাৎ আজকের দিনে আমরা যে ভাষায় কথা বলি এগুলো সে ভাষা নয়।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে এ কথা বোধ হয় স্পষ্ট হতে পারে যে, সময়োপযোগী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাটাই হচ্ছে সঠিক ভাষা ব্যবহার রীতি। অর্থাৎ, যে কালে যে ভাষার ব্যবহার, সেই ভাষাই অন্য কালে হয় প্রাচীন ভাষা অথবা দুর্বোধ্য ভাষা হিসেবে হয় কথিত। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, একেকটি শব্দ বর্তমান কালে রূপগত এবং অর্থগত ভাবে যে বিশেষ স্বরূপ নিয়ে বিদ্যমান থাকে, তা অন্য যুগে পরিবর্তিত হয়। আর তাই সেই পরিবর্তনের স্রোতে তার স্বরূপের পরিবর্তন হয় বলেই এর প্রয়োগবিধিও পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাষা মহাকালের গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে। এই পরিবর্তন শব্দের রূপের, এই পরিবর্তন প্রয়োগবিধির, এই পরিবর্তন শব্দের ভেতরের অর্থের। এই অর্থগত পরিবর্তনের নাম ভাষা-

বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন শব্দার্থতত্ত্ব, ইংরেজিতে যার নাম **semantics**. এই শব্দার্থতত্ত্ব ভাষা বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের করায় তাই যে কোনো কৌতূহলী ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল উদ্রেক করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির নাম শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে word. এই শব্দের কাজ হচ্ছে, মানব-মনে প্রতীক সৃষ্টি করা। যে কোনো একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই সেই শব্দের অর্থগত একটি প্রতীক আমাদের মনে ভেসে ওঠে। আর তখনি সেই শব্দটির সঙ্গে জাতির সমস্ত পরিমণ্ডলটির চিত্রকল্পও জেগে ওঠে আমাদের মানসপটে। আমি যে মুহূর্তে উচ্চারণ করলাম 'গোলাপ'—সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ ফুলের রং, বর্ণ, গন্ধ, পাঁপড়ি, কাঁটা, কেশর, সৌন্দর্য সবকিছুই কি আমার মানসপটে ছবির মতোই জেগে উঠছে না? এই যে জেগে ওঠা, এটাই একটি শব্দের প্রতীকী—ভাষা মানব-মনে সেই প্রতীকের সৃষ্টি করে চলেছে অনাদি কাল ধরে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, শব্দ হলেই তার একটি বিশেষ অর্থ থাকতে হবে। অর্থই শব্দের প্রাণ। এই অর্থ দুভাবে সৃষ্টি হতে পারে

ক. মুখ্য অর্থ অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট একটি আভিধানিক অর্থ; এবং

খ. গৌণার্থ—কোনো শব্দের প্রয়োগকালে মূল অর্থের অতিরিক্ত একটি বা একাধিক আলংকারিক অর্থ, যাকে অনেকে ব্যঞ্জার্থ বলেও অভিহিত করেছেন। যেমন : 'মাথা'—এই শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ নিশ্চয়ই রয়েছে: মাথা অর্থাৎ মানব দেহের একটি বিশেষ অঙ্গের নাম মাথা। কিন্তু যদি বলি, 'হাই সাহেব গ্রামের মাথা' তখন মাথা শব্দের অর্থটি কি মানবদেহের সেই বিশেষ অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো? তবু 'মাথা' যেমন মানব দেহের সবচেয়ে প্রধান অঙ্গ, 'হাই সাহেব গ্রামের মাথা' উচ্চারণ করার সময়ে যদিও সেই প্রধান অর্থই অক্ষুণ্ণ থেকেছে, তবু 'অঙ্গ' অর্থটির অতিরিক্ত এই গৌণ অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় আভিধানিক মুখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণার্থের প্রাধান্য ঘটেছে। আমাদের ভাষায় এ ধরনের প্রচুর শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষার সৌন্দর্য এতে বেড়ে যায় বহুগুণ, ভাষা হয় ভাবে পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধ। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ ভাষায়ই এ ধরনের শব্দমালার বহুবিধ অর্থের সন্ধান মেলে।

Nothing is on his head
Mr. Rahim is the head master.

এখানেও 'head' শব্দটির অর্থের পার্থক্য লক্ষণীয়। আর বহু অর্থের সমাবেশ সেইসব ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বেলায় অবশ্য এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা সেখানে মানুষের প্রয়োজনে মানুষের হাতে কৃত্রিমভাবে একেকটি শব্দের একেকটি বিশেষ অর্থ গেঁথে দেয়া হয়। সে কারণে তার সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না।

একটি বিশেষ শব্দ যে কতোগুলো গৌণার্থ সৃষ্টি করতে পারে, তার একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হলো, শব্দটি হচ্ছে 'মাথা' :

১. শিল্পীর মাথায় একরাশ চুল যেন মেঘের আদল। (মাথার খুলির উপর ভাগ)
২. লিখকদের অনেক দারুণ মাথা। (মেধা)
৩. মিন্টুর মাথায় কিছু ঢোকে না (স্মরণশক্তি)

৪. হাবু বাবু তার গিন্নীকে মাথায় করে রেখেছেন। (আদর)
৫. মাথা ধরলে ডালিয়া পাগল হয়ে যায়। (যন্ত্রণা)
৬. অমিত আমাদের গ্রামের মাথা। (প্রধান)
৭. শেলির কথার কোনো মাথাই খুঁজে পাওয়া ভার। (অর্থ)
৮. মাথাই নেই, তার আবার মাথা ব্যথা। (সূত্র, চিন্তা)
৯. তুমি পথের মাথায় গিয়ে দাঁড়াও। (শেষাংশ)
১০. আগে যেতে পারো না, ট্রেন ছাড়বার একদম মাথায় স্টেশনে যাও? (শেষ মুহূর্ত)
১১. আমি মালার সাথে তে-মাথা পর্যন্ত যেতে পারি। (তিন রাস্তার মোড়)
১২. ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে এখন বুঝছি মজা। (খেয়ালের বশে)
১৩. আমার মাথা খাও লক্ষ্মীটি, আজ অফিসে যেয়ো না। (কিরে কাটা)
১৪. গাছের মাথায় ওঠে না, পড়ে গেলে একেবারে অক্কা পেতে হবে। (উপরি ভাগ)
১৫. তার দেনা সম্পত্তির একেবারে মাথায় মাথায় গিয়ে উঠেছে। (সমান সমান)

এখানকার উদাহরণগুলো থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, মাথার মুখ্য অর্থ মানব-দেহের একটি বিশেষ অঙ্গের নাম, মাথার বাকি সবকটাই গৌণ অর্থে ব্যবহৃত। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারে দেখা যায়, মুখ্য অর্থ শব্দের ব্যবহারের ঐতিহ্য বহন করে তার পরিবর্তে গৌণ অর্থ লাভ করতে পারে।

এমনি আরো অনেক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মুখ্যার্থ একটি, কিন্তু গৌণার্থ অগণিত থাকায় শব্দটি ব্যাপক অর্থ নিয়ে ভাষার সচলতা ও শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে। যেমন—হাত, ভাত, পাকা ইত্যাদি।

হাত : হাতখানা পেতে দাও (শরীরের একটি অঙ্গ)
লুনার হাতে এই লেখা ছিলো। (ভাগ্য)
হাতেতে যদিও না মারিত তারে ... (যন্ত্রণা দেয়া)
হাতের পাঁচ চলে গেলে খাবো কি। (শেষ সম্বল)
সে আমার হাতের লাঠি। (অবলম্বন)
হাতে হাত মিলিয়ে চলো। (বান্ধবসুলভ)
এই তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি। (অঙ্গীকার)

ভাত : হাতে মারবো না, ভাতে মারবো। (না খাইয়ে)
মরার আবার মুখে ভাত। (অসম্ভব)
বাচ্চার মুখে ভাত দিচ্ছ নাকি। (প্রথম খাবার অনুষ্ঠান)
এ ঘরে লাইনের ভাত উঠেছে। (অলক্ষণ)
ভাতার আমার ভাত দেয় না। (খেতে দেয়া)

পাকা : মালার বাবা পাকা কথা দিয়েছে। (সম্মতি)
ছেলেটা ইঁচড়ে পাকা। (খারাপ বুদ্ধি)
পাকা শিক্ষকের হাতে পড়লে লিংকনের রেজাল্ট আরো ভালো হতো। (সুদক্ষ)

কাচা রাস্তার চেয়ে পাকা রাস্তায় হাঁটা ভালো (বাঁধানো)
তুমিও নিমন্ত্রিত, গুরুমশাইয়ের বাড়িতে আজ পাকা ফলার। (খাবার)

এছাড়া বাংলা ক্রিয়াপদেরও এ রকম মুখ্য ও গৌণার্থে ব্যবহারবিধি বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। 'ভাঙা' শব্দটির মুখ্যার্থ ভেঙে ফেলা বা বিচূর্ণ করা। কিন্তু একে ভাষায় যেভাবে ব্যবহার করা হয়, সে অর্থই সেখানে প্রাধান্য পায়। যেমন,

১. আজকের সভা এখানেই ভাঙলো। (শেষ হওয়া)
২. প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই লুনা প্রতিজ্ঞা করে। (কথা রক্ষা না করা)
৩. আর কতোকাল বড় ভাইয়ের ঘাড় ভেঙে খাবে। (ভর করা)
৪. নতুন দল ক্ষমতায় এসেই পুরনো দলের সরকার ভেঙে দিলো। (বিলুপ্ত করা)
৫. আমি তোমার বিষদাঁত ভেঙে দেবো। (ঘায়েল করা)
৬. আমি তোমার কথার দাঁতভাঙা জবাব দেবোই। (উচিত শিক্ষা)
৭. অমিত এতোক্ষণে আড়িমুড়ে ভেঙে উঠলো। (ঘুম ভেঙে)
৮. তুমি তো শেষে সিংহ ভেঙে বাছুরের দলে যাবে। (লুকিয়ে)
৯. দেহভাঙা খাটুনি আর যে কতোকাল করতে হবে। (পরিশ্রম)

আরো অসংখ্য ক্রিয়াপদ নিয়ে এভাবে তার বহু গৌণার্থে ব্যবহারের নমুনা দেখানো সম্ভব। এসব শব্দ বক্তা এবং শ্রোতার ভাব বিনিময়ের উপর নির্ভরশীল বলে কখনো কখনো দেখা যায় যে, মুখ্যার্থ একেবারে উহ্য হয়ে গিয়ে গৌণার্থ সেখানে মুখ্যার্থের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, একটি শব্দেরই দুটো বা তারো বেশি মুখ্যার্থ রয়েছে। যেমন, তার (গুন, তাহার) ; বই (পুস্তক, ব্যতীত) ; সই (সহ্য করা, বান্ধবী) ইত্যাদি। এ রকম হওয়ার কারণ হলো, ধ্বনি পরিবর্তনের চক্রে ধীরে ধীরে দুই বা তারো বেশি শব্দ এভাবে একই রূপ পরিগ্রহ করে, এর নাম সমধ্বন্যাত্মক (Homonym) শব্দ। ইংরেজিতেও এর উদাহরণ রয়েছে প্রচুর :

Top (লাটিম ও শীর্ষদেশ) ;
Date (তারিখ ও খেজুর)
In (ভিতরে, বাড়িতে, কাছে, চিঠি গ্রহণ)
Straight (সোজা, সাধুতা)

তবে এ ধরনের শব্দ কোনো ভাষায় খুব বেশি থাকে না ; তাতে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অসুবিধে হয়ে থাকে। ভাব প্রকাশই শব্দের প্রধান শর্ত হওয়ায় মানুষের প্রয়োজনেই এ জাতীয় শব্দ ভাষায় বেশি থাকলে তা ধীরে ধীরে অপচলনের গহ্বরে পতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বলে ভাষার গতিশীল চঞ্চল উত্তাল স্রোত অব্যাহত থাকতে পারে। একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে। দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে একক স্পষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ প্রাপ্তির ফলশ্রুতি হিসেবে একসময় প্রাকৃতে সমরূপ সমধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রচলন বেড়ে গিয়েছিলো। এক 'গঅ' প্রাকৃতের এই শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'গত', 'গদ' ও 'গজ' এই তিনটি শব্দ থেকে। প্রথমটি ক্রিয়াপদ হওয়ায় ভাষার ব্যবহারে তার প্রচলন অত্যাধিক হয়ে পড়ে। তাই সমরূপকে

ভাঙবার জন্যে পরবর্তীকালে এর সাথে 'ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করে 'গইল্ল' রূপ প্রদান করা হয়েছিলো। এভাবে সমঞ্জস্যাত্মক শব্দকে পরিহার করার চেষ্টা সব ভাষাতেই লক্ষণীয়।

শব্দার্থ পরিবর্তন :

সাধারণভাবে বলতে গেলে শব্দার্থের পরিবর্তন তিনভাবে সঙ্ঘটিত হতে পারে :

(ক) অর্থ প্রসার (widening of meaning) ; (খ) অর্থ সংকোচ (narrowing of meaning) ; (গ) অর্থ সংশ্লেষ (metaphor)।

(ক) শব্দের অর্থ রূপক কিংবা অতিশয়োক্তির প্রভাবে অনেক সময় বস্তু নিরপেক্ষ হয়ে অর্থের প্রসার অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। শব্দার্থের এই বিস্তৃতির নাম অর্থ প্রসার বা অর্থ বিস্তার। যেমন,

(১) 'কালি' এর অর্থ ছিলো কালো রঙ। কিন্তু এখন যে কোনো রঙের লিখবার কালি বোঝায়। মূল গণ্ডীবদ্ধ অর্থের এখানে প্রসার ঘটেছে।

(২) 'গঙ্গা'। সংস্কৃতে 'গঙ্গা' একটি বিশেষ নদীকেই বোঝাতো, এখন 'গঙ্গা' থেকে বাংলায় 'গাঙ'—বললে তার অর্থ যে কোনো নদী বোঝায়। ইদানীং এর অর্থ আরো বিস্তৃত হয়ে 'মরা নদী'কে গাঙ অর্থে বেশি করে বোঝাচ্ছে।

(৩) 'হাইজাক'। ইংরেজিতে এর অর্থ ছিলো 'বলপূর্বক উড়োজাহাজকে ছিনতাই করা'। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এ শব্দটির অর্থ বিস্তৃত হয়ে মানে দাঁড়িয়েছে 'যে কোনো জিনিস ছিনতাই করা'।

(৪) 'পরশ্বঃ'। সংস্কৃতে এর অর্থ 'আগামী কালের পরদিন' ; বাংলায় এর অর্থ 'আগামী কালের পরদিন' এবং গতকালের আগের দিন'

(৫) 'গুণ'। আদিম অর্থ 'গো সম্বন্ধীয়' ; পরবর্তীকালে 'গরুর নাড়িভুঁড়ির তাঁত', এবং বর্তমানে অর্থ বিস্তৃত হওয়ায় 'দড়ি' অর্থাৎ গুণটানা, গুণছুঁচ ইত্যাদি।

(৬) 'ধন্য'। মৌলিক অর্থ 'ধনশালী' ; অর্থ সম্প্রসারণে 'সর্বসৌভাগ্যবান'।

(৭) 'ধ্যান'। মূল অর্থ চিন্তা ; বিস্তৃত অর্থে 'পরমার্থ চিন্তা'।

(৮) 'জতুগৃহ'। 'প্রায়শ্চিত্ত' অথবা অন্য কোনো কারণে আত্মোৎসর্গ করার মানসে যেখানে যেতে হতো, তাকে বলতো জতুগৃহ ; পরবর্তীকালে প্রাকৃতে 'জৌহর' হয়ে বাংলায় এই শব্দটি দাঁড়িয়েছে 'জহর'। প্রাকৃতে এর মানে ছিলো 'পুড়ে মরা' ; বর্তমানে বাংলায় এর অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে হলো 'আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে যে কোনো উপায়ে আত্মহত্যা' করা।

(৯) 'জৌনপুরী' মূল অর্থ 'জৌনপুরে তৈরি যে কোনো বস্তু' ; বর্তমান অর্থ 'প্রাতঃকালীন সঙ্গীত জাতীয় এক বিশেষ রাগিণীর নাম'।

(১০) 'বেনারসী'। 'বেনারসে প্রস্তুত বিশেষ এক ধরনের কাপড়।' বর্তমান অর্থ, 'এক রকম বিশেষ মূল্যবান কাপড়'।

(১১) 'রাম'। 'হিন্দুদের দেবতার নাম'। বর্তমানে 'বড়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'রামছাগল', 'রামদা' ইত্যাদি।

এইসব শব্দার্থের অর্থ বিস্তৃতি নানাভাবে ঘটতে পারে :

(ক) উৎপত্তি স্থলের নাম থেকে—যেমন, চিনি (চীন দেশ থেকে যা উৎপন্ন হয়) অর্থ মিষ্টি চূর্ণ ; ইংরেজিতেও এর ব্যবহার দেখা যায় 'china' এখানে অর্থ পোড়ামাটির বাসনপত্র।

'সুপারি' পানের সাথে খাবার সামগ্রী ; কিন্তু এই শব্দটির আগমন ঘটেছে একটি স্থানের নাম থেকে 'সূর্পারক' বা 'শূর্পারক' প্রায় দু হাজার বছরেরও আগে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বড় বন্দরের নাম।

(খ) প্রতীক স্থানীয় (simbolic) হওয়ায় অনেক সময় অর্থের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। যেমন, 'কড়ি — 'কপর্দক' থেকে প্রতীকী হিসেবে 'ধনসম্পত্তি' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'ভাত'—'সিদ্ধ চাল' বর্তমানে 'জীবিকা সংস্থান'

(গ) ব্যক্তি—নাম অর্থ বিস্তারের ফলে সাধারণ বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন, 'সুবদাস' ব্যক্তিনাম থেকে বর্তমানে কথ্য হিন্দিতে 'অন্ধ ভিখারি' এই অর্থে সম্প্রসারণ লাভ করেছে।

লক্ষ্মী ব্যক্তি—নামের গণ্ডী অতিক্রম করে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে সাধারণভাবে 'শান্তশিষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত।

ঘ) সাধারণ বিশেষ্য গুণবাচক বিশেষ্যে পরিণত। যেমন 'গঙ্গা' বাংলায় 'গাঙ' গঙ্গা নদীর সীমিত অর্থের অতিরিক্ত যে কোনো নদী অর্থে ব্যবহৃত ; সম্প্রতিকালে নদীর শুষ্ক খাত অর্থে বেশি প্রচলিত।

'হিন্দু—প্রকৃত শব্দ 'সিন্ধু নদী' বর্তমানে 'হিন্দু' সম্প্রদায় বুঝায়।

(ঙ) উদ্ভাবয়িতার নাম থেকেও শব্দ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, ফরাসিতে "বুং" (দেবদেবীর মূর্তি) থেকে 'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'বুদ্ধ-মূর্তি বা 'প্রতিমা'।

সংস্কৃত শ্লোক 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' থেকে বাংলায় 'ধনঞ্জয়' এর অর্থ 'প্রহার'।

(খ) অর্থ সংকোচ : একটি শব্দের অনেক অর্থ থাকলে তার একটি অর্থ অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে ভাষায় বারবার সেই অর্থে ব্যবহারের ফলে। এতে করে সেই বিশেষ অর্থটি বিশিষ্টতা লাভ করে এবং অন্য অর্থগুলো ক্রমশ অপ্রচলিত হতে হতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় এভাবে শব্দের অর্থ সংকুচিত হলে তাকে বলে অর্থ সংকোচ যেমন, 'সন্দেশ'—প্রকৃত অর্থ ছিলো 'সংবাদ বোধক' তত্ত্ব, বর্তমানে 'একরকম মিষ্টি'।

'অন্ন' যে কোনো খাদ্য অর্থে এর ব্যবহার হতো, বর্তমানে কেবল 'ভাত' অর্থে 'অন্ন' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত।

'প্রদীপ' — সংস্কৃতে এর অর্থ 'আলো' বা যে কোনো 'বাতি', বাংলায় এক বিশেষ ধরনের তৈলদাহ্য বাতি।

শব্দের অর্থসংকোচ সংঘটিত হয় এভাবে

(ক) সাধারণ (general) থেকে বিশেষ (special) অর্থে পরিবর্তন যেমন, ভদ্র, মুনিস (মনুষ্য) সাধারণ অর্থ থেকে বিশেষ অর্থে পরিবর্তিত হয়ে হচ্ছে দিনমজুর।

গাভুর (গর্ভরূপ) থেকে হচ্ছে ছোকরা

(খ) **ভাববাচকতা** (abstract) বা বিশেষ অর্থ থেকে বস্তু বাচকতা (concrete) বা সাধারণ অর্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন, সিধা — মূল অর্থ 'আগুনে সিদ্ধ', বর্তমানে যার অর্থ চাল, ডাল ইত্যাদি যা কিছু শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের অপক্ব খাদ্যদ্রব্য।

'জলপানি' — মূল অর্থ 'জলখাবার', বর্তমানে মেধাবী ছাত্রের 'বৃত্তি' অর্থে ব্যবহৃত।

(গ) **অর্থ সংশ্লেষ** : শব্দার্থ মৌলিক অর্থ হারিয়ে ফেলে যদি অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় অর্থ সংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রম। যেমন,

ঘর্ম (সংস্কৃত) মূল অর্থ 'গরম', পরবর্তীকালে 'শরীরের ওপর গরমের ফল' বোঝাতো, এখন বোঝায় 'স্বেদ'।

'পাষণ্ড' — মৌলিক অর্থ 'ধর্মসম্প্রদায়' ; পরবর্তীকালে অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে হলো 'অন্য সম্প্রদায়' ; এরপর অর্থের আরো পরিবর্তন হয়ে হলো 'বিরুদ্ধ সম্প্রদায়' ; বর্তমানে এর মানে 'অত্যাচারী'

'পাত্র' — মূল অর্থ 'পানপাত্র' ; অর্থ বিস্তারের ফলে হলো 'কন্যা সম্প্রদানের আধার' ; অতঃপর অর্থ সংশ্লেষের পর হলো 'বর'.

'হস্তী' — মূল অর্থ 'হস্ত আছে যার' ; অর্থ বিস্তারের ফলে অর্থ দাঁড়ালো 'হাতের মতো অঙ্গ আছে এমন প্রাণী' ; অতঃপর অর্থ সংশ্লেষ হওয়ায় হলো 'বৃহৎ প্রাণী'।

'ঘড়ি' — মূল অর্থ 'ছোট ঘড়া বা সেই ধরনের পাত্রবিশেষ' ; সেকালে অত্যন্ত সরু ডমরু মধ্য পাত্রে জল বা বালি রেখে তাকে নিচে চালবার কালে ধরে রাখার সময় (time) গোণা হতো। সেই ঘটিকা, পুরনো বাংলায় যা 'ঘড়ি' আজ 'সময়জ্ঞাপক যন্ত্রবিশেষ'।

'উজবুক' — তুর্কী উজবেগ জাতির নাম থেকে এই শব্দের উৎপত্তি ; বাংলার মধ্যযুগে 'এক শ্রেণির মুসলমান সৈনিকদের' বোঝাতো ; তাদের বুদ্ধির চেয়ে শারীরিক শক্তি অধিক থাকায় বর্তমান বাংলায় এর অর্থ 'মূর্খ গোঁয়ার'।

'অর্ধচন্দ্র' — রহস্য ক'রে গলা ধাক্কা দেয়া অর্থে প্রচলিত। গলা ধাক্কা দিতে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যকার স্থান অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক রকম অস্ত্রের সন্ধানও পাওয়া যায়, এই অর্থ সেখান থেকেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিলো।

'ভাত' — মূল অর্থ 'খাদ্যের প্রাপ্য অংশ', তা থেকে প্রথমে 'খাদ্য', অতঃপর 'বিশিষ্ট খাদ্য' এবং এরপর 'সিদ্ধ চাল' অর্থে পরিবর্তিত।

এ ছাড়াও শব্দার্থের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে :

ক. **সুভাষণ (Euphemism)** : রীতি আমাদের সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের ভাষায় ধরা পড়ে। ভাষা আমাদের আত্মিক এবং মানসিক জীবনের সঙ্গে তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমাদের সমাজজীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, অনেক সময় কালোকে আমরা কালো বলি না, অসুন্দরকে অসুন্দর না বলে অন্যভাবে তাকে সুন্দরের মুখোশ পরাতে চাই। যে কারণে কানাকে পদ্মলোচন বলে অভিহিত করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। অমঙ্গল সূচক বা কুৎসিত অর্থকে ভদ্রভাবে ব্যবহার করার এই রীতির নাম 'সুভাষণ'। 'ঘরে চাল নেই' এটা লজ্জার কথা, অভাবের এই ক্লান্তি দূর করবার জন্যে আমরা একে অন্যভাবে

প্রকাশ করে বলি 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' ; 'বাড়ন্ত' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বাড়ছে'। কিন্তু এখানে চালের অভাবকেই প্রকাশ করা হচ্ছে।

'স্বর্ণলাভ' — আমরা যখন 'মরণ' অর্থে ব্যবহার করি, তখন তা মরণের অর্থ প্রকাশ করলেও 'অঢেল সৌন্দর্যে কবিত্বমণ্ডিত' রূপলাভ করে বৈকি।

'আসি' — বিদায় নিয়ে আসবার সময় 'যাওয়া' অর্থে আসির ব্যবহারে আমাদের মানসিকতার পরিচয়টুকু কি বিবৃত নেই?

সুভাষণ দু'ভাবে সম্ভব

১. শব্দের খারাপ অর্থকে ঢেকে ভালো অর্থের আভরণ লাভ— যেমন, ভাত বাড়া — অর্থাৎ 'ভাতের অভাব' এই অর্থ এখানে বাড়া শব্দে ঢেকে দেবার চেষ্টা রয়েছে।

২. শব্দের ভালো অর্থে খারাপে পরিণত হওয়া — যেমন 'নাগর' — মূল অর্থ 'যে নগরে থাকে', কিন্তু এর অর্থ বর্তমানে 'অবৈধ প্রণয়ীতে পর্যবসিত'।

'প্রীতির অর্থ' গোপন নিন্দাসূচক প্রেমে' পরিণত হয়েছে 'পিরীত' হয়ে।

খ. অর্থ সংহতি : অনেক সময় দেখা যায়, ভাষাকে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও গতিশীল করার জন্যে আমরা কয়েকটি শব্দকে একত্রে উচ্চারণ করার চেষ্টা করি। এতে একাধিক শব্দ এক শব্দে পরিণত হয়, অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। একে বলা হয় 'অর্থ সংহতি'। এতে করে অনেক সময় বিভক্তিযুক্ত শব্দ বিভক্তিহীন হয়ে পড়ে। যেমন, 'খাইবার জিনিস' এই দুটো শব্দ একত্রিত হয়ে হয় 'খাবার'। 'খাইব' শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় 'খাইবার' হলেও 'খাবার' শব্দে পুনরায় ষষ্ঠী বিভক্তির যোজনা করা হয়েছে।

এইভাবে 'ইরান' আবেস্তীয় 'আর্যানাম বএজো' (অর্থাৎ 'আর্যদের দেশ') থেকে জাত

'ভুটান' বা 'ভোটান' সংস্কৃত 'ভোটানাং' (ভোটাদিগের দেশ) থেকে উৎপন্ন।

এখানে লক্ষণীয়, বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের লোপে বিশেষণ বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন 'শীত' <শীতল ভোগ ; খুদ <ক্ষুদ <ক্ষুদ্র শস্য।

গ. অলংকারিত : উপমা রূপক ইত্যাদি অর্থালংকারের সংযোজনে যখন শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়, সেই পরিবর্তনের নাম অলংকারিত। যেমন, 'শ্বাপদ' — মূল অর্থ 'কুকুরের মতো পা যার; কিন্তু বাঘ কিংবা সিংহের পায়ের আকৃতি কুকুরের মতো না হলেও তাদেরকে বলা হয় 'শ্বাপদ'।

'দারুণ' — মূল অর্থ 'কাষ্ঠ নির্মিত' ; পরে এর অর্থ দাঁড়ায় 'কাষ্ঠ নির্মিত জিনিসের মতো সুকঠিন' ; এরপর এর মানে দাঁড়ায় 'অত্যন্ত কঠিন' এখন এর অর্থ 'অত্যন্ত' কিংবা 'খুব বেশি'।

'মধুর' — মূল অর্থ 'মধুযুক্ত', পরবর্তী অর্থ 'মধুর মতো মিষ্টি' ; বর্তমান অর্থ 'রমনীয়'।

'গোষ্ঠী' — 'যেখানে অনেক গরু থাকে'। এই হলো মূল অর্থ ; পরবর্তী এর অর্থ দাঁড়ায় 'সমষ্টি'

'বনস্পতি' — মৌলিক অর্থ 'বনের পতি' অর্থাৎ 'বনের বৃহত্তম বৃক্ষ', বর্তমানে 'বৃহৎ বৃক্ষ' বা 'বড় গাছ'

'গবাক্ষ' — মৌলিক অর্থ 'গরুর চোখ'—প্রাচীনকালে গরুর চোখের অবিকল ঘুলঘুলি জানলা থাকতো, সেই অর্থ থেকেই আজ জানলা।

ঘ. ঐতিহাসিক : শব্দের অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে ভাষা সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস কিংবা প্রাচীন সংস্কৃতি বা ভাবধারার ইঙ্গীত লক্ষ্য করা যায়। এই অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে কোনো জাতির অতীত দিনের রূপরেখার ছবি আঁকা সম্ভব। একটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক। যেমন 'কলম' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে 'শর' বা 'খড়্গ'; শর অথবা খড়্গ দিয়ে যে লেখনী বানানো হতো, তাকে বলা হতে 'কলম'। ইংরেজিতে যাকে বলে pen—বাংলায় এর একই অর্থ 'কলম', লিখবার জন্যে ব্যবহৃত যে কোনো বস্তু দ্বারা নির্মিত এবং কালির সাহায্যে লিখবার জন্যে নির্মিত একটি দ্রব্য বিশেষ। কিন্তু pen যে ল্যাটিন শব্দ থেকে উৎপন্ন penna, তার অর্থ 'পালক'। সমগ্র ইউরোপে পালকের কলম প্রচলিত থাকায় pen শব্দের অর্থ 'পালকের কলম' হতে পেরেছিলো। বাংলায় প্রথমে এভাবে ব্যবহার করা হতো 'পেন কলম' বা 'পেনের কলম', পরবর্তীকালে ধাতু নির্মিত নিবের প্রচলন হলেও শব্দটির প্রচলন ঠিকই থাকলো, তবে অর্থের পরিবর্তন হতে বাধ্য হলো।

'Fee' — ইংরেজি এই শব্দটির প্রাচীন অর্থ, 'যে কোনো প্রাণী'। আজকের যুগের মতো প্রাচীনকালে মুদ্রার প্রচলন না থাকায় পশুর বিনিময়ে তখন বেচাকেনা চলতো। — এ কারণে fee শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছিলো 'বিনিময়মূল্য'; পরবর্তীকালে এসে যার মানে কেবলমাত্র 'মূল্য' "ডাক্তারকে কতো ফি (fee) দিলে।"

'শ্বশুর' — মৌলিক অর্থ 'পত্নির পিতা' — এখন 'স্বামীর পিতা স্ত্রীর শ্বশুর আর স্ত্রীর পিতা স্বামীর শ্বশুর'।

'বিবাহ' — মূল অর্থ 'বিশেষভাবে বহন করা'। এর উৎপত্তির কারণ, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কন্যাকে বলপূর্বক নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবার রীতি প্রচলিত ছিলো। কিন্তু যেহেতু আজকের সেই শক্তিপ্রয়োগের ব্যাপারটি নেই, যদিও এখন পর্যন্ত স্ত্রীকে 'বহন করার' ব্যাপারটি 'ভরণপোষণ'-এর নামে সারা জীবনই স্বামীকে পালন করতে হয়।

'বৃক্ষ' — আদিম কালে বৃক্ষই ছিলো মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন, ডালে উঠে পশুপাখির হাত থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি কারণে বৃক্ষের উপযোগিতা আদিম অধিবাসীদের কাছে ছিলো অপরিসীম। বৃক্ষের সেই গুরুত্বকে স্বীকার করবার চেষ্টা সবচেয়ে মূল্যবান, বইয়ের পাতায়, মহাকাব্যের কাণ্ডে, পর্বে, মূলে, শাখায় এবং স্কন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোতে বইয়ের বিভিন্ন অংশের নাম বৃক্ষের নামানুসারে রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষায় এই মিল থেকে এ কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এ রকম অর্থালংকারের ব্যবহারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে মানব সংস্কৃতির মূল ধারার এবং মানব প্রকৃতির মৌলিক প্রবণতার চিহ্ন বিধৃত।

'রথ্যা' — সংস্কৃত এই শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে 'প্রশস্ত পথ' অর্থাৎ এমন পথ, যেটা দিয়ে রথ চলাচল করতে পারে। প্রাকৃতে এর রূপ 'রচ্ছা' এবং বাংলায় 'রাস্তা' — অর্থ 'সদর দরজা'

বা 'বড় রাস্তার উপরে ঘরের দরজা'। সেকালে বাড়ির মেয়েছেলেদের একমাত্র চলাচলের পথ ছিলো ভেতরের দরজা, সদর দরজা তাদের অগম্য পথ। তাদের এই সদর দরজাই প্রশস্ত পথ বা 'নাছ' বা 'নাছ-দুয়ার'। এই থেকে 'নাছ' শব্দের বর্তমান অর্থ 'খিড়কি দরজা' হয়েছে।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ Bloomfield ও Sturtevant-এর আদর্শ অনুসরণ করে ভাষার এই অর্থগত পরিবর্তনকে ভেবে বিন্যস্ত করেছেন, তা হলো;

১. "অর্থ সংকোচ বা narrowing, যথা — প্রাচীন ইংরেজি mete খাদ্য, আধুনিক ইংরেজি meat মাংস ; প্রাচীন ইংরেজি deōr জন্তু, আধুনিক ইংরেজি deer হরিণ।

২. অর্থ প্রসার বা widening, যথা - সংস্কৃতে সংস্কৃতে 'গঙ্গা' একটি বিশেষ নদী থেকে বাংলায় 'গাঙ' যে কোনো নদী।

৩. রূপকালঙ্কার বা metaphor, যথা — প্রাচীন জার্মানি bitraz কামড়ানো থেকে bitter তেতো।

৪. অনুকল্প বা metonymy অর্থ, সময়ের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত। যথা — প্রাচীন ইংরেজি ceace চপা >cheek খুতনি।

৫. লক্ষ্যোক্তি অলংকার বা syneedoche, সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ। যথা, প্রত্ন ইংরেজি stobo উত্তপ্ত ঘর > stove চুল্লি।

৬. অতিশয়োক্তি বা hyperbole, স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট অর্থ। যথা — প্রত্ন ফরাসি ex-tonare বজ্রাঘাত >astonis বিস্মিত।

৭. নেতি অলংকার litotes অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট অর্থ। যথা — প্রত্ন ইংরেজি kwalljon বড় তেলা > প্রাচীন ইংরেজি cwellan বধ করা।

৮. ক্ষয়িষ্ণুতা degeneration, যথা প্রাচীন ইংরেজি cnafa বালক > knave চাকর।

৯. উন্নতি elevation, যথা প্রাচীন ইংরেজি cniht বালক >knight চাকর

ভাষার শ্রেণিবিন্যাস
(The Classification of Languages)

"নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম আমি,
একই মায়ের পুত।"

এই বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্যে রূপগত ও অর্থগত পার্থক্যের অন্ত নেই; তবু এই ভাষাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত সূক্ষ্ম মিল লক্ষ্য করা যায় বলে এইসব ভাষাকে পণ্ডিতেরা অতীতের কোনো এক মুহূর্তে এক বংশ থেকে উদ্ভূত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে যে ভাষাগুলো প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো বড় বিচিত্র। কোনো ভাষার হয়তো লিখিত রূপই কেবলমাত্র পাওয়া যায়, আবার কোনো ভাষার লিখিত রূপ আদৌ প্রচলিত হয় নি। কোনো কোনো ভাষা মৃত, কেবল তার খোলস হিসেবে লিখিত রূপটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, কোনো কোনো ভাষা আবার একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, যার লিখিত বা কথ্য রূপ সম্পর্কে আমরা আদৌ অবহিত নই।

যে ভাষাগুলোর সন্ধান আমরা পাই, তা প্রচলিত আধুনিক ভাষাই হোক, আর প্রাচীন অবলুপ্ত-লুপ্ত ভাষাই হোক, ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে দুই পৃথক মানদণ্ডে বিচার করে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত ভাষাগুলোর পরস্পর সম্পর্ক কিংবা প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ না করে কেবলমাত্র ভাষার বাইরের প্রচলিত রূপ (বাক্য, পদ বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাকরণগত ভাবে) বিচার করে (morphological) তাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করবার চেষ্টা, যাকে ভাষাবিজ্ঞানে নাম দেয়া হয়েছে রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস (Morphological Classification) এবং দ্বিতীয়ত ভাষাসমূহের প্রাচীন ইতিহাস, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার করে ভাষা সম্পর্কে যতোটা সম্ভব জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তার বিশ্লেষণের সাহায্যে ভাষার শ্রেণিবিন্যাস করার প্রচেষ্টা ভাষা বিজ্ঞানে এই প্রচেষ্টার নাম বংশানুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস (Genealogical Classification).

ভাষাবিন্যাসের আরেকটি সহজ পথ আছে; ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণিবিন্যাসের নাম হলো ভৌগোলিক শ্রেণিবিন্যাস বা Geographical Classification.

এ ছাড়া আরো কিছু ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, যা রূপতাত্ত্বিক কিংবা বংশানুক্রমিক ভাষার বিন্যাসে পড়ে না, এর নাম অ-শ্রেণিভুক্ত (Unclassified) ভাষা। জাপানি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম শ্রেণির বিন্যাস অর্থাৎ রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ভাষাগুলোকে দুটো প্রধান গুচ্ছে বিভক্ত করা যায়, তা হলো ক. সমবায়ী (Non-isolating) এবং খ. অসমবায়ী (Isolating).

ক. সমবায়ী (Non-isolating)

সমবায়ী গুচ্ছের ভাষাগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সমন্বয়ী
২. সর্ব সমন্বয়ী
৩. যৌগিক

১. সমন্বয়ী (Inflexinal, Amalgamating বা Synthetic) এই শ্রেণির ভাষার লক্ষণ হচ্ছে, পদের সম্পর্কসূচক চিহ্নগুলো (সাধারণভাবে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ) মূল শব্দের সামনে, মধ্যে কিংবা পেছনে যে কোনো স্থানে বসতে পারে এবং সে চিহ্নগুলো পদের মধ্যে অনায়াসে বিলীন হয়ে যায়। ইউরোপ এবং পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার ভাষাগুলো (বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবি ইত্যাদি) এর পর্যায়ভুক্ত। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ধাতুর ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর আগে, মধ্যে বা পিছে প্রধানত স্বরধ্বনি যোগ করে বিভিন্ন পদের সৃষ্টি করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক, কতল (qtl) একটি ধাতু—এর সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত করায় একটি শব্দের সৃষ্টি হলো 'কতল' (qatala)।

২. সর্ব সমন্বয়ী (Polysynthetic, Holophrastic বা Incorporating) : আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলো এই পর্যায়ে পড়ে। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শব্দ এবং বাক্য এখানে আলাদা সত্তা নিয়ে উপস্থিত নয়। শব্দগুলো একাকার হয়ে বাক্য গঠিত হয় বলে বাক্যের বাইরে শব্দের পৃথক কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না।

৩. যৌগিক (Agglutinative) এই যৌগিক ভাষাসমূহ আবার দুভাগে বিভক্ত ক. উপসর্গ যৌগিক (Prefix-agglutinating বা Juxta positional) ও খ. অনুসর্গ যৌগিক (Suffix agglutinating)।

ক. উপসর্গ যৌগিক (Prefix agglutinating) মধ্য আফ্রিকার বান্টু গোষ্ঠীর ভাষা এর অন্তর্গত। এ জাতীয় ভাষায় বাক্যের মধ্যে পদের মূল্যসূচক চিহ্নগুলো (শব্দ বা শব্দখণ্ড) মূল শব্দের আগে আলগাভাবে যুক্ত হয়।

খ. অনুসর্গ যৌগিক (Suffix agglutinating) তুর্ক-তাতার ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা এর অন্তর্গত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভাষায় বাক্যের মধ্যে পদের মূল্য নির্দেশক (শব্দ বা শব্দখণ্ড) চিহ্নগুলো মূল শব্দের শেষে জোড়া লাগানো হয়ে থাকে।

খ. অসমবায়ী (Isolating)

এই শ্রেণির ভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ বলে কোনো কিছু নেই ; আর শব্দ ও পদ এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যও খুঁজে বের করবার উপায় নেই। বাক্যে ব্যবহৃত এই ভাষায় কর্তা, কর্ম ইত্যাদি কারক বোঝে নেবার সহজ উপায় হলো, এদের বসবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে। বাক্যের অর্থ থেকে অথবা উপসর্গ অনুসর্গ ইত্যাদির মতো বিশেষ বিশেষ শব্দের সহযোগে ক্রিয়ার পুরুষ, বচন, কাল, ভাব, বাচ্য ইত্যাদি নির্ণীত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এ ভাষার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন সুর

৩. শোশোনিয়ান (Shoshonean)

৪. ইরোকিয়ান (Iroquian)

৫. মুস্কোজিয়ান (Muskogean)

৬. আল্‌গঙ্কীয়ান (Algonguion)

৭. অথাবাস্কান (Athabaccan)

৮. নাহুয়াটলান (Nahuatlan)

এগুলোর অধিকাংশই মৃত ভাষা। আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাস যখন আদিম অধিবাসীদের নিয়ে রচিত হয়েছিলো এই ভাষাগুলো তখনকার। আজ সেই অবক্ষয়ের ওপর নতুন জোয়ার লাগায় আমেরিকার শানশওকত হাজার গুণ বেড়ে গেছে এ কথা সত্যি, কেবলমাত্র সেই ভাষাগুলোর অতীত পুরনো স্মৃতিকথা আঁকড়ে রাখবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
মিটে কি আশ..."

সেই স্বদেশী ভাষায় আশা মিটাবার আশা কার না আছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সেই বাংলা ভাষার আদি অন্ত জানবার কৌতূহল যেমন প্রতিটি বাঙালি সন্তানের মজ্জাগত, তেমনি ভাষার অতীত ইতিহাস অর্থাৎ তার পূর্ব ভাষা পুরুষদের বিস্তারিত পরিচয় জানবার দুর্নিবার ইচ্ছা তার আন্তরিক, এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তাই বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন এবং বংশানুক্রমে কি ভাবে কোথা থেকে এই ভাষার জন্ম হলো সে সম্পর্কে এখানে খানিকটা আলোচনা করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের প্রাচীন শাখা মোট নয়টি—কেলটিক, ইটালীয়, জার্মানীয়, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, বালটো-স্লাভিক, তুখারিয়ান, গ্রিক ও ইন্দো-ইরানীয়। কিন্তু কোন মূল ভাষার সূত্র ধরে এই শাখা-ভাষাগুলো বেরিয়ে এলো সে সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত একমত হতে পারেন নি। মূলকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র এই নটি ভাষার অভ্যন্তরীণ ও রূপগত মিলের উপর ভিত্তি করে তাঁরা এগুলো ভাষার একই মূল ও বংশজাত, এ মত পোষণ করতে পেরেছেন। আরো একটি বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনো পর্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেন নি, তা হলো, সেই মূল ভাষাটির আদি পীঠস্থান কোথায়—মধ্য-ইউরোপ, নাকি মধ্য-এশিয়া? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। গবেষণা চলছে—হয়তো কোনোদিন এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে, এ আশা আমরা করতে পারি।

মূল পীঠস্থান যেখানেই হোক না কেনো, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তবে এ ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানীদের সাথে আমরা একমত যে, মূল ভাষা যে অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো, সেই আদিকালের আদিম অধিবাসীরা বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হতে থাকে, ফলে তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে হয় স্থান থেকে স্থানান্তরে—এভাবে বাড়তে বাড়তে তারা বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিমণ্ডল রচনা করতে শুরু করে। এমনি করে ছড়িয়ে পড়ার ফলে ধীরে ধীরে তাদের ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। অতঃপর এক সময়ে দেখা গেলো, তাদের ভাষা ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে একেকটি নতুন ভাষার সৃষ্টি হলো। তারা নটি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকার দরুন তাদের ভাষা সংখ্যাও বাড়লো নটি। কিন্তু যেহেতু মূলত তারা প্রত্যেকে একই অঞ্চলের মানুষ ছিলো এবং যেহেতু একই ভাষায় কথাও বলতো তারা এ কারণে যতোই পার্থক্য আসুক না কেনো তাদের ভাষার মধ্যে মিলও রয়ে গেলো যথেষ্ট পরিমাণে। ভাষা বিজ্ঞানীরা এই মিল এবং অমিল বিচার করে এ ব্যাপারে যা রায় দিয়েছেন, তা হলো—মূলত এ নটি ভাষাই

একই বংশ থেকে উদ্ভূত, তবে কখন বা কতো দিন আগে মূল ভাষা থেকে এগুলো পৃথক রূপ লাভ করেছে, এ ব্যাপারে সঠিক যুক্তিসংগত কোনো উত্তর দিতে এখনো পর্যন্ত তারা অপারগ। কেউ কেউ অবশ্য বলার চেষ্টা করেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিলো, আবার কারো মতে খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেকার ঘটনা এটা। তবে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করা বড়ই কঠিন। সবার অনুমান, ঘটনাটা যথেষ্ট পুরনো, সেই হিসেবে এর সময়কাল হতে পারে, আজ থেকে হাজার পাঁচেক বছর আগে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ন'টি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেয়ার চেষ্টা করছি :

১. **কেল্টিক শাখা (Celtic)** : প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই ভাষা পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে প্রচলিত ছিলো। পরবর্তীকালে জার্মান ও ইটালীয় ভাষার প্রসার ঘটায় এই ভাষা অপ্রতিযোগী হয়ে পড়ে। এই ভাষার একটি নমুনা এখন মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে — আয়ারল্যান্ডের আয়রিশ ভাষা, বাকি সব বিলুপ্ত।

২. **ইটালীয় (Italic)** : এই ভাষার তিনটি উপভাষা—ল্যাটিন, উমব্রিয়ান ও ওস্কান। ল্যাটিন খুবই সমৃদ্ধ ভাষায় উন্নীত হয়েছিলো এবং তা ছড়িয়ে পড়েছিলো ইউরোপের অনেক জায়গায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দিকে। অন্য দুটো শাখাই লুপ্ত। ল্যাটিনের বিকৃতি থেকে সৃষ্ট ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, রুমানিয়ান, স্প্যানিশ প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলো।

৩. **জার্মানীয় (Germanic)** বা **টিউটনিক (Teutonic)** : এরও উপশাখা তিনটি — পূর্ব জার্মানি, উত্তর জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানির প্রাচীনতম ভাষার নাম গোথিক, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাইবেলের অনুবাদ হয়েছিলো এই ভাষায়।

নরওয়েজিয়ান, ডেনিস, সুইডিস ও আইসল্যান্ডের ভাষার জন্ম হয় উত্তর জার্মানি থেকে।

আর আধুনিক ইংরেজি, জার্মান ও ওলন্দাজ ভাষার জন্ম হয় পশ্চিম জার্মানি শাখা থেকে।

৪. **আলবেনিয়ান (Albanian)** : গ্রিক, ল্যাটিন, তুর্কি, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষার মিশ্ররূপ এই ভাষা—আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব তীরের আলবেনিয়ার জনগণের মুখের ভাষার নামই 'আলবেনিয়ানভাষা'।

৫. **আর্মেনিয়ান (Armenian)**: এই ভাষা এশিয়া মাইনরের আর্মেনিয়া দেশের প্রচলিত ভাষা। আর্মেনিয়ানরা মূলত ব্যবসায়ী জাতি। সেই কারণে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাতায়াতের দরুন সেখানেও এই ভাষার প্রচলন হয়েছে। এই ভাষার সচল গতিধারায় রূপ বদলে আজ আধুনিকতায় পর্যবসিত।

৬. **বালটো-স্লাভিক (Balto-Slavic)** : দুটো উপশাখার সমাবেশ, নাম শুনলেই বোঝা যায়। প্রথম উপশাখার পরবর্তী ভাষাগুলো হচ্ছে, লিথুয়ানিয়ান ও ল্যাটভিয়ার ভাষা ; এবং দ্বিতীয় উপশাখার বুলগেরিয়ান, রাশিয়ান, পোলিশ, চেক, সার্বিয়ান ইত্যাদি।

৭. **তুখারিয়ান (Tokharian)** : এই শাখার দুটো উপশাখা — তোখারীয় ও কোচীয়। কিছুদিন আগে তুর্কিস্তানের বালুকাস্তূপ থেকে এই ভাষার কিছু প্রত্নলিপি ও পুঁথিপত্র আবিষ্কার ক'রে গবেষণা চালানো হয়। তাতে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠি ও

ব্রাহ্মীলিপির সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে, আর ভাষার দিক থেকে পশ্চাত্যের প্রায় তেরোশে বছর আগে এই ভাষা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৮. **গ্রিক (Greek)**: আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে এশিয়া মাইনরের উপকূলে, গ্রিসে, সাইপ্রাসে, ঈজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মানুষ যে ভাষায় কথা বলতো তার নাম গ্রিক ভাষা। তা থেকে জন্ম নেয় অগণিত উপভাষা। অ্যাটিক–আয়োনিক সেই উপভাষাগুলোর অন্যতম। এই ভাষায় রচিত হয়েছিলো হোমারের বিশ্বনন্দিত মহাকাব্য ইলিয়াড–ওডিসি। এই শাখার আরেকটি উপভাষার নাম ডোরিক। কোইনে–এই উপভাষাগুলোর সম্মিলিত রূপ, যা থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক গ্রিক ভাষার উৎপত্তি।

ইন্দো–ইরানীয় (Indo Iranian) : প্রায় চার হাজার বছর আগে এই শাখার জন্ম। এর উপশাখা দুটো— ক. ইরানীয়, খ. ভারতীয় আর্য।

ক. **ইরানীয়** : প্রাচীন পারসিক ও আবেস্তীয় এর অন্তর্গত দুটো প্রাচীন ভাষার নাম। আধুনিক ইরানের দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা ছিলো এই প্রাচীন পারসিক ভাষা। সম্রাট ডেরিয়াস জারেকসাসের রাজত্বকালে তাদের মাতৃভাষার চর্চা প্রচুর পরিমাণে হয়— তখনকার শিলালিপি ও ধাতুলিপি থেকে তার নমুনা মেলে। এই পারসিক ভাষারও আবার পালাবদল শুরু হতে থাকে পহ্লবি ও শক্ ভাষার সাথে। কালক্রমে এই দুই ভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। শক্ ভাষায় অনূদিত অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ, আর আজ থেকে প্রায় বারো শো বছর আগে পহলবি থেকে জন্ম নেয় ফার্সি ভাষা। আফগানিস্তানের আফগান (পশতু), বেলুচিস্তানের বেলুচ ভাষাও আসে পহ্লবি ভাষা থেকেই। অন্যদিকে আবেস্তীয় ভাষা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ভাষা হয়েই থেকেছে, এর কোনো আধুনিক রূপ পাওয়া যায় না।

খ. **ভারতীয় আর্য ভাষা** : ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের আগমন ঘটে আজ থেকে প্রায় তিন কিংবা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। তাদের আগমনের সাথে তাদের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি এ দেশের মাটিতে আসে ঠিক তাদের সথে সাথেই। তাদের প্রভাব এ দেশের অধিবাসী অর্থাৎ অনার্যদের উপর দুটো কারণে বেশি করে পড়েছিলো, তা হলো— ১. নবাগত আর্যদের শক্তিসামর্থ্য ও যুদ্ধকৌশল প্রশংসনীয় ছিলো, এবং ২. তাদের ছিলো উন্নত ধরনের দেবগীতিমূলক সাহিত্য আর এক প্রাঞ্জল ভাষা। শক্তি–সামর্থ্য অনার্যদের কাছে যেখানে গ্রহণ যোগ্য হয় নি, সেখানে তাদের ভাষা ও সাহিত্য অনার্যদের মনকে জয় করতে সমর্থ হয়েছিলো বলে আর্যরা এদেশে বরণীয় হয়েছিলো।

আর্যদের আনীত এবং প্রভাবান্বিত 'ভারতীয় আর্য ভাষার' ছিলো তিনটি স্তর :

ক. আদি স্তর : আদি ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan)–এর জন্মকাল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে।

খ. মধ্য স্তর : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (Middle Indo-Aryan)–এর জন্মকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল।

গ. আধুনিক স্তর : নব্য–ভারতীয় আর্য ভাষা (Modern Indo-Aryan)–এর জন্মকাল আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগের কোনো এক সময়।

ক. আদি স্তরের ভাষা

আদি স্তরের ভাষায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন হচ্ছে ঋকবেদ। ম্যাক্সমুলার এর অনুবাদ করেন ইংরেজিতে। তিনি অবাক বিস্ময়ে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'The most ancient of books in the library of mankind.' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র এর ভাষা-ই নয়, অন্তর্নিহিত কাব্য-সৌন্দর্যেও। ঋকবেদ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম খণ্ড অন্য দুটো খণ্ডের নাম হলো, সামবেদ ও যজুর্বেদ।

এছাড়া আদি ভারতীয় আর্য ভাষায় রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। বৈদিক যজ্ঞকর্মের বিস্তৃত বিবরণ, তার উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণগুলোতে রয়েছে। আর বিভিন্ন 'আরণ্যকের' উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের বিশেষ বিশেষ ধ্যানধারণার রূপায়ণ ঘটেছে উপনিষদ বা বেদান্তে।

খ. মধ্য স্তরের ভাষা

মধ্য স্তরের ভাষা পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সমাহার।

পালি : পালি ভাষায় বিশ্বনন্দিত মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের 'পাঠ' বা text রচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৮৩০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই পালি ভাষার উৎপত্তি। এই ভাষার উৎপত্তিস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জার্মান পণ্ডিত Kulrn ও Westerguard বলেছেন, উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষা থেকে এর জন্ম। শৌরসেনি প্রাকৃতের সাথে এই ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন। পুরো পাঁচটি স্তরে পালি ভাষা বিন্যস্ত জন্ম, শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য—এভাবে এ ভাষার বিন্যাস দেখানো যেতে পারে। 'জাতকের গল্পের' মাধ্যমে গৌতমবুদ্ধের ধর্মোপদেশ ও অমূল্য বাণীগুলো বিশ্ববাসীর কাছে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাষার মাধ্যমে। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' পালি ভাষায় রচিত।

প্রাকৃত : এই ভাষা সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত'। দেশীয় পণ্ডিতদের মতে, 'সংস্কৃতই হচ্ছে প্রকৃতি বা মূল। তার থেকে যা এসেছে বা উৎপন্ন হয়েছে তাই প্রাকৃত'[১]। অন্যদিকে জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের মতে, 'বৈদিক ভাষাই মানুষের প্রকৃতিগত এবং অনিয়মিত বেগে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি করেছে প্রাকৃত ভাষার'। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক দুটো রূপের একটি পরিমার্জিত রূপ আর অন্যটি সহজতর অপরিশিলীত রূপ—পরিমার্জিত রূপটির নাম সংস্কৃত, আর অপরিশিলিত রূপটিই হলো প্রাকৃত। এ ভাষার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে পঞ্চনদ ভূমি। প্রাকৃতের আদি রূপের নাম মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। এর অন্যান্য শাখার নাম শৌরসেনি, মাগধি, পৈশাচি ইত্যাদি। এ ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে পরিগণিত হতো বলে সাধারণভাবে এর নাম দেয়া হয়েছে সাহিত্যিক প্রাকৃত।

অপভ্রংশ : 'লৌকিক' ভাষারই অন্য নাম অপভ্রংশ। প্রাকৃত সংস্কৃতের জটিল ব্যাকরণের বন্ধন থেকে আরেকটি সহজতর ভাষা, যা সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই অপভ্রংশ এক সময় সাহিত্যের ভাষা হিসেবেও পরিগণিত হয়েছিলো।

---

১. সংস্কৃতে এভাবে বলা হয়েছে : "প্রকৃতি ঃ সংস্কৃতং তত্রভবঃ তত আগতং বা প্রাকৃতম্"।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ এবং বাংলা ভাষার স্থান

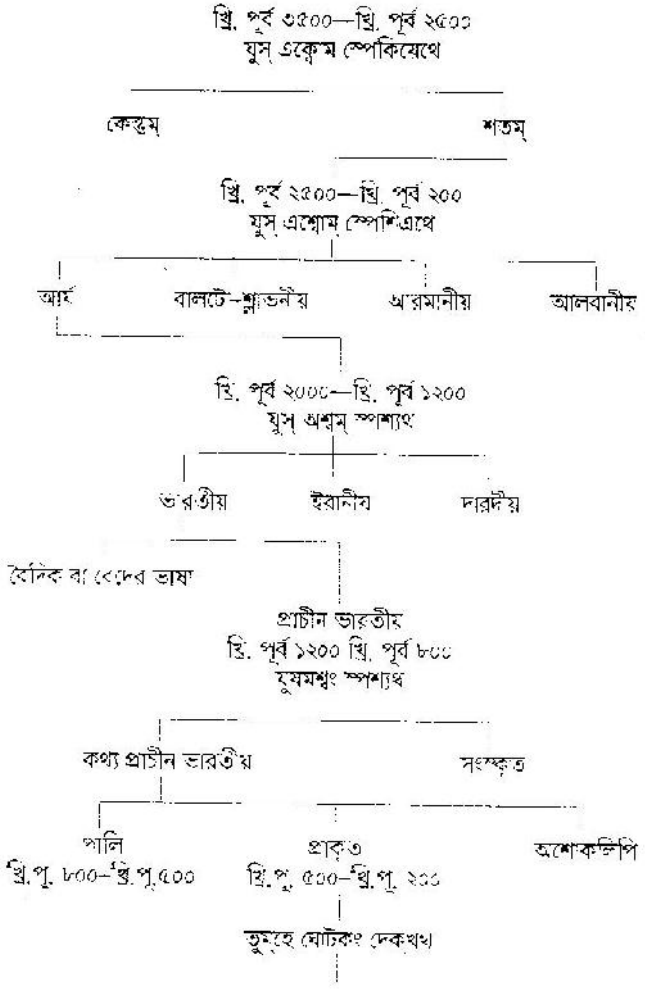

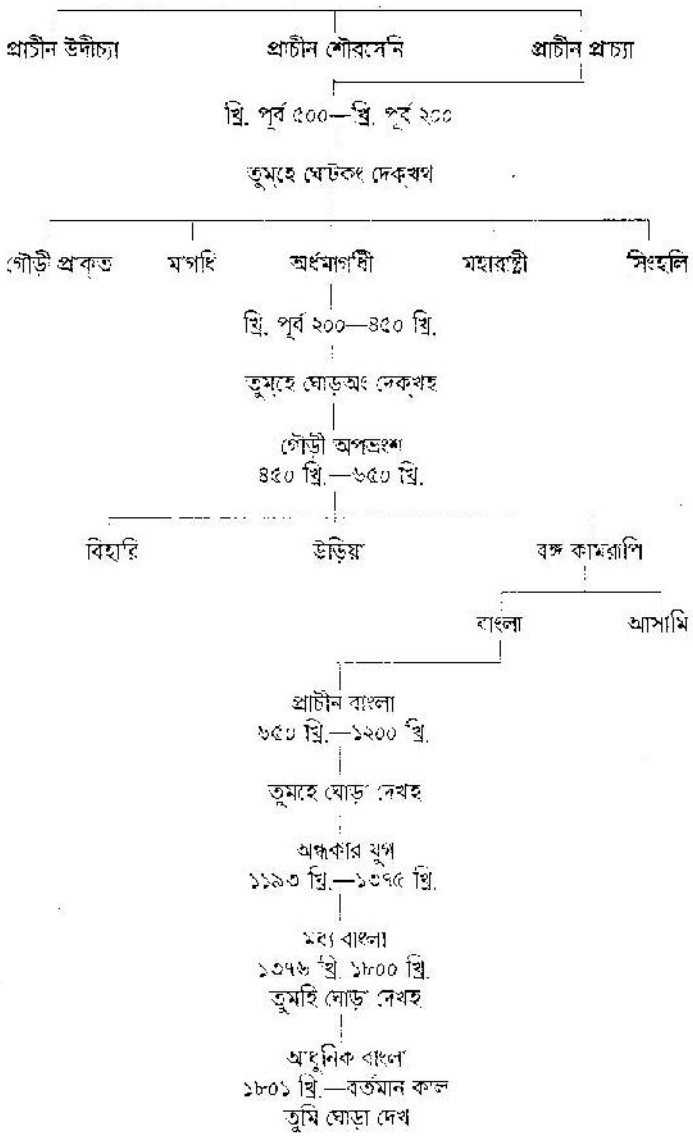
প্রাচীন উদীচ্যা
প্রাচীন শৌরসেনি
প্রাচীন প্রাচ্যা
খ্রি. পূর্ব ৫০০—খ্রি. পূর্ব ২০০
তুমহে ঘোটকং পেক্খথ
গৌড়ী প্রাকৃত
মাগধি
অর্ধমাগধী
মহারাষ্ট্রী
সিংহলি
খ্রি. পূর্ব ২০০—৪৫০ খ্রি.
তুমহে ঘোড়অং পেক্খহ
গৌড়ী অপভ্রংশ
৪৫০ খ্রি.—৬৫০ খ্রি.
বিহারি
উড়িয়া
বঙ্গ কামরূপি
বাংলা
আসামি
প্রাচীন বাংলা
৬৫০ খ্রি.—১২০০ খ্রি.
তুমহে ঘোড়া পেখহ
অন্ধকার যুগ
১১৯৩ খ্রি.—১৩৭৫ খ্রি.
মধ্য বাংলা
১৩৭৬ খ্রি. ১৮০০ খ্রি.
তুমহি ঘোড়া পেখহ
আধুনিক বাংলা
১৮০১ খ্রি.—বর্তমান কাল
তুমি ঘোড়া দেখ

'প্রাকৃতপৈঙ্গল' এই ভাষায় রচিত সাহিত্যিক নিদর্শন। 'প্রেম, ভক্তি, বীর, বাৎসল্য' —এ রসমালায় এ গ্রন্থ গ্রথিত। এ ছাড়া এ ভাষার আরেকটি সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, যার নাম 'শোক শুভোদয়া'। ডাক ও খনার বচন এবং শুভঙ্করের শ্লোক এ ভাষার আরেক নিদর্শন।

গ. আধুনিক স্তরের ভাষা অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

আধুনিক ভাষাগুলো আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ থেকে, পণ্ডিতেরা এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মত হলো, এর জন্মকাল আরো আগে। তাঁর মতে, খ্রিষ্টীয় ৬৫০ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী এই ভাষার প্রকৃত জন্মকাল ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ার্সন এই পর্যায়ের ভাষাগুলোকে দুভাবে ভাগ করেছেন 'বহিরঙ্গ' (এর অন্তর্গত ভাষা কাশ্মিরি, মারাঠি, সিন্ধী, বাংলা ইত্যাদি) ও 'অন্তরঙ্গ' (পশ্চিমা হিন্দি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি।)

কাশ্মিরি ভাষা কাশ্মির অঞ্চলের ভাষা। ইরানীয় ভাষা প্রবাহিত ভারতীয় ভাষাগুলোর অন্যতম এই ভাষা। এই ভাষার লিপির দুটি পর্যায়— প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মী লিপি, পরবর্তী পর্যায়ে ফারসি লিপি।

পাঞ্জাবি ভাষা পাঞ্জাব অঞ্চলের। এর দুটি ভাগ—পশ্চিমা পাঞ্জাবি ও পূর্ব পাঞ্জাবি।

সিন্ধি সিন্ধু ও কচ্ছ অঞ্চলের ভাষা। পশ্চিমা পাঞ্জাবি ভাষার সাথে এর বেশ মিল। লিপি ফারসি।

গুজরাটি রাজস্থানের ভাষা। এই অঞ্চলের আরেকটি ভাষার নাম **মাড়োয়ারি**। গুজরাটি ও মাড়োয়ারি ভাষা প্রথমে অভিন্ন ছিলো—ষোড়শ শতাব্দীতে এসে দুটি দুই ভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো নিজেদের রূপ বদলিয়ে নিয়ে।

হিন্দি বাংলার সমসাময়িক। এর প্রাচীন রূপ ব্রজভাষা এর উপভাষাগুলো হচ্ছে ব্রজভাষা, বুন্দেলি, হরিয়ানি, কনৌজি, কথ্য হিন্দুস্তানি ইত্যাদি।

মারাঠি ভাষার জন্ম দশম একাদশ শতাব্দী প্রধান উপভাষার নাম 'কোঙ্কনি'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী', রচয়িতা জ্ঞানদেব।

অসমিয়া ভাষার জন্মকাল পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীতেই এর গদ্য সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নাম শঙ্কর দেব, মাধব দেব, মাধব কন্দলী প্রমুখ।

বাংলা জন্মকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ ভাষার সাহিত্যিক রূপ সৃষ্ট। সৃষ্ট গ্রন্থের নাম 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'।

বাংলা ভাষা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ভাষাতেই কাব্য রচনা করে (গীতাঞ্জলি) নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

[১৯৬৩ সনে পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উপলক্ষে ড. আহমদ শরীফের নির্দেশনায় প্রস্তুত ছক অবলম্বনে উপরোক্ত ছকটি করা হয়েছে]

এখানে 'তুমি ঘোড়া দেখ' এই বাক্যটি আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার রূপ থেকে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে গিয়ে রূপগত ও ধ্বনিগত যে

ক্রমপরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করেছে তা দেখানো হয়েছে। আরো সহজভাবে বুঝবার জন্যে এখানে কালক্রমিকভাবে কেবলমাত্র এই উদাহরণটিরই বিন্যাস করা হ'লো :

খ্রি. পূর্ব ৩৫০০–২৫০০ যুস্ এক্বোম স্পেকিয়েথে	ভাষার নাম শতম্ খ্রি. পূর্ব ২৫০০–২০০ যুস্ এশ্বোম স্পেশিএখে	আর্যভাষা প্রাচীন খ্রি. পূঃ ২০০০–১২০০ যুস্ অশ্বম্ স্পশ্যথ

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা খ্রি. পূর্ব ১২০০–৮০০ যুযমশ্বং স্পশ্যথ	প্রাকৃত ভাষা খ্রি. পূর্ব ৫০০–২০০ তুমহে ঘোটকং দেকখথ	প্রাচীন প্রাচ্য খ্রি. পূর্ব ৫০০–২০০ তুমহে ঘোটকং দেকখথ

গৌড়ী প্রাকৃত খ্রি. পূ. ২০০–৪৫০ খ্রি. তুমহে ঘোড়অং দেকখহ	প্রাচীন বাংলা ৬০০ খ্রি.—১২০০ খ্রি. তুমহে ঘোড়া দেখহ

মধ্য বাংলা ১৩৭৬ খ্রি.—১৮০০ খ্রি. তুমহি ঘোড় দেখহ	আধুনিক বাংলা ১৮০১ খ্রি.—বর্তমান কাল তুমি ঘোড়া দেখ

এখানে কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ দেখানো হ'লো ঃ

যুগ	সাহিত্যিক নিদর্শন
ক. প্রাচীন যুগ ৬৫০ খ্রি.—দ্বাদশ শতাব্দী মতান্তরে দশম–দ্বাদশ)	১. চর্যাপদ ২. নাথ সাহিত্য ৩. ডাক ও খনার বচন ৪. লোকসাহিত্য
অন্ধকার যুগ (১১৯৩–১৩৭৫)	সাহিত্যিক নিদর্শন নেই বললেই চলে, কিছু দলিলপত্র, ছিটেফোঁটা কবিতা ইত্যাদি পাওয়া যায় মাত্র।
খ. মধ্য যুগ (১৩৭৬ খ্রি.—১৮০০ খ্রি.)	১. শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ) : বড়ু চণ্ডীদাস ২. মঙ্গলকাব্য ক. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (ষোড়শ) খ. মনসামঙ্গল কাব্য (সপ্তদশ) গ. ধর্মমঙ্গল কাব্য (সপ্তদশ) ঘ. সারদামঙ্গল কাব্য (অষ্টাদশ) ৩. বৈষ্ণব পদাবলী (ষোড়শ–সপ্তদশ) ৪. আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য (সপ্তদশ–অষ্টাদশ)

	পুথি সাহিত্যের যুগ (১৭৬০—১৮৬০)	মিশ্র ভাষারীতির কাব্য (বাংলা সায়র ও দোভাষী পুথি)
গ.	আধুনিক যুগ ঃ (১৮০১—আজ পর্যন্ত)	১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিভাগ চালু হয় এ কলেজে—তখন থেকে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয় এবং কাব্য-জগতেও আধুনিকতার স্রোত বইতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্য এক নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে

১ ড. এনামুল হক এই যুগ বিভাগের সমর্থক নন, চিত্তপ্রকর্ষের সাহায্যে যুগ-বিভাগের পক্ষপাতী তিনি

২. ড. আহমদ শরীফ বড়ু চণ্ডীদাস থেকে বাংলা সাহিত্যের শুরু বলে মনে করেন।

সাদৃশ্য
(Analogy)

আমরা সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে গেলে প্রতিটি মানুষের জীবনে চাল, ডাল, লবণ, তেলের মতো আরো কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের সাথে জড়িত হতে হয় যেমন, কাপড়চোপড়, জুতা-মোজা, কাগজ-কলম, ডাল-চাল ইত্যাদি। ঠিক এর মতোই আরো কিছু অদৃশ্য বস্তুর প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না। যেমন, চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। এর কোনোটার চেয়ে কোনোটার প্রয়োজন কম নয়। হয়তো খাবারের প্রয়োজনে চাল ডাল যেমন প্রয়োজন, চলবার সময়ে আচার-ব্যবহারের প্রয়োজন ঠিক তেমনি। এইসব কিছু নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা —সমাজে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় টিকিয়ে রাখা।

শব্দের জগতে তেমনি আমাদের বিভিন্ন রকম শব্দের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। মূল কতোগুলোর শব্দ থাকে, যার অর্থ সেই শব্দের প্রয়োজনে জড়িত হয়ে তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। আমাদের ভাষায় তার ব্যবহার তাকে জীবন্ত করে রাখে। কিন্তু এইসব শব্দকে আমরা কি কেবল শব্দ হিসাবেই তার অর্থটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অবিকলভাবে ব্যবহার করি? না, তা করি না। ভাষায় প্রয়োগ করার মুহূর্তে আমাদের ভাবের প্রয়োজন মতো তাকে ভেঙেচুরে বিভক্তি, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে সাজিয়ে তুলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র শব্দগুলো তার নিজস্ব অর্থ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ভাষায় প্রয়োগকালে তার রূপান্তর ও পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ঠিক তেমনি শব্দ ব্যবহার কালে মূল শব্দগুলোকে মনোভাবের সাথে একাত্ম করে বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করাটা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ নেয়া যাক, যেমন 'মওজুতদার'। এখানে এই শব্দটি যে কটি শব্দের সমষ্টি তা হচ্ছে 'মওজুত করে জীবিকা অর্জন করে যে', অর্থাৎ এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও ভাষায় ব্যবহারের সময় এগুলোকেও একত্রিত করে 'মওজুতদার' এভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। অর্থের দিক থেকে সব কটি শব্দের অস্তিত্ব আলো আঁধারির মতো এতে বিদ্যমান থাকলেও সহজ ও গতিশীল ভাষার প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তভাবে 'মওজুতদার' ব্যবহার করলাম। ঠিক একইভাবে একই ধরনের আরো শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন — দোকানদার, হালদার, খরিদ্দার, পাওনাদার ইত্যাদি। এরই অনুকরণে অথচ ভাষায় যা স্বতঃসিদ্ধ নয়, আমরা অনেক শব্দের সৃষ্টি করেও ফেলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ; যেমন — জোতদার, চাটুকদার ইত্যাদি।

তেমনি আরো কিছু এ ধরনের শব্দ গয়লানি, কাঠকুড়ানি ইত্যাদি। এর সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে মাস্টারনি, ডাক্তারনি, মজুরনি ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনো শ্রেণীর সব শব্দ মনে না রাখলেও চলে ; বরং একের সাদৃশ্যে আমরা অন্যগুলো তৈরি করে নিতে পারি।

এইভাবে অর্থসম্পন্ন শব্দ বা পদ-সমষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কোনো শব্দ বা পদের ধ্বনি বা অর্থ পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয় **সাদৃশ্য বা analogy.**

এই সাদৃশ্যের ভিত্তি হচ্ছে অনুষঙ্গ, যা শব্দের ছায়া হিসেবে মানুষের মস্তিষ্কে অহরহ কাজ করে। এ সম্পর্কে পণ্ডিত Oertal একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন : 'Association, in the broadest sense of the term, is the recall to consciousness by some conscious element, of one or more, psychological elements which have passed from consciousness.' মানুষের মুখ থেকে শোনা কথা আমরা যে মনে রাখি, তা এই অনুষঙ্গের জন্যেই। তাই অনুষঙ্গের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় ভাষার সাদৃশ্যগত পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনেরই নামান্তর। ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও শব্দার্থগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যতিক্রম ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে করুণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে, সেই ব্যতিক্রম কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা analogy-র ব্যাখ্যায় বোধগম্য হতে পারে, অন্যভাবে নয়. অতএব, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সাদৃশ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ ভাষা আজ যে রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত তা বহু যুগের বহু ক্রমবিবর্তনের পটপরিবর্তনের ফল. আজ এই ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র দিয়ে বাঁধা হয়েছে ভাষাকে। কিন্তু আদি যুগে এমনটি ছিলো না ; ছিলো না তখন ব্যাকরণ, ছিলো না ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃংখল রক্ষার তেমন কোনো ছক বা নিয়ম। যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রতিটি ভাষাই নানা কারণে, বিশেষত উচ্চারণ দোষে, ভুল শুনবার ফলে কিংবা নানা প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের (খানিকটা হলেও) প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে এই সাদৃশ্যবোধ। এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যবোধ মানুষের বিশৃংখল মনকে শৃংখলাবদ্ধ করেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে বেঁধে তাতে কিছুটা সারল্য এবং সহজ ব্যবহারোপযোগিতা দিয়েছে।[১]

সাদৃশ্যের উপযোগিতা দুটি— ১. ভাষাকে সঠিকভাবে শিখবার ব্যাপারে সাদৃশ্য অতখানি সাহায্য করে ; ২. ঠিক তেমনিভাবে ভুল শিখবার আশংকাও থাকে এর কারণে।

১. কোনো গোষ্ঠীর একটি ভাষা সঠিকভাবে শিখতে পারলে সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা শিখবার ব্যাপারে সাদৃশ্য দারুণভাবে সাহায্য করে। প্রথমটির 'পথ লক্ষ্য করে' অন্য ভাষাগুলোর সাদৃশ্যগত মিলগুলো তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। 'নতুন শব্দ' যেহেতু 'সাদৃশ্যজাত কারণে' সৃষ্টি হতে পারে, এ কারণে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির এক অপরিমেয় শক্তি 'সাদৃশ্যের' অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল একথা আমরা মেনে নিলে 'ভাষার বিস্তারে' এর গুরুত্ব অনায়াসে অনুমেয় হতে পারে।

২. সাদৃশ্যের কারণে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সব সময়ই 'অনুষঙ্গ' (Association)-এর উপর আমরা নির্ভরশীল হয়ে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে এসে রবীন্দ্রনাথের মতোই ভুল বানান এবং শব্দ সৃষ্টির (রোদসীর সাদৃশ্যে ক্রন্দসী) প্রয়াস পাই। আমরা ভাষা জানা সত্ত্বেও তাই ভুল ব্যবহারে ঝুঁকে পড়ি, একমাত্র সাদৃশ্যের প্রভাবেই। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ' এর ইংরেজি আমরা শতকরা আশি ভাগই 'Where you are going' করি (শুদ্ধ হচ্ছে : Where are

১. ভাষাতত্ত্ব : অতীন্দ্র মজুমদার।

you going') একমাত্র সাদৃশ্যের মায়াজালে জড়িয়ে গিয়ে। ভাষায় 'সাদৃশ্য' এমনি প্রভাব বিস্তার করে।

ভাষা-প্রবাহে সাদৃশ্য 'নিরন্তর ক্রিয়াশীল' এর কাজ তিনভাবে ভাষায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে : (ক) নতুন শব্দ বা পদ সৃষ্টি ; (খ) পুরনো শব্দ বা পদের ধ্বনি পরিবর্তন ; এবং (গ) পুরনো শব্দ বা পদের অর্থ পরিবর্তন।

(ক) নতুন শব্দ বা পদ সৃষ্টি : সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষার সচল গতিস্রোতে অসংখ্য নতুন নতুন শব্দ বা পদ সৃষ্টি হয়। পুরনো প্রচলিত শব্দের অনুকরণে মনস্তাত্ত্বিক কারণে অহরহ এইভাবে আমাদের অজান্তেই কতো যে নতুন নতুন শব্দ-পদ সৃষ্টি করে চলেছি, আমরা নিজেরাই হয়তো তার হিসেব রাখি না

যেমন, সংস্কৃতে দেবতা (দেবের অভাব), মিত্রতা (মিত্রের অভাব) ইত্যাদির অনুসরণে নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে মমতা (আত্মপরতা অর্থে)।

সংস্কৃতে স্ত্রী-লিঙ্গে ইনি (ইনা) প্রত্যয় যুক্ত হয় ইন ভাগান্ত শব্দে। যথা — হস্তিন + ইনি = হস্তিনী, সর্পিন + ইনি = সর্পিনী ইত্যাদি। এর সাদৃশ্যে বাংলায় হয়েছে বাঘ - ইনি = বাঘিনী ; সাপ + ইনি = সাপিনী ; সুকেশ + ইনি = সুকেশিনী

সংস্কৃত 'বধূটি' থেকে প্রাকৃতে হয়েছে 'বহুড়ী' এবং প্রাচীন বাংলায় হয়েছে 'বহুড়ি' এর অনুকরণে বাংলায় 'শাশুড়ী' অর্থে হয়েছে 'শউড়ী'।

দ্বাদশ (দ্বাদশ) শব্দে আ-কারের অনুকরণে 'একদশ' 'একাদশ-এ পরিণত হয়েছে।

এভাবে সাদৃশ্যের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ বা পদ সৃষ্টিতে ভাষার শব্দভাণ্ডার ক্রমশ বেড়ে চলেছে ভাষা সৃষ্টির সেই প্রথম লগ্নটি থেকেই।

(খ) পুরনো শব্দ বা পদের ধ্বনি পরিবর্তন : সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষার প্রচলিত ধ্বনিগুলোরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন, সংস্কৃতে স্বরান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি অনুসারে বিভিন্ন রকমের পদ হয়— নরস্য ; নাবঃ ; সাধোঃ ; পিতুঃ ; মুনেঃ ; ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্য অনুযায়ী সব সময় একই রকমের পদ হয়েছে— নরসস্ ; নাবসস্ ; সাধুসস্ ; পিউসস্ ; মুনিস্স্।

আমার, তোমার-এর সাদৃশ্যে বাংলার চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে তরার (তাহার অর্থে)।

'যেতে যেতে', 'খেতে খেতে' ইত্যাদির সাদৃশ্যে বাংলার কোনো কোনো (ঢাকা, ফরিদপুর) আঞ্চলিক ভাষায় এর পাঠ রূপান্তর দেখা যায় 'গেত্তে গেত্তে'।

(গ) পুরনো শব্দের বা পদের অর্থ পরিবর্তন : পুরনো শব্দ বা পদ এই সাদৃশ্যের প্রভাবে পড়ে তার প্রচলিত অর্থ হারিয়ে ফেলে নতুন অর্থ ধারণ করে, এমন নিদর্শন আমাদের ভাষায় প্রচুর পাওয়া যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতায় একটি শব্দের ব্যবহার করেছেন 'ক্রন্দসী'।[১] তিনি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা হলো 'আকাশ'। বেদেও 'ক্রন্দসী' শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে তার অর্থ 'রোদন' নয়, 'চিৎকারকারী সেনাদ্বয়'। অথচ রবিবাবু এই শব্দটির

---

১. উর্বশী : চিত্রা কাব্যগ্রন্থ : রবি ঠাকুর

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুর বধির উর্বশী

ব্যবহার করেছেন 'রোদসী' (রোদন > রোদসী) শব্দের সাদৃশ্যে ভর করে। এখানে মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

এছাড়াও, সাদৃশ্যের আরো কিছু কার্যক্রম ভাষায় পরিলক্ষিত হয় :

১. সমষ্টিগতভাবে শব্দের সাদৃশ্য ছাড়া কেবলমাত্র একটি বিশেষ শব্দের সাদৃশ্যেও নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে। পোর্তুগিজ 'আনানস্' শব্দের সাদৃশ্যে বাংলায় হয়েছে 'অনারস'। এই জাতীয় শব্দ গঠনের নাম মিশ্রণ বা **contamination.**

২. অনেক সময় একাধিক শব্দ একসাথে মিলে গিয়ে এক শব্দে পরিণত হয়। যেমন, বাংলা 'মিনতি' শব্দটি আরবি ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণের [মিন্নৎ (আরবি) + বিজ্ঞপ্তি (সংস্কৃত)] ফল। একে বলে জোড় কলম বা **Portmanteam.**

৩. আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদেশী কঠিন শব্দ, যা অন্য ভাষায় ধ্বনিগত সাম্যের অভাবে উচ্চারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে দেশী প্রচলিত ধ্বনি-সাম্যের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সেইসব বিদেশী শব্দের উচ্চারণ করতে হয়। এভাবে উচ্চারণ করে দেশী শব্দের রূপে রূপায়িত করার নাম লোক-নিরুক্তি বা **Folk, etymology** যেমন, hospital > হাসপাতাল ; কুবের > কুমীর ; arm-chair > আরাম কেদারা; উর্ণবাভ (বৈদিক) > উর্ণনাভ (মাকড়সা)।

৪. এ ছাড়াও, শিক্ষার আলো যাদের ওপর পড়ে নি, সঠিক শিক্ষার অভাব এবং উচ্চারণের অশিক্ষার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাক্যাংশ বা শব্দ বদলে যায়, অবশ্য এর পেছনে যে শক্তি কাজ করে, সে হলো সাদৃশ্য- এই বদলে যাওয়া নতুন বাক্যাংশ বা শব্দের নাম বিষমচ্ছেদ বা **Metanalysis.** উদাহরণ, ব্যবহারক > বেহারা ; নবরঙ্গ > নারাঙ্গ > নারাঞ্জ a norange > an orange ; bearer> বেয়ারা ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বের বিশ্লেষণে ধ্বনি সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক ধারণার প্রয়োজন আছে বলে এ আলোচনার শুরুতে ধ্বনিতত্ত্বের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। 'ধ্বনিতত্ত্ব 'এই গ্রন্থের একটি পৃথক খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সেখানে করা হবে।

ধ্বনি (Sound অথবা **Speech Sound**) : আমাদের বাকপ্রবাহে অর্থ সৃষ্টি করা, প্রকাশ করা এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বাক্যের (sentence) সাহায্য নিয়ে থাকি। সেই বাক্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেখানে ধ্বনি—ধ্বনিসমষ্টি, অক্ষর—অক্ষরসমষ্টি, রূপ—রূপসমষ্টি এবং শব্দ, পদ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদির সন্নিবেশ হয়ে থাকে। মনোভাবকে প্রকাশের জন্যে এগুলোর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

এই ভাষায় উচ্চারিত শব্দ (word) গঠিত হয় কিছু ধ্বনির সমন্বয়ে। যেমন— আম, আনারস, আকাশ—এর প্রতিটি শব্দে একাধিক ধ্বনির সমন্বয় ঘটেছে।

আম = (আ+ম) ; আনারস (আ+ন+আ+র+অ+স) ;

আকাশ=(আ+ক+আ+শ)।

আমাদের ফুসফুস-নির্গত নিশ্বাসবায়ুই এই ধ্বনি সৃষ্টির কারণ। আমাদের শ্বাসনালীর (Trachea) মধ্যে দিয়ে এই নিশ্বাসবায়ু এসে কণ্ঠনালীতে (Larynx) পড়লে তা গলা ও মুখবিবর অথবা গলা ও নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে। অবশ্য ইচ্ছা করলে এই নিশ্বাসবায়ুকে গলা ও ঠোঁটের মাঝপথে মুখের পেশীর সাহায্যে নানাভাবে পরিবর্তিত করে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব। এই ইচ্ছাকৃত বাধাসৃষ্টির ফলে যা উচ্চারিত হয়, তারই একেকটি একককে ধ্বনি (Sound) নাম দেয়া হয়েছে। এই ধ্বনির লিখিত রূপের নাম বর্ণ (Letter)। আমি যখন উচ্চারণ করি কলা (ক+অ+ল+আ), উচ্চারিত অবস্থায় এখানে চারটি ধ্বনির সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু একেই অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে যখন আমি কাগজে লিখতে যাবো, লিখিত প্রতিটি ধ্বনির যে রূপ বা চিহ্ন তাকেই বলা হবে বর্ণ।

একটি ধ্বনির একটি মাত্র রূপ—ধ্বনিবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পাল্টে যায়। বিভিন্ন ধ্বনি ভাষার পাশাপাশি অবস্থান করে বলে একের প্রভাবে অন্যটির বা পারস্পরিকভাবে সব ধ্বনির পরিবর্তন ও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই ধ্বনিমূলের পরিবর্তিত রূপের নাম **সহধ্বনি** বা Allophone, আর মূলধ্বনিকে বলা যেতে পারে **ধ্বনিমূল** বা **ধ্বনিতা** বা Phoneme. যেমন, 'ম' বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিমূল : বিভিন্ন ধ্বনির সংস্পর্শে এসে এর বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। যেমন,

মণি
আমরা } এখানে 'ম' ধ্বনিটি বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে।
আম

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ল'-ধ্বনির পরিবর্তন দেখিয়েছেন যেভাবে তা হলো, "ল-কারের পর ত-থ-দ-ধ কিংবা ট ঠ-ড-ঢ ধ্বনি এলে পরবর্তী দন্ত্য বা মূর্ধণ্য ধ্বনির প্রভাবে ল-এর উচ্চারণ-স্থান একটু পরিবর্তিত হয় ; যেমন, 'অলতা', 'হলদে' শব্দে ল-কার দন্তে উচ্চারিত হয় ; আবার 'উল্টা' ; 'পাল্টা' 'লাল' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দসমষ্টিতে এই 'ল' মূর্ধণ্য-ল হিসেবে উচ্চারিত হয়।

অক্ষর **(Syllable)** : নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করা যায়, তাকে বলে অক্ষর বা syllable. আমাদের বাংলা ভাষায় অক্ষরের আরেকটি অর্থ আছে, তা হলো বর্ণ বা ধ্বনি -সাধারণভাবে আমাদের বর্ণ বা ধ্বনিকে অক্ষর নামেই অভিহিত করার রীতি ছিলো। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি syllable-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আজকের বাংলা ভাষায় 'অক্ষর' নাম নির্ধারিত করা হয়েছে । নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, তা অর্থপূর্ণও হতে পারে, অর্থহীনও হতে পারে—তাই অক্ষরের আওতায় পড়বে যেমন, 'আম' একটি অক্ষর, যার একটি অর্থ আছে (একটি ফলের নাম) ; আমাদের (আ+ মা+দের) তিনটি অক্ষরের সব কটির অর্থ নেই।

এখানে দেয়া উদাহরণ দুটি থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট, তা হলো 'আম' পুরো শব্দটিই একটি মাত্র অক্ষর ; অন্যদিকে 'আমাদের' শব্দে 'আ'-ও একটি অক্ষর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'আ' এবং 'আম' অক্ষর হিসেবে একেকটি এককের সৃষ্টি করলেও দুটির ওজন এক নয়। 'আ', এখানে আরেকটি ধ্বনি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে অক্ষরকে দু'ভাবে ভাগ করা হয় —(ক) একটি অক্ষর যখন আরেকটি ধ্বনি ধারণ করতে পারে, অথচ অক্ষর হিসেবে একই এককে সীমিত থাকে তাকে বলা হয় **মুক্তাক্ষর** বা Open syllable; আর যখন কোনো অক্ষর নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সে অন্য ধ্বনি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না, তাকে বলা হয় **বদ্ধাক্ষর** বা Closed syllable. এখানে উদাহরণ দিচ্ছি :

	মুক্তাক্ষর		বদ্ধাক্ষর
আমাদের (আ+মা+দের)	= আ, মা	—	দের
পথিক (প+থিক)	= প	—	থিক
আনারস (আ+না+রস)	= আ, না	—	রস্
মহাবিদ্যালয় (ম+হা+বিদ+আ-লয়)	= ম, হা, আ	—	বিদ্, লয়
বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্+ অ+বিদ্+আ+লয়	= অ, আ	—	বিশ্,বিদ্, লয়

এবারে রূপতত্ত্বের আলোচনা খানিকটা সহজতর হবে বলে আমরা মনে করি।

বাক্যের বা কথার মাঝখান থেকে একেকটি শব্দকে ভেঙেচুরে যেমনভাবে ধ্বনি বা অক্ষর খুঁজে বের করা হয়, ঠিক তেমনিভাবেই রূপমূলও খুঁজে বের করা যায়।।

কথ্য বা লিখিত ভাষা থেকে শব্দ বা পদ খুঁজে বের ক'রে তাকেই নানাভাবে বিশ্লেষণ করলে ধ্বনিমূল (Phoneme), অক্ষর (Syllable) ও রূপমূল (Morpheme) ইত্যাদি পাওয়া যায়। অর্থাৎ রূপ সংগঠনের মূল এককের নামই রূপমূল

ধ্বনিমূল ও রূপমূলের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো, ধ্বনিমূল অর্থহীন (অর্থ থাকলেও তা ধ্বনিমূল হতে পারে) ; কিন্তু রূপমূল সর্বদাই অর্থময়। অর্থহীন হলে তা কখনোই রূপমূল হবে না। ধ্বনিমূলের সাথে রূপমূলের আরেকটি পার্থক্য হলো, ধ্বনিমূল সর্বদাই একটিমাত্র ধ্বনি নিয়ে গঠিত আর সেই ধ্বনির মূলই হচ্ছে ধ্বনিমূল। অন্যদিকে, রূপমূল একটি বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ও হতে পারে।

ভাষাতত্ত্বের জগতে এইচ. এ. গ্লিসন-এর নাম বিশেষ স্মরণীয়। তিনি এই রূপমূল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যেখানে রূপমূলকে ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, সেখানে কোনো কোনো রূপমূলকে ভাষা সংগঠনের ন্যূনতম অর্থময় একক হিসেবে মেনে নেয়া উচিত। কেননা, সেইসব রূপমূলকে অর্থ-পরিবর্তন বা রূপ-পরিবর্তন না করলে তার কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ বের করা অসম্ভব।[১]

যেমন জেল', কের',' পড়' ইত্যাদি

		ধ্বনিমূল	রূপমূল	
জল	=	জ, ল	জল	ন্যূনতম অর্থযুক্ত একক
কর	=	ক, র	কর	
পড়	=	প, ড়	পড়	

মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক ব্লক এবং ট্রেগার এই ধ্বনিমূল ও রূপমূলের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ধ্বনিমূল হচ্ছে অর্থহীন। কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে প্রাসঙ্গিক কোনো ভাষার যে কোনো অংশ কেবল ধ্বনিমূল পরম্পরায় ভিন্ন ভিন্ন গঠন বা রূপ নিয়ে নয়, বরং ঐ বিশেষ উপাদানগুলোর অর্থ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। ধ্বনিমূলের সাথে ব্যাকরণের অন্যান্য উপাদান যেমন, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির সাথে এই বিশেষ অমিল রয়েছে বলে ব্লক সাহেব ও ট্রেগার সাহেব ধ্বনিমূলকে বিশেষভাবে পৃথক করার পক্ষপাতী।[২]

অক্ষরের সাথে রূপমূলের তুলনা করলে রূপমূল সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত অক্ষর ; এবং ঐ একই ভাষা ব্যবহার করা যায় রূপমূল প্রসঙ্গে। শুধু যোগ করতে হয় এইটুকু যে, একটি রূপমূল গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক অক্ষরের সমন্বয় হতে পারে। অক্ষরের সাথে রূপমূলের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, অক্ষর অর্থপূর্ণও হতে

---

১. Morpheme as the smallest unit which grammatically pertinent. But it would then be necessary to define grammrnar as the study of morphemes and their combination. Some morphemes can be usefully described as the smallest meanigful units in the structure of the language. By 'smallest meaningful unit' we mean a unit which cannot be divided without destroying or drastically altering meaning.
— An Introduction to Descriptive Linguistics by H. A. Gleason.

২. A phoneme is a meaningless; but every element in the grammar of Language -a word, an ending, a sentence or whatever it may be — has not only a form, expressed as a particular combination of phonemes . . .but a meaning also.
—Outline of Linguistic Aalysis by Barnard Block & George L. Trager.

পারে, অর্থহীনও হতে পারে—অর্থাৎ অক্ষরের বেলায় তার অর্থ আবশ্যিক নয়। কিন্তু রূপমূলের বেলায় অর্থ আবশ্যিক। অর্থহীন হলে তা রূপমূল হবে না। যেমন,

		অক্ষর	রূপমূল
বক	=	বক্	বক
স্ত্রী	=	স্ত্রী	স্ত্রী
আম	=	আম	আম
অমৃত	=	অ, মৃত	অমৃত (দুই অক্ষর সমন্বিত রূপমূল)

এক অক্ষর, কিন্তু একাধিক রূপমূলের উদাহরণও বাংলা ভাষায় দেখা যায়, যেমন, 'যাই'—একটি অক্ষর (বন্ধাক্ষর) ; কিন্তু যা এবং ই (যা+ই) দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপমূল এখানে সমন্বিত হয়েছে

আমাদের ভাষা ব্যবহারে আমরা নিয়ত কতো প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দই না ব্যবহার করে চলেছি। এভাবে ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বলি 'আমার প্রতি তুমি কি বিরূপ হ'লে', 'অন্যায়ের প্রতি আমার কোনো সমর্থন নেই' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত 'প্রতি' (প্রতি+র—উহ্য) ইত্যাদি রূপমূলগুলোর ব্যাকরণগত অর্থময় সংকেত থাকা সত্ত্বেও এদের বস্তুগত কোনো পৃথক অর্থ বা অবয়ব বা সত্তা নেই কিন্তু অর্থবোধক হওয়ায় এগুলো রূপমূল হিসেবে স্বীকৃত।

এ ছাড়া আরো এক ধরনের রূপমূল পাওয়া যায়, যার বর্ণগত কোনো চিহ্ন বা আকৃতি নেই একে বলা যেতে পারে **শূন্য রূপমূল** বা Zero morpheme বা **শূন্য সপ্রতিবন্ধ** বা Zero modification.

উদাহরণ দেয়া যেতে পারে,

রমা ভাত খায়
শিলু গান গায়

ইত্যাদি বাক্যে 'ভাত' (ভাতকে খায়) এবং গান (গানকে গায়) ইত্যাদি শব্দের বিভক্তি উহ্য হওয়ায় শূন্য রূপমূলের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। অতএব, কেবলমাত্র বস্তুগত অর্থময় ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি নয়, যে কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি (চিহ্নহীন হলেও) অর্থময় ব্যাকরণগত সংকেত রূপমূল বলে স্বীকৃত হতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই রূপমূল শনাক্ত করা যায় কি ভাবে? এ ব্যাপারে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য : "পৌনঃপুনিক একরূপ কথার অংশসমূহ পাঠ প্রতিকল্প প্রথায় তুলনা করে সমার্থক অংশগুলিকে মূল এবং অন্যরূপ অংশগুলিকে বিকল্প ধরে, ভিন্নার্থক বিকল্পগুলিকে পরস্পর বৈপরীত্যসূচক বিবেচনা করতে হবে। এভাবে তুলনা এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে রূপমূল শনাক্তকরণ সম্ভবপর।"

রূপমূল নির্ণয়ের ছয়টি পথ এই ছয়টি পথ সম্পর্কে মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিদ ইউজিন এ. নাইডার প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে রূপ নির্ণয়ের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রদর্শিত পথই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এখানে তাই তাঁরই অনুসরণ করা হলো :

১. একই প্রকার ধ্বনি দিয়ে গঠিত এবং একই অর্থ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কথার অংশগুলোকে একেকটি রূপমূলের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। যেমন, ইংরেজি ভাষার একটি রূপমূল হচ্ছে 'er — worder, walker, dancer, runner ইত্যাদি ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েও ধ্বনিগত গঠন এবং অর্থ সব জায়গায় অভিন্ন হওয়ায় এই রূপমূলটি 'er' যথার্থ হয়েছে।

২. কথার যেসব অংশ একই রকম ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত না হয়েও একই অর্থ বহন করে, তেমন অংশকে একই রূপমূলের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। অবশ্য দেখতে হবে, এ ক্ষেত্রে তার গঠন-পার্থক্য ধ্বনিগতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি-না। ইংরেজিতে 'intolerable' এবং 'impossible' শব্দ দুটোর 'in' এবং 'im'-এর 'n' এবং 'm'- এর ব্যবহার নির্ভর করে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির ওপর। মূর্ধণ্য ধ্বনির আগে 'n' এবং ওষ্ঠ্য ধ্বনির আগে 'm' ব্যবহৃত হয়। তেমনি বাংলায় 'অনাহার' এবং 'অপকার' এখানে 'অন' এবং 'অপ'।

৩. একই জাতীয় ধ্বনি দিয়ে গঠিত নয় কিংবা এ গঠনের ভিন্নতা ধ্বনিগতভাবে ব্যাখ্যাযোগ্যও নয়, অথচ কথার সেইসব অংশ, যা একই অর্থ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাকে পরিপূরক পরিবেশজাত (complementary distribution) কারণবশত একই রূপমূল ধরা হয়ে থাকে। ইংরেজি থেকে উদাহরণ—

roses (rozes) ez
boys (boyz) z
lips (lips) s
} একই রূপমূলের সহরূপমূল।

৪. যদি কথার কোনো কোনো অংশ তাদের ন্যূনতম ধ্বনি এবং অর্থগত পার্থক্য এক ধরনের ধ্বনিজাত হয়, তাহলে তাদের বাহ্যিক আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তারা একই রূপমূলের পর্যায়ভুক্ত হবে। যেমন,

foot বহুবচনে feet)
sheep বহুবচনে sheep)
} এখানে আকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও ন্যূনতম ধ্বনি এবং অর্থগত পার্থক্য এক ধরনের হওয়ায় এরা একই রূপমূল।

৫. (ক) সমধ্বনি রূপমূল (homophonous) আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশ করলে তাদেরকে যেমন আলাদা আলাদা রূপমূল হিসেবে গণ্য করা হয়, তেমনি (খ) সমার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন সমধ্বনি রূপমূল একই রূপমূল হতে পারে, যদি তাদের অর্থ বৈশিষ্ট্য অবস্থানগত পার্থক্যের সাথে সমান্তরাল হয়। অর্থ বৈশিষ্ট্য যদি তাদের অবস্থানগত পার্থক্যের সাথে সমান্তরাল না হয়, তাহলে তাদেরকে আলাদা আলাদা রূপমূল হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৬. (ক) স্বতন্ত্রভাবে কোনো রূপমূল ব্যবহৃত হলে তাকে স্বতন্ত্র রূপমূল বলে ধরে নিতে হবে

(খ) ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও অন্তত একটি সমন্বয়ে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলেও তা স্বতন্ত্র রূপমূল বলে বিবেচিত হবে।

(গ) একক সম্বন্ধিত যার সঙ্গে সমন্বয় হয়, তা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে স্বতন্ত্র রূপমূল হিসেবে পরিগণিত হবে

বাংলা রূপতত্ত্ব

বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতদের যথেষ্ট সহৃদয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণ রচিত বলে বাংলা ভাষার রূপগত রূপের সাথে সর্বাংশে মিলে না, ভুল হয় এবং অর্থ পার্থক্য ঘটে। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি, সম্প্রদান কারক। সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের রূপগত তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর বিভক্তিও স্বতন্ত্র। কিন্তু তার অনুসরণে বাংলা সম্প্রদান কারক কর্মকারকেরই নামান্তর। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা যেহেতু ভাষার বিশ্লেষণে বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি ক'রে, এ কারণে তাঁদের বিচারে কর্মকারক এবং সম্প্রদান কারকের কোনো পার্থক্য নিরূপিত হবে না ; (যদিও বাংলায় সম্প্রদান কারককে স্বাতন্ত্র্য দেয়ার জন্যে 'স্বতন্ত্রাণ' করার অর্থ যোজনা করা হয়েছে) ; বরং কর্মকারকের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংলার কথ্যরীতির রূপতাত্ত্বিক সংগঠন বিশ্লেষণে মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক চার্লস এ. ফারগুসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] তিনি বাংলার কথ্যরীতির শব্দ সংগঠন বিশ্লেষণ ক'রে ছয় ধরনের রূপমূল নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন :

১. শব্দের মূল অংশ (nuclei) এবং মূল সাংগঠনিক (stem) রূপমূল।

২. 'মূলে'র পূর্ববর্তী রূপমূল বা আদ্য-প্রত্যয় (Prefix), যা মূলের অর্থকে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বা সংশোধিত করে

৩. শব্দের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি মূলের সাথে ব্যবহৃত রূপমূল। এগুলো সাধারণত সংখ্যাবাচক শব্দের আগে, পরে কিংবা মধ্যে বসে। এগুলো যদি কখনো কেন্দ্র-মূলের পরে বসে, তাকে বলে 'বিস্তার' বা Extension.

৪. আর এক রকম রূপমূলের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলো সাধিত প্রত্যয়ান্ত বা Derivational suffix.

৫. আমাদের কথ্য ভাষা রীতিতে আরেক ধরনের রূপমূল রয়েছে, যার নাম সম্প্রসারিত প্রত্যয়ান্ত বা Inflectional suffix.

৬. আমাদের চলিত ভাষায় আরো এক ধরনের রূপমূলের ব্যবহার আমরা করি, যেগুলো নিশ্চয়তাসূচক অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আমি যাবোই। = যাবো+ই } 'ই' এবং 'ও' এই ধরনের
মালাও যাবে। = মালা+ও } রূপমূলের উপমা।

---

১. Charles A. Ferguson : The Phonology and Morphology of the Standard Colloquial Bangali.

বাক্যতত্ত্ব
(Syntax)

আমাদের ব্যবহারে ভাষা যেহেতু মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম, সেই কারণে মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো অনেক কথার সাহায্য নিতে হয়, আবার কখনো দুই একটি শব্দই যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির সাহায্যে প্রকাশিত হয়, তার নাম বাক্য (sentence)।

মুক্তা বিদেশে থাকে।
সুমন হাসতে পারে।
সাবিত্রী লেখাপড়া করে।

এখানে প্রতিটি বাক্যে অর্থের পূর্ণতা রয়েছে বিভিন্ন পদের সমন্বয়ে এই বাক্যগুলো গঠিত। কিন্তু কথোপকথনের সময় দেখা যায়, কোনো কোনো সময় একটি মাত্র পদও একটি পূর্ণ বাক্যের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

—সুপর্ণা কোথায় যায়?
— স্কুলে।

এখানে উপরের বাক্যে তিনটি পদ মিলিয়ে একটি অর্থের পূর্ণতা দিচ্ছে; পরের বাক্যে একটি মাত্র পদ, কিন্তু পুরো অর্থ অর্থাৎ 'সুপর্ণা স্কুলে যায়' এই অর্থ প্রকাশ করছে।

প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্যের পদ-বিন্যাসকেই বাক্য বিশ্লেষণের প্রধান সূত্র বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু 'রূপমূল বা রূপমূল সমবায়ে গঠিত শব্দগুলোর পরস্পর সম্পর্কিত অবস্থান ব্যবস্থার রীতি বিশ্লেষণ' বাক্যতত্ত্বের কাজ বলে বর্ণনামূলক ব্যাকরণে স্বীকৃত। ব্যাকরণিক শব্দ এবং স্বরভঙ্গির ন্যূনতম এককেকে বাক্য বলা হয়। বাক্যের দুই রূপ — (ক) আমাদের বাক্‌প্রবাহের কথার অংশ, খণ্ডাংশ বা টুকরো, যাকে স্বাধীনভাবে অর্থযুক্ত করে ব্যবহার করা চলে তাকে বলা হয় মুক্ত রূপ (free form); আর (খ) যা কখনো স্বাধীনভাবে অর্থযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় না, তার নাম বদ্ধরূপ (closed form)। শব্দের চেয়ে বড় সংগঠন, বাক্যাংশের খণ্ড অংশ (clause) এবং বাক্যের সংগঠনের বিশ্লেষণকেই বলা হয় বাক্যতত্ত্ব বা **syntax.**

ব্যাকরণের এমন এক এককের নাম বাক্য, সাধারণত যতি বা স্বরভঙ্গি রেখা দিয়ে অন্ত চিহ্নিত থাকে এবং যা অনেক সময় (সব সময় নাও হতে পারে) বৃহত্তর সংগঠনের স্থান পূর্ণ করে। এটা বলেছেন মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক এলসন এবং পিকেট।[১]

বাক্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ শব্দের পর্যায় পর্যন্ত সীমিত। এরপর যে পর্যায় আসে, তাহলো, রূপতত্ত্বের পর্যায়। বাক্যতত্ত্বের ন্যূনতম পর্যায় শব্দ হলেও বাক্যের বিশ্লেষণে খণ্ড বাক্য,

---

১. Bengali Morphology Syntax by Benjamin Elson and Velma B. Picket.

অতঃপর শব্দ (যাকে ভাষাতত্ত্বের ভাষায় ন্যূনতম বাক্যাংশ বা word বলে), এইভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এই বাক্যতত্ত্ব তাকেই বলে, যেখানে কিভাবে শব্দ এবং রূপমূল (suprasegmental morpheme) সমূহ কথার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কে বিন্যস্ত, তার বিশ্লেষণ করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত রূপমূল (যতি বা ছেদ বা juncture) এবং স্বরভঙ্গি বা intonation বাক্যের অন্যান্য রূপমূলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

আমরা যখন কথা বলি, তখন ভাবের ও গুরুত্বের উপর আমাদের ভাষা গুচ্ছ গুচ্ছ শব্দ নিয়ে উচ্চারিত হয়, আর তার কোনো অংশে জোর বা ঝোঁক বেশি পড়ে, আবার কোনো অংশে জোর বা ঝোঁক কম পড়ে। যেমন আমি যখন ভাষায় ব্যবহার করি :

'শর্মিলী অপূর্ব গায়। ওর গান কানের ভিতর দিয়ে মর্মে গিয়ে স্পর্শ করে। আমি ওকে ভালোবাসি।' এখানে স্বাভাবিকভাবেই আবেগময়তা এসে ভাষার রূপের সাথে যুক্ত হবে ; ফলে বিভিন্ন শব্দ কখনো 'বিলম্বিত' হয়ে, কখনো 'ঝোঁক' সহকারে উচ্চারিত হবে।

কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তির সময় এই ঝোঁক (stress), স্বরাঘাত (accent), স্বরভঙ্গির (intonation) বিচিত্র ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করে।

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী—
বুঝিতে না পারি কি জানি কি আছে তোমার মনে ?[১]

আবৃত্তির সৌন্দর্য এই ঝোঁক, স্বরাঘাত এবং স্বরভঙ্গি অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

স্বরাঘাত শব্দের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ শব্দের কোনো কোনো অংশে ভাষা ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত প্রবল হলে সেখানে স্বরাঘাত পড়ে, যার ফল হিসেবে কথার সেই অংশে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়ে। এই স্বরাঘাত বাক্য পর্যায়ে যখন উন্নীত হয় তখন তার নাম স্বরভঙ্গি বা intonation. অর্থাৎ বাক-প্রবাহের শব্দগুলোর কোনো কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ওপর জোর বেশি পড়ায় আবেগ বা মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় বলে স্বরভঙ্গি আমাদের ভাষায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এই স্বরভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, এই স্বরভঙ্গির পার্থক্য অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে ভাষার বা শব্দের অর্থ পর্যন্ত পালটে যায়।

এখানে একটি গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। একজন পিয়নকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'শালা' বলে গাল দেয়ায় সে আইনের আশ্রয় নেয়। বিচারক সাহেব ব্যাপারটার সুবিচার করতে গিয়েও খানিকটা বিব্রতবোধ করেন। অনেক ভাবনার পর তিনি এর আপোষ মীমাংসার কথা চিন্তা করেন। পিয়নকে ডেকে তিনি বুঝিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, আপনার উর্ধ্বতন অফিসার আপনার বড় বোনকে বিয়ে করেছেন, ব্যাপারটা এইতো। অর্থাৎ আপনার অফিসারের স্ত্রী আপনার বোন। আপনার তাঁকে (অফিসারের স্ত্রীকে) বড় বোন বলে ডাকতে আপত্তি কি ?'

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিরুদ্দেশ যাত্রা (সোনার তরী)।

পিয়ন বললো, 'না হুজুর, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।'

বিচারক, 'তাহলে আপনার অফিসার আপনাকে শালা বলায় আপনি মামলা করতে এসেছেন কেনো—আপনার মামলা করতে আসা উচিত হয় নি।'

পিয়ন তখন উত্তর দিলো, 'কিন্তু হুজুর, আপনি যেভাবে 'শালা' বলেছেন অফিসার এভাবে শালা বললে আমি ধন্য হতাম। তিনি মুখ ভেংচিয়ে যে টেনে শালা উচ্চারণ করেছিলেন, আমার আপত্তি এখানেই।

এই উদাহরণ থেকেই স্বরভঙ্গি বা intonation ভাষায় কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যায়।

এইচ. এ. গ্লিসন তাঁর An Introduction to Descriptive Linguistic গ্রন্থে বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা হলো, সাধিত (derivation) এবং সম্প্রসারিত (inflection) সংগঠনের (constructions) বিন্যাসের (arrangements) বৃহত্তর পর্যায়গুলোর নামই বাক্যতত্ত্ব হওয়া উচিত। যে কোনো উল্লেখযোগ্য শব্দ বা রূপমূল সমষ্টি তাঁর ভাষায় সংগঠন' (construction) এবং বৃহত্তর সংগঠনের অংশগুলোর (সংগঠন, শব্দ বা রূপমূল) তাঁর ভাষায় 'উপাদান' (constituent) বলে গণ্য। আর তিনি যাকে 'অব্যবহিত উপাদান' (Immediate constituent) বলে উল্লেখ করেছেন, তা হলো দুই বা ততোধিক সংগঠনের একটি যা থেকে একটি, সংগঠন সরাসরিভাবে কাজ করে। তাঁর ভাষায় বাক্যতত্ত্বের সংজ্ঞা হলো, '... the principles of arrangement of the constructions formed by the process of derivation and inflection into larger constructions of various kinds.'

গ্লিসনের বক্তব্য অনুসারে বাক্য বিশ্লেষণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে অব্যবহিত উপাদান বা Immediate constituent; আর বাক্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া হচ্ছে, অব্যবহিত উপাদান আর অব্যবহিত সংগঠনের স্তরগুলো প্রথমে খুঁজে বের করা এবং অব্যবহিত উপাদানের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অতিরিক্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ 'বাক্য সংগঠনের যে সব উপাদান অব্যবহিত রূপে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে সে সব উপাদানই হলো অব্যবহিত উপাদান।'

বাংলা বাক্যের সংগঠন

বাংলায় রচিত বাংলা ভাষা সম্পর্কিত ব্যাকরণগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে রচিত। বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য তাই অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নি। বাংলা বাক্য সংগঠন সম্পর্কে অবশ্য বাংলা ব্যাকরণগুলোর আলোচনা নির্ভরযোগ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল তার পরিবর্ধন এবং আংশিক পরিবর্তনের ও পরিশোধনের আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বাংলা বাক্যের সংগঠন বাক্যের 'উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে' কেন্দ্র করে। এখানে বাক্যের অব্যবহিত উপাদান হিসেবে 'একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয়'। একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষণ, একটি সর্বনাম, বিভিন্ন প্রকার বাক্যাংশ বা খণ্ড বাক্য এবং একটি বিধেয় অর্থাৎ একটি ক্রিয়া বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন বৃহত্তর সংগঠনসমূহ মিলে বাংলা বাক্য সংগঠিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' লইয়াই বাক্য। প্রকৃতপক্ষে সমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে বাক্যের মূল বা প্রধান 'বিধেয়' এবং সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হইতেছে বাক্যে প্রধান 'উদ্দেশ্য'। অন্যান্য যে সমস্ত পদ বা বাক্যাংশ বাক্যে থাকে, সেগুলি হয় 'উদ্দেশ্যের অন্তর্গত, না হয় 'বিধেয়'-র অন্তর্গত। ... বাক্যাংশ হইতেছে বাক্যের প্রধান 'উদ্দেশ্যের' ... (সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার) বিশেষণ ... সেই সমস্ত পদ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু সেগুলির দ্বারা প্রধান 'উদ্দেশ্যই প্রসারিত হয়। বাক্যস্থিত যে পদ বা পদসমূহের দ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য প্রসারিত হয় সেই পদ বা পদসমূহকে বলা হয় 'উদ্দেশ্যের প্রসারক।'[১]

'অমিত খেলছে'

এখানে উদ্দেশ্য 'অমিত' একটি পদ বা বাক্যাংশ, আর 'খেলছে' বিধেয়ও একটি পদ বা বাক্যাংশ এবং তা সমাপিকা ক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যকে অন্য পদ বা বাক্যাংশের সাহায্যে অনায়াসে প্রসারিত করা যায়—

আমাদের অমিত খেলছে

আমাদের আদরের অমিত খেলছে।

আমাদের অনেক আদরের অমিত খেলছে।

আমাদের অনেক আদরের শান্তশিষ্ট অমিত খেলছে।

এখানে উদ্দেশ্য প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন পদ বা বাক্যাংশের সংযোজনে।

'উদ্দেশ্য' ও 'উদ্দেশ্যের প্রসারক' ছাড়া বাক্যের অন্যান্য যেসব অংশের সাহায্যে 'বিধেয়' প্রসারিত হয় তাকে বলে 'বিধেয়ের প্রসারক'।

অমিত **বল** খেলছে।

অমিত **লাল বল** খেলছে।

---

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

অমিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য বল খেলছে
অমিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য ভালো করে বল খেলছে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাক্য তিন প্রকার—

ক. সরল বাক্য (simple sentence) খ. জটিল বাক্য (complex sentence) এবং গ. যৌগিক বাক্য (compound sentence)।

ক. সরল বাক্য : এতে একটি 'উদ্দেশ্য' ও একটি 'বিধেয়' (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে। এই 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়'-এর প্রসারক থাকতে পারে, তবে প্রধান 'বিধেয়' অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া মাত্র একটি থাকে (অসমাপিকা ক্রিয়া একাধিক থাকতে পারে)। যেমন –

অমিত ভালো গান গায়।
অমিত প্রতিদিন স্কুলে যায়।
বৃষ্টি না হলে আজ আমি অমিতদের বাসায় যাবো।

খ. জটিল বাক্য : একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য নিয়ে বৃহত্তর বাক্য গঠিত হলে তাকে বলে জটিল বাক্য। 'খণ্ডবাক্যের অধীন' খণ্ডবাক্য স্বকীয় অর্থের পরিপূর্ণতার জন্যে প্রধান খণ্ডবাক্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি 'জটিল বাক্য'। খণ্ডবাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, অন্যদিকে জটিল বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্যের সমষ্টি হওয়ায় সেখানে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

লিংকন বি. এ. পাশ করলেও জ্ঞানলাভ করেছে অনেক বেশি
লুবনা যদি প্রতিদিন সকালে ওঠে, স্বাস্থ্য ওর ভালো হবেই
মিন্টু পড়াশুনায় ফাঁকি দিলেও মিথ্যা কথা কখনো বলে না
জটিল বাক্যে প্রধান খণ্ডবাক্যের 'অধীন খণ্ডবাক্য' তিন রকম—

১. **বিশেষ্য স্থানীয়** বা বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত এবং প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো পদের সাথে অন্বিত (Noun clouse) ;

২. **বিশেষণ স্থানীয়** বা বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত এবং প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো পদকে বিশেষিতকরণ (Adjective clause) ; এবং

৩. **ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয়** খণ্ডবাক্য ক্রিয়া বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত এবং প্রধান খণ্ড বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অবস্থা ইত্যাদি নির্দেশক (Adverbial clause)

গ. যৌগিক বাক্য : সংযোগবাচক অব্যয়ের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য সংযোগে গঠিত একটি পূর্ণ বাক্য। যোগসাধক অব্যয় অনুপস্থিত থাকতেও পারে, তবে যৌগিক বাক্যে একাধিক বাক্য থাকে বলে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই থাকে (যদিও অনুপস্থিত থাকলেও খুব অসুবিধে হয় না)।

দিন থাকতে কাজ করো, সন্ধ্যার আগে যেতে পারবে
রমা গান গায় কিন্তু মুখের হাসি তার ম্লান হয় না।
রাত জেগে যদি পড়াশুনা করো, তবে পরীক্ষায় তুমি যে ভালো করবেই, এ নিশ্চয়তা আমি দিতে পারবো না।

শিলু আর শিবানী ইলুকে ঈর্ষা করে, কারণ ইলু পড়াশুনায় অনেক ভালো।

বাংলা বাক্যের পদক্রম (word orders)-কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেভাবে দেখিয়েছেন তা হলো :

১. বাক্যের 'উদ্দেশ্য' বা 'বিধেয়' উহ্য থাকতে পারে।
(তুমি) যাই বলো না কেনো, মালা বড় ভালো (হয়)।

২. 'উদ্দেশ্য' 'বিধেয়'র পূর্বে বসে।
সুমন হাসে।

৩. 'উদ্দেশ্যের প্রসারক' 'উদ্দেশ্যের' পূর্বে বসে।
ভালিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত বড় ভালো গায়।

৪. 'বিধেয়ের প্রসারক' 'বিধেয়'র পূর্বে বসে এবং বাক্যের সর্বশেষে বসে 'বিধেয় ক্রিয়া'।
শামীম দ্রুত হাঁটে।

কেবলমাত্র নঞর্থক বাক্যে 'না', 'নাই', 'নি' ইত্যাদি অব্যয় বিধেয়ের পরে বসে। অবশ্য 'না' অব্যয়টি বিধেয়ের পূর্বেও বসতে পারে। যদি 'বিধেয়ের প্রসারক' থাকে, তাহলে 'বিধেয়ের পরিপূরক' 'প্রসারকের' পূর্বে কিংবা পরে বসতে পারে, যেখানে পরিপূরকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে তা পরে বসে।

৫. 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়'র 'প্রসারক' এবং পরিপূরকের অবস্থান ক্রমে 'বিধেয়ের প্রসারক' 'উদ্দেশ্যের' পূর্বে বসতে পারে, কিন্তু 'পরিপূরক' সর্বদা 'উদ্দেশ্যে'র পরে বসে। 'বিধেয়ের প্রসারক' উপস্থাপিত প্রস্তাব সাধারণত 'উদ্দেশ্য' বা 'কর্তা'র পূর্বে বসে।

সত্যি সত্যি মেয়েটি ফেল করলো।

৬. 'উদ্দেশ্য' বা 'কর্তা' এবং 'বিধেয়' বা 'ক্রিয়া'র পরস্পরের মধ্যে পুরুষ বিষয়ক এবং গুরু–লঘু বিষয়ক সংগতি প্রয়োজন। যেমন,

উত্তম পুরুষের 'কর্তা'র সাথে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া, মধ্যম পুরুষের তুচ্ছতাবোধক রূপের সাথে অনুরূপ ক্রিয়া। কিন্তু যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম পুরুষের কর্তা থাকে, সেখানে উত্তম পুরুষের এবং উত্তম পুরুষ না থেকে মধ্যম থাকলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া হয়।

নীলু আর আমি বেড়াতে যাবো।

৭. সাধারণত প্রধান খণ্ডবাক্যের পূর্বে বসে অধীন খণ্ডবাক্য।

যদি ডাক্তার আসতে দেরী হয়, তুমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেয়ো।

উদ্দেশ্য বা কারণসূচক খণ্ডবাক্যের পরে, অব্যয় হিসেবে প্রযুক্ত 'বলে' এই অসমাপিকা ক্রিয়া প্রযোজকের কাজ করে।

আমি এক নজর তোমাকে দেখবো বলে ময়মনসিংহ যেতে চাই।

৮. অনেকগুলো পদ 'উদ্দেশ্য' রূপে কিংবা 'উদ্দেশ্যের প্রসারক' রূপে যুক্ত হলে শেষ পদটির পূর্বে সমুচ্চয়ার্থক বা বৈকল্পিক অব্যয় পদ 'ও', 'এবং' 'বা', 'অথবা' ইত্যাদি বসে।

নীলু, শীলু ও দিলু আজ বেড়াতে আসবে।

তরুণ ,বরুণ এবং শান্তা আজকের নাটকের আলোচ্য চরিত্র।

ঢাকা থেকে খুলনা, খুলনা থেকে রাজশাহি অথবা চট্টগ্রাম যাবার কথা ভাবছি।

এমনি অনেকগুলো পদ একই বাক্যে থাকলে সেগুলোকে কতগুলো অর্থানুগত ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে ভাগ করা হয়। একাধিক সংযোগের সাহায্যেও তাকে যুক্ত করা চলে।

৯. সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত কতকগুলো পদের সবগুলো পদে বিভক্তি যুক্ত না করে শেষের পদটিতেই বহুবচন বা বিভক্তি প্রভৃতি চিহ্ন যুক্ত করা হয়।

অধ্যাপক খোদা বক্স মিয়া, অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম ও আমি এক সাথে বাসে যাচ্ছিলাম।

১০. সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত হয়েও বস্তুগত পার্থক্য থাকলে প্রত্যেক পদে আবশ্যিক বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়।

বাঙালি ধনের ও মানের কাঙাল।

সংযোজক অব্যয় না থাকলে, বহু বচনে সমান হয়েছে বুঝতে হবে এবং সেই অনুসারে সমস্ত পদের সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়।

১১. একাধিক ক্রিয়াপদের কালের সংগতি (Sequence of tenses) বাংলা ভাষায় রক্ষা করার নিয়ম নেই।

১২. পরোক্ষ উক্তির (Indirect narration) বেলায়ও বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের সংগতির প্রচলন বাংলা ভাষায় নেই।১৩. একই উদ্দেশ্যের অনেকগুলো 'বিধেয়' বা 'ক্রিয়া' পদ পর পর আসলে, সমুচ্চয়ার্থক বা সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত দুইয়ের অধিক সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত একই বাক্যে প্রযুক্ত হয় না — কেবলমাত্র শেষ ক্রিয়াপদটিকে, অথবা মধ্যের একটি ক্রিয়াপদ ও এই দুটিকে সমাপিকারূপে প্রয়োগ করে, বাকি ক্রিয়াগুলোকে 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ করতে হয়।

১৪. কতকগুলো পদ পরস্পরের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত (correlatives) একটির প্রয়োগ হলে আরেকটির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, নইলে বাক্য অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

১৫. দূরান্বয় পরিহার্য। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই ক্রম রক্ষা করা হয়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত সূত্রের সাথে ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একাত্মতা প্রকাশ করলেও তাঁর বিশ্লেষণে কিছু নতুন সূত্র সংযোজিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম পুরুষের কর্তা থাকে, সেখানে উত্তম পুরুষ পরগামী হয় ও ক্রিয়া উত্তম পুরুষের সঙ্গে সংগতি রাখে এবং যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম পুরুষ না থেকে মধ্যম পুরুষ থাকে সেখানে মধ্যম পুরুষ পরগামী হয় এবং ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের সঙ্গে সংগতি রাখে।

সে, তুমি ও আমি গান গেয়েছিলাম

২. একটি বাক্যে একাধিক পুরুষের কর্তা থাকলে প্রথমত নাম, দ্বিতীয়ত: মধ্যম ও তৃতীয়ত: উত্তম পুরুষের কর্তা বসে এবং উত্তম পুরুষের সঙ্গে বিভক্তি যোগের দিক থেকে সংগতি রাখে।

৩. উদ্দেশ্যাংশ বা বিধেয়াংশ নির্বিশেষে বিশেষণ পদ গুণ প্রকাশক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের পূর্বে এবং ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

আমাদের প্রিয় শিল্পী আবদুল জব্বার মধুর গান ধীরে ধীরে গাইছেন।

৪. সর্বনাম পদের বিশেষণ সর্বনামের পরে বসে এবং বিধেয় বিশেষণ উদ্দেশ্যের পরে বসে।
নাজমা অসুস্থ।

৫. 'যেন', 'যেহেতু', 'কেননা' প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত বাক্যাংশ অন্য বাক্যাংশের অধীন হলে পরে প্রধান বাক্যাংশের পরে বসে।

তাকে বলো যেনো সে আসে।

৬. অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং যে কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে সেগুলো ঐ ক্রিয়ার পূর্বে বসে থাকে।
বিমলা স্কুল পালিয়ে এসে হাসতে লাগলো।

৭. নঞর্থক 'না' অব্যয় 'বিধেয়' ক্রিয়ার পরে বসে।
সে যে আমার গান শুনলো না।

৮. মূল বাক্যের অধীন অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্যে নঞর্থক 'না' অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

রিয়া আমাকে না বলেই চলে গেলো।

বাংলা বাক্য সংগঠন সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিশ্লেষণ এখানে সংযোজিত না হলে, আমার বিশ্বাস, এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে. এ কারণে তাঁর বক্তব্যের ও বিশ্লেষণের মূল সূত্র ও পদ্ধতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. উদ্দেশ্যের প্রসারক কি কি ভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

ক. বিশেষণ পদের সাহায্যে —
ধীরে বাতাস বইছে।

খ. সম্বন্ধ পদের সাহায্যে —
রমার বোন এসেছেন।

গ. সমকারক বিশেষ্যের (Noun in apposition) সাহায্যে —
ফিলিপের ছেলে মহান আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশের সাহায্যে—
আমি বিদেশ ঘুরে এসেছি।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ —

ক. একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিলো।
খ. সন্ন্যাসী নানা দেশে ভ্রমণ করে অবশেষে কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন।
গ. আমার বাবা অতি যত্ন সহকারে আমাদের সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।
ঘ. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অচিরেই সবার মন জয় করেছিলেন।
ঙ. আমি তার মতো জ্ঞানী কোথাও দেখি নি।
চ. তিনি পরম ধার্মিক।

ভ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুসরণে সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

	১	২	৩ বিধেয়			৪
বাক্য সংখ্যা	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	কর্ম (বিশ্লেষণীয় পদসহ)	সম্পূরক (বিশ্লেষণীয় পদসহ)	সমাপিকা ক্রিয়া	বিধেয়ের/ ক্রিয়ার প্রসারক
ক	হাড়	×	×	×	ফুটেছিলো	১. একদা ২. এক বাঘের গলায়
খ	সন্ন্যাসী	১. নানা দেশে ভ্রমণ করে ২. অবশেষে কাশীতে এসে	×	উপস্থিত	হলেন	×
গ	বাবা	আমার	১. আমাদের সবাইকে ২. লেখাপড়া	×	শিখিয়েছিলেন	অতি যত্ন সহকারে
ঘ	রবীন্দ্রনাথ	বিশ্বকবি	১. সবার ২. মন জয়	×	করেছিলেন	অচিরেই
ঙ	আমি	×	শরীকের ন্যায় জ্ঞানী	×	দেখিনি	কোথাও
চ	তিনি	×	×	পরম ধার্মিক	হন (উহ্য)	×

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ :

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে প্রধান খণ্ডবাক্য ও অধীন খণ্ডবাক্যগুলো পৃথক করতে হয় এবং অধীন খণ্ডবাক্যগুলোকে অন্য খণ্ডবাক্যের সাথে কিভাবে অন্বিত তার বর্ণনা প্রয়োজন। এরপর একেকটি খণ্ডবাক্যের বিশ্লেষণ করা হয়।

শোনো, পাখি কি মধুর গান গাইছে।

এই জটিল বাক্যটির বিশ্লেষণ হবে এইভাবে—

ক. শোনো —প্রধান খণ্ডবাক্য (সরল বাক্য)

খ. পাখি কি মধুর গান গাইছে – বিশেষ্য স্থানীয় সরল বাক্য 'শোনো' এই ক্রিয়ার কর্ম

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুসরণে জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্যসংখ্যা	১ উদ্দেশ্য	২ উদ্দেশ্যের প্রসারক	৩ বিধেয়			৪ বিধেয়ের/ক্রিয়ার প্রসারক
			কর্ম (বিশেষণীয় পদসহ)	সম্পূরক (বিশেষণীয় পদসহ)	সমাপিকা ক্রিয়া	
ক.	তুমি (উহ্য)	×	পাখি কি মধুর গান গাইছে	×	শোন	×
খ	পাখি	×	কি মধুর গান	×	গাইছে	×

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ যেভাবে করার পক্ষপাতি তা হলো :

যৌগিক বাক্যকে প্রথমে তার উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্যে বিশ্লেষণ করে তারপর পৃথকভাবে স্বাধীন বাক্যগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হয়।

সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায়, জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায়। যেমন—

তুমি যাকে ঘৃণা করছো সে দরিদ্র বটে, কিন্তু সে লোভী নয়.

এর বিশ্লেষণ হবে এইভাবে

১. উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্য

ক. তুমি যাকে ঘৃণা করছো, সে দরিদ্র বটে–জটিল বাক্য।

খ. সে লোভী নয়— সরল বাক্য।

২. কিন্তু স্বাধীন যোজক অব্যয়।

অতঃপর বিশ্লেষণের সময় জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায় (অর্থাৎ ক–অংশ) এবং সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় (অর্থাৎ খ–অংশ) বিশ্লেষণ করতে হয়

পুণ্যশ্লোক রায় বাংলা বাক্যাংশের সংগঠনের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বাক্যাংশকে যেভাবে ভাগ করেছেন তা হলো—

১. অধীনস্থ বাক্যাংশ (Subordinate phrase) ;
২. অধিস্তন বাক্যাংশ (Superordinate phrase) ;
৩. সমরূপ বাক্যাংশ (Parodinate phrase) ;
৪. সমশ্রেণীভুক্ত বাক্যাংশ (Co-ordinate phrase) ;
৫. অন্তর্ভুক্ত খণ্ডবাক্য (Included clause) ;
৬. জটিল বাক্যাংশ (Complex phrase) ;

১. **অধীনস্থ বাক্যাংশ** (Subordinate phrase) : এর বহির্গঠন, অন্তর্নিহিত উপাদান, কেন্দ্র পূর্ব অংশ পরবর্তী বাক্যাংশে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত

যে কোনো প্রত্যয়সহ কেন্দ্ররূপে বিশেষ্য

ক. কেন্দ্র-পূর্বরূপে কারকহীন বিশেষ্য—

লাল ফুল, চার হাজার।

খ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে সমাপিকা ক্রিয়া—

আসছে কাল, আসছে মাসে।

গ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে স্থানবাচক বিশেষ্য—

হতে বোনা, চোখে কালি।

ঘ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য—

কাজের ছেলে, গরুর গাড়ি।

ঙ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে সম্প্রদান বাচক বিশেষ্য –

মাঠকে মাঠ, গ্রামকে গ্রাম।

চ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া—

করলে ভালো, দেখতে সুন্দরলোক।

ছ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে নেতিবাচক—

না ভালো, না যাওয়া।

যে কোনো প্রত্যয়সহ কেন্দ্ররূপে ক্রিয়া

ক. কেন্দ্র-পূর্বরূপে আপেক্ষিক—

গেলে চলে, করলে পারেন।

খ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে স্থিতিশীল—

খেতে গেছেন, নাইতে গেছেন

গ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে অসমাপিকা বা সংযোজন—

বলে ফ্যালো, চলে এসো

কেন্দ্র-পূর্বরূপে বিশেষ্য বাচক

ক. নেওয়া যায়, চাওয়া যাবে ইত্যাদি

খ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে কারকহীন বিশেষ্য—
খুব বলেছো, টেলিগ্রাম করো।

গ. কেন্দ্র পূর্বরূপে সমাপিকা ক্রিয়া –
যাবো বলেছি, যাচ্ছি জানাবো।

ঘ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে স্থানবাচক বিশেষ্য—
হাটে কাটবে, পথে বসালো।

ঙ. কেন্দ্র-পূর্বরূপে সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য—
নিজের দ্যাখ, মনের দুঃখ।

চ. কেন্দ্র–পূর্বরূপে নঞর্থক —

না আসতে, না এসেছে।

২. **অধিস্তন বাক্যাংশ** (Superordinate phrase) : এর সংগঠন অন্তর্নিহিত আদ্য–উপাদান কেন্দ্র পরবর্তী অংশের পরবর্তী বাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক. কেন্দ্র পরবর্তী অংশরূপে জোর দেয়া —

খুবই, নিশ্চয়ই

খ. কেন্দ্র পরবর্তী সমঞ্জস্য বিধায়ক —

এসেছে তো, করছে তো।

গ. কেন্দ্র পরবর্তী নেতিবাচক —

ভালো না, হবে না।

ঘ. কেন্দ্র পরবর্তী অভিনির্দেশক —

সেটা ভালো, ওটা লাল।

৩. **সমরূপ বাক্যাংশ** (Parodinate Phrase) : এর সংগঠন একই মানের দুটি কেন্দ্র দ্বারা গঠিত।

ক. জোড় — বার বার, খেতে খেতে।

খ. প্রতিধ্বনি — কাপড় চোপড়, বাসন কোসন।

গ. সমার্থক — মা–বাপ, বাঘ ভাল্লুক।

৪. **সমশ্রেণীভুক্ত বাক্যাংশ** (Co-ordinate Phrase) : এই ধরনের বাক্যাংশ দুই বা ততোধিক সমশ্রেণীর কেন্দ্র দ্বারা গঠিত —

রাম শ্যাম, লক্ষ্মী শিক্ষিত।

৫. **অন্তর্ভুক্ত খণ্ডবাক্য** (Included clause) : এটা এমনি একটি পরম্পরা , যা অন্য অবস্থায় আলাদা খণ্ডবাক্যরূপে পরিগণিত।

আপনি যাবেন জানিয়েছি -- এই জটিল বাক্যাংশটির কেন্দ্র–পূর্ব একটি খণ্ডবাক্য 'আপনি যাবেন' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬. **জটিল বাক্যাংশ** (Complex Phrases) : তিন বা ততোধিক শব্দ পরম্পরায় গঠিত এই জটিল বাক্যাংশ একটি খণ্ডবাক্যের বিকল্প হতে পারে। জটিল বাক্যাংশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—

ক. গ্রথিত সংগঠন, সমশ্রেণীভুক্ত বাক্যাংশের প্রসার দ্বারা গঠিত —

রাম শ্যাম যদু; যাবে থাকবে খাবে।

১. সারিবদ্ধ —রহিম করিম, যাবে থাকবে।

২. নির্দেশিকা — পরম্পরার প্রতিটি সদস্য সংযোজক সহ সরল বাক্যাংশ —

না যাবে, না থাকবে, না খাবে।

৩. পূর্ববর্তী — একটি সহজ পরম্পরা, কেবল শেষ উপাদানটি সংযোজক কেন্দ্র পূর্ব রূপে একটি সরল বাক্যাংশ —

যাবে থাকবে আর খাবে।

৪. পরবর্তী — একটি সহজ পরম্পরা, কেবল শেষ উপাদানটি একটি জোরালো কেন্দ্র–পরবর্তী অংশরূপে একটি সরল বাক্যাংশ —

রামের শ্যামের যদুরই।

খ. অন্তর্ভুক্ত সংগঠন, সম্প্রসারণে কেন্দ্রপূর্ব অংশে অপর একটি বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত—

নিতে যেতে খেতে।

গ. অন্তর্নিহিত সংগঠন, সম্প্রসারণে একটি কেন্দ্র অংশে অপর একটি বাক্যাংশ অন্তর্নিহিত –

যাবেও না, ঠাকে বসে বসে আছে লোকটা।

বাক্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ এখনেই সম্পূর্ণ নয়। ভাষার সচল গতির সাথে বাক্য গঠন রূপে বদলাতে বাধ্য। আধুনিক ভাষাতত্ত্বে ভাষার বর্ণনামূলক দিকের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া হয় বলে তার সামান্য পরিবর্তন ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তনের সূচনা করে। তাই আজ যার বিশ্লেষণ সঠিক, কাল তার উল্টোটিও হতে পারে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই তবু সে পরিবর্তনে সাধারণত একটি ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় বলে ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র একেবারে সাময়িক কখনোই নয়।

বাংলা পদ-বিচার

ভাষার একক বা unit বাক্য, আর বাক্যের মধ্যেকার অর্থযুক্ত অংশগুলোর নাম পদ যদিও বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভক্তি যুক্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তার সামান্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এর নাম Parts of speech প্রচলিত নিয়মে পদের বিভাগ হচ্ছে পাঁচটি—

ক. বিশেষ্য (noun) ;

খ. সর্বনাম (pronoun) ;

গ. বিশেষণ (adjective) ;

ঘ. ক্রিয়া (verb) ; এবং

ঙ. অব্যয় (Indeclinebes · conjunctions and interjections) ।

ইংরেজি ব্যাকরণের অনুসরণে এই শ্রেণিবিভাগ অনেকে সমর্থন করতে পারেন নি। আজ থেকে বহু বছর আগে, ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনি এই পদকে দুভাবে বিভক্ত করে গেছেন —

১. সুবন্ত (যে পদের সাথে সুপ্ বা কারকের বিভক্তি যুক্ত হয় ; এর মধ্যে পড়ে বিশেষ্য ; সর্বনাম ও বিশেষণ) ; এবং

২. তিঙন্ত (তিঙ অর্থাৎ কাল ভাব-বাচ্যের বিভক্তি যুক্ত হয় — এতে পড়ে সমাপিকা ক্রিয়া)। এ ছাড়াও এক ধরনের পদের সন্ধান পাণিনি পেয়েছেন, যা আসলে সুবন্তের মতো মনে হয়, কিন্তু তার কোনো রূপান্তর নেই — এর নাম নিপাত[১] (এতে পড়ছে ক্রিয়া বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়া)। পরবর্তীকালে সংস্কৃতে একটি তিঙন্ত নিপাতও স্বীকৃত হয়েছে ('অস্' ধাতুর প্রাচীন লিট্ পদ 'আস্')

ড. সুকুমার সেন বাংলার পদগুলোকে পাণিনির এই তিন রকম পদ-বিভাগের অনুসরণের পক্ষপাতি। তবে যে কোনো ভাষার এক অবস্থার এক শ্রেণীর পদ যে অন্য অবস্থায় অন্য শ্রেণীর পদে পরিণত হতে পারে, সে ব্যাপারে ড. সেন নিঃসন্দেহ প্রাচীন বাংলার – 'ইল', – 'ইব' প্রত্যয়ান্ত পদগুলো এক সময়ে সুবন্ত শ্রেণীর থাকলেও পরবর্তীকালে তা তিঙন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। আধুনিক বাংলার পদগুলোকে এভাবে সাজানো যায় —

ক. সুবন্ত পদ — বিশেষ্য, সর্বনাম

খ. তিঙন্ত পদ — বর্তমান কালের, অনুজ্ঞার এবং –'ইল' –'ইব' ; –'ইত' প্রত্যয়ান্ত যথাক্রমে অতীত, ভবিষ্যত ও ত্রিকালের পদ।

গ. নিপাত পদ— বিশেষণ এবং বাকি অন্যান্য সব পদ।

---

১ নিপাতের মৌলিক অর্থ 'এমনি আসা' অর্থাৎ যা শব্দরূপের বা ধাতুরূপের পরিবর্তনের ধারায় পড়ে না।

বাংলার পদকে আরো সূক্ষ্মভাবে বিভাগ করার নমুনাও রয়েছে।[১] তাতে এভাবে দেখানো হয়েছে :

ক. রূপগ্রহ (Inflexional) — বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বর্তমান, অনুজ্ঞা, ভূত ও ভবিষ্যতকালের ক্রিয়া।

খ. অরূপগ্রহ (Non-inflexional) —বাকি সব পদ (যার কারক–বচন অথবা কাল–পুরুষ বচন ভেদে রূপান্তর নাই)।

পদতত্ত্বের বিচারে বাংলা পদের শ্রেণিবিভাগ যেভাবে করা যায় তা হলো :

বিশেষণ– বিশেষ্য ; সর্বনাম ; ক্রিয়া ; ক্রিয়া-বিশেষণ ; কারক–বিভক্তি স্থানীয় ও প্রত্যয়বাচক শব্দ, সংযোজক বিয়োজক শব্দ ; এবং সংখ্যা শব্দ

বিশেষণ

সমজাতীয় পদার্থসমূহ থেকে যে পদ অন্য পদকে বিশেষ করে, তাকে বলা হয় বিশেষণ — সংস্কৃতে[২] বিশেষণের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি বিশেষণেও যুক্ত হবে এটাই সংস্কৃতের বিধান।

প্রাকৃতে এসে এর খানিকটা পরিবর্তন ঘটলো। এখানে বিশেষ্যের সব লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি এক থাকলো না। কারণ, প্রাকৃতে পুরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দগুলোর কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ না থাকায় এই ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হলো।

এরপর, অপভ্রংশে এসে এইসব নিয়ম পালটে গেলো আরো। সেখানে বিশেষ্য পদের বিভক্তি সর্বত্র অনুসরণ করা হয় নি ; বরং বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণ পদের লিঙ্গ স্থির করার প্রথা চালু হলো।

বাংলাতে বিশেষণ পদে বিশেষ্য পদের কারক–বিভক্তি যোগ হয় না। আধুনিক বাংলায় তো বটেই, প্রাচীন বাংলায়ও তা হতো না। তবে বিশেষণ যেখানে বিশেষ্যের কাজ করে, সেখানে বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারক–বিভক্তি যুক্ত হয়।

এখানে উদাহরণ দিচ্ছি—

সংস্কৃত : ধার্মিকঃ পুরুষঃ ; গুণিনৌ নরৌ।

প্রাকৃত : দিগ্ঘ রত্তং ; নক্খত্তমালিনী রত্তি।

অপভ্রংশ : উবা অহীণা মুই এক্ক গারী ; তরুণি ঘরিণী।

প্রাচীন বাংলা : চঞ্চল চীএ ; মহা সুহে রতি পেহাই।

আধুনিক বাংলা : অন্ধজনে দেহো আলো ; ব্যথিত চিতে নহিবা দিলে সান্ত্বনা।

বিশেষণের অতিশায়নে (Comparison of adjectives) সংস্কৃতে অতিশায়িত শব্দে বিশিষ্ট প্রত্যয় যোগ হতো (দুইয়ের মধ্যে 'তর' এবং ততোধিকের মধ্যে হলে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতো)। আরো দুটো কৃৎ প্রত্যয় ছিলো '–ঈয়স' এবং '–ইষ্ঠ'। বাংলায় '–

---

১. ড. সুকুমার সেন এর পক্ষপাতি।

২. বিশেষণের সংস্কৃত সংজ্ঞা : 'বিশিষ্যতে অনেন ইতি বিশেষণম্'

ইষ্ঠ', '–তর' এবং '–তম' বহুল ব্যবহৃত ; শুধু পার্থক্য, বাংলায় এগুলো কেবলমাত্র অতিশয়নে সীমাবদ্ধ নয়।

সংস্কৃতের অতিশায়িত প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ বাংলায় সাধারণত বিশেষণের অর্থে ব্যবহৃত — 'কাজটি গুরুতর' ; 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'।

অবশ্য 'দীনের চেয়ে চীন', 'শিলুর চেয়ে ইলু বড়' ইত্যাদি উপমায় এর অন্যবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। যা থেকে অতিশায়িত হয়, বাংলায় তাতে বিবিধ কারকের পদ অথবা অনুসর্গের ব্যবহার এখানে লক্ষ্যযোগ্য। সাধারণত দুই বস্তু বা ভাবের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে বাংলায় সংস্কৃতের মতো কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় না।

দুইয়ের বেশি বস্তু বা ভাবের মধ্যে একের অতিশয়নে প্রাতিপাদিক অথবা সম্বন্ধ পদের সঙ্গে 'মধ্যে' যোগ হয় — 'বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ সর্বোত্তম' ; 'তীর্থের মধ্যে বারানসী শ্রেষ্ঠ' আবার কখনো কখনো শুধু সম্বন্ধপদই যথেষ্ট —'ফলের সেরা আম', 'রমা সবার অধম'।

বাংলা বিশেষণের রূপ বা ব্যুৎপত্তি তিন ভাগে বিভক্ত —

১. একপদময় ;

২. যৌগিক ;

৩. বাক্যময়।

১. একপদময় বিশেষণ : এর আবার চার ভাগ ; (ক) মৌলিক ;(খ) প্রত্যয়যুক্ত ; (গ) বিভক্তিযুক্ত ; এবং (ঘ) উপসর্গযুক্ত। উদাহরণ —

ক. মৌলিক — বড়, ছোট, কম, বেশি, লম্বা ইত্যাদি।

খ. প্রত্যয়যুক্ত — ঘুমন্ত শিশু, কাঁচা পথ, পড়তি বেলা।

গ. বিভক্তি যুক্ত — সুখের পায়রা, ফুলের মধু, পথের কাঁটা।

ঘ. উপসর্গযুক্ত —বেহায়া, বে-বরাক ; গরহাজির ইত্যাদি।

২. যৌগিক বিশেষণ : সমাসবদ্ধ পদই যৌগিক বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত

যেমন— বুকভরা মধু, মনমরা মাঝি, হাতকাটা জামা ইত্যাদি।

৩. বাক্যময় বিশেষণ : সাত-রাজার-ধন , আপন-কাজে-আপনি মজে ; ঘর-জ্বালানো-পর ভোলানো ইত্যাদি।

এ ছাড়া আমাদের ভাষায় এমন বহু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ দু'ভাবেই ব্যবহারের রীতি যেগুলোর রয়েছে – বিশেষ, সাধু, পুণ্য, আশ্চর্য ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিশেষণ

বাংলা ক্রিয়া বিশেষণে বিভক্তি চিহ্ন থাকতেও পারে, নাও পারে। ক্রিয়া বিশেষণ সম্পর্কে যেসব নিয়মকানুন পাওয়া যায়, তা হলো —

১. বিভক্তিহীন পদ-প্রযুক্ত ক্রিয়া বিশেষণ – খুব ভালো ; অবশ্য যাবো ; কখন বলবো ইত্যাদি

২. ই কিংবা ইয়া যোগ ক'রে অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সহযোগে — ভালে করিয়া (ক'রে) ; কচ্‌কচিয়ে : হন হনিয়ে ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃতের অনুকরণে 'মাত্র' শব্দের সহযোগে—শুধুমাত্র : আসামাত্র ; দেখামাত্র ইত্যাদি।

৪. সংস্কৃত 'এন' জাত তৃতীয়ার 'এ' এবং সপ্তমীর 'এ'-র সহযোগে প্রাচীন বাংলায় এঁ এবং পরে আধুনিক বাংলায় এ যেমন —

প্রাচীন বাংলায় — ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
আধুনিক বাংলায় — ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বইছে।

৫. ধীপ্সায় শব্দদ্বৈত ক'রে — কাঁদতে কাঁদতে বললো ; হাসতে হাসতে খুন।

লিঙ্গ
(Gender)

বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম (উত্তম ও মধ্যম পুরুষ বাদ দিয়ে) পদে লিঙ্গভেদ অর্থাৎ পুং, স্ত্রী, ক্লীব লিঙ্গের প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় ছিলো। সর্বনামের লিঙ্গভেদ যতোখানি না প্রত্যয়সিদ্ধ ছিলো, তার বেশি ছিলো ব্যবহারসিদ্ধ। যেমন, অয়ম্ (পুং)— ইয়ম্ (স্ত্রী) —ইদম্ (ক্লীব) ইত্যাদি।

পরে সংস্কৃতে আ-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত (দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে) শব্দ স্ত্রী লিঙ্গে পরিণত হতো, আর সেই অনুসারে ব্যঞ্জনান্ত প্রাচীন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলো গ্রহণ করতো স্ত্রী প্রত্যয়। যেমন, বাচ্ > বাচা ; নিশ্ > নিশা ইত্যাদি। সংস্কৃতে 'আ' ও 'ঈ' এই দুটো স্ত্রী প্রত্যয়ের 'আ'-র প্রচলন অধিক ছিলো ; মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় এসে 'ঈ'-র প্রচলন বেড়ে গেলো ; শুধু তাই নয়, 'আ'-র প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হলো। এর প্রভাব অপভ্রষ্টে এসে পড়ায় সেখানেও 'ঈ' একমাত্র স্ত্রী প্রত্যয় হিসেবে পরিণত হলো। অপভ্রষ্টে পদান্ত আ-কার। কারে হলো পরিণত এবং প্রত্ন নব্য-আর্যে তা পূর্ববর্তী ই-কারের সাথে সন্ধি হয়ে ঈ-কারে পরিণত হলো।

সম্বন্ধপদের র-কার এবং কৃদন্ত বিশেষণের ল-কারে যে লিঙ্গ সামঞ্জস্য (concord) ছিলো স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের সাথে, তাতে এই নতুন ঈ-কারান্ত শব্দগুলো হারিয়ে গেলো, এবং নব্য-আর্য ভাষার স্ত্রীলিঙ্গ সামঞ্জস্য নিয়ে নতুন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সৃষ্টি হলো। এসব ভাষায় তাই বিশেষ্যের লিঙ্গ বিধান নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়েছে।

বাংলা ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দ সংগঠনের জন্যে যে প্রত্যয় পাওয়া যায়, তা দু'রকমের : ১. 'নী' 'ইনী' : সংস্কৃত 'আনী' ;

১. 'নী' : —পত্নী (নী)।

'ইনী' : ধনিনী (ইনী)

'আনী' : মাতুলানী (আনী) ; বরুণানী (আনী)।

২. —'ঈ' (ই) — জাতি বোঝাতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত —

বামনী-'ঈ' (ই) ; ঘুড়ী (ঈ) ইত্যাদি।

আরো একটি উপায়ে স্ত্রীবাচক শব্দের সৃষ্টি হতে পারে, তা হলো শব্দের পূর্বে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে— মাদি কুকুর, গাই গরু ইত্যাদি

বচন
(Number)

বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনটি বচনের সন্ধান পাওয়া যায়। পালি এবং প্রাকৃতে দুটি (দ্বিবচন লুপ্ত হয়ে যায়)। বাংলায় বচন দুটি — একবচন ও বহুবচন।

প্রাচীন বাংলায় একবচন ও বহুবচনের আলাদা আলাদা কারক বিভক্তি ছিলো না। এখনো আমাদের কথ্য বাংলায় তা নেই। আমাদের ভাষায় একবচনের কোনো প্রত্যয় নেই (নাম বা শব্দটি নিজেই একবচনে ব্যবহৃত হয়), বহুবচনের জন্যে শব্দের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়। অনেক সময় শব্দের আগে বা পরে সমষ্টিবাচক শব্দের ব্যবহার হয়। বাংলার একবচনকে বহুবচনে পরিবর্তিত করার কয়েকটি নিয়ম রয়েছে–

১. বিশেষ্যের আগে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসিয়ে —

যেমন — ছয় রিপু, তিন কন্যা, সাত ভাই।

২. কতো, যতো, সকল ইত্যাদি বহুবচন-বাচক বিশেষণকে শব্দের আগে ও পরে বসিয়ে —

কতো — আর কতো দিন
যতো — যতো জ্ঞানীজন
সব — 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'
সকল — 'পণ্ডিত সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে।'

৩. প্রাচীন বাংলায় প্রাণীবাচক শব্দের সাথে বহুত্ববাচক কয়েকটি শব্দের সমাস করে বহুবচন করা হতো। যেমন- সভ্য, সমাজ, লোক।

৪. আরেক ধরনের বহুবচন প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়, যাকে বলা হয় নির্ধারক বহুবচন (Selective plural)। এগুলো করা হতো, প্রথমত বিশেষণের দ্বিত্ব করে — উঁচা উঁচা পর্বত (উঁচু উঁচু পর্বত); দ্বিতীয়ত সর্বনামের দ্বিত্ব করে — জে জে আইল (যারা যারা এসেছিলো); তে তে গেলা (তারা তারা গেলো); তৃতীয়ত বিশেষ্য পদের দ্বিত্ব করে— — গঅণত গঅণত তইলা বাড়ি (গগনে গগনে তৎসংলগ্ন বাড়ি); এবং চতুর্থত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব করে - তুলা ধুণি ধুণি (তুলো ধুনে ধুনে)।

এই নিয়ম আধুনিক বাংলায় চলে এসেছে, যেমন—

বড় বড় বানরের বড় বড় ঠ্যাং (বিশেষণের দ্বিত্ব)
'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে' (বিশেষ্যের দ্বিত্ব)
যারা যারা যাবে, তারা তারা খাবে (সর্বনামের দ্বিত্ব)
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় হাদিমন (অসমাপিকা পদের দ্বিত্ব)

কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি থেকে আগত 'রা' (এর) যোগ ক'রে বাংলায় বহুবচন করার রীতি বহুল প্রচলিত। প্রাচীন বাংলায় এর প্রচলন না থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর প্রয়োগ প্রথম দেখা যায় আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি। যেমন, মনুষ্য > মানুষেরা ; পাখি > পাখিরা ; শিক্ষক > শিক্ষকেরা।

শব্দের শেষে 'গুল' (গুলো), 'গুলি' যোগ ক'রে বহুবচন সৃষ্টির প্রথা বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত এর শুরু ষোড়শ শতাব্দী (বাণগুল', বামনগুলা')। বহুবচন বোঝাবার জন্যে 'গোটা', 'গুটি' শব্দের ব্যবহারও স্বীকৃত ('বাণগোটা লুফি বাঘা চিবাইল দাঁতে')।

আরো ব্যাপকভাবে দেখা যায়, 'দি', 'দিগ' ইত্যাদি সহযোগে বাংলায় বহুবচন করার রীতি আমাদের ভাষায় প্রচলিত (বালকদিগ ; লোকদিগকে)। এর শুরু দেখা যায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। ফারসি 'দিগর' থেকে বাংলা 'দিগ' উৎপন্ন। 'দি', 'দিগ' এর সাথে কারকের যোগ হয় (বালকদিগকে ; লোকদিগের)।

এ ছাড়া যেসব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে সরাসরি বাংলায় এসেছে তাদের সাথে তৎসম বহুত্ববোধক শব্দের যোগ হয়। যেমন— সভা, সমুদয়, সমূহ, কুল, মণ্ডল, মণ্ডলী, মালা, গ্রাম, নিচয়, নিকর, দাম ইত্যাদি এর অনেকগুলোর ব্যবহার দেখা যায় সব রকম বিশেষ্যের সাথে ; আর কিছু ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত রীতি অনুসারে। যেমন, 'মালা' কেবল অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সাথেই ব্যবহৃত হয়— মেঘমালা, নক্ষত্রমালা, পণ্ডিতমালা ইত্যাদি।

কারক ও বিভক্তি
(Case & Case-termination)

বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তার নাম কারক (case)। ক্রিয়াপদ ছাড়া বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথে বাক্যের অন্যান্য পদের সাথেও পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা কারক নয়। 'মোমের আলো ভালোবাসি' কিংবা 'নাছিমের বোন ভালো মেয়ে' বাক্যে 'মোমের আলো' অর্থাৎ 'আলোর সাথে 'মোমের' এবং 'নাছিমের বোন' এখানে 'বোনের সাথে নাছিমের সম্পর্ক রয়েছে, ক্রিয়ার সাথে নয়। এগুলোর নাম সম্বন্ধপদ।

বিভক্তি (case termination) হচ্ছে কারকসূচক ধ্বনিসমষ্টি বা পদাংশ। বিভক্তির বিভিন্ন চিহ্ন রয়েছে, তার শ্রেণী সংখ্যা সাত— প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। কোনো বিভক্তি কোনো শব্দে না থাকলে বাক্যে তাকে বিভক্তিহীন বলে ধরে নেয়া হয় এবং সেখানে এক ধরনের বিভক্তির কল্পনা করা হয়, তার নাম শূন্য বিভক্তি। এইসব বিভক্তির প্রয়োগ অনুযায়ী সংস্কৃতে সাতটি কারকের সন্ধান পাওয়া যায় — কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং সম্বন্ধ (পদ)। এই ক্রমানুসারে বিভক্তির যোজনা হয় প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সম্বন্ধপদকে পালিতে বলে 'ছট্ঠি' এবং সংখোধনের নাম 'আলপনং'।

পালি এবং প্রাকৃতে সংস্কৃতের অনুসরণ দেখা যায় পথমা, দুতিয়া, ততিয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, সত্তমী বিভক্তি যোগে এখানে কারক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

বাংলায়ও এই নিয়ম প্রচলিত। কিন্তু সংস্কৃত শব্দরূপ এবং বিভক্তি চিহ্ন পুরোপুরি এক না হওয়ায় বাংলার কারক সংখ্যা কমে আসে। প্রাচীন বাংলায় ছটি কারক পাওয়া যায়— কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলায় কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি অভিন্ন হওয়ায় এবং রূপগত পার্থক্য না থাকায় এর পৃথক প্রয়োগ অর্থহীন। আর বিভক্তি প্রয়োগের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, কর্তা, করণ ও অধিকরণের রূপ মোটামুটি এক রকম। এ কারণে আধুনিক বিশ্লেষণে বাংলার কারক সংখ্যা চার — কর্তা, কর্ম, করণ–অধিকরণ, সম্বন্ধপদ।

আর বাংলা বিভক্তিগুলোকে ভাগ করা যায় দু'ভাবে—

ক. খাঁটি বিভক্তি — পদের অংশ হিসেবে এদের অস্তিত্ব ;

খ. পদ–বিভক্তি (post-positional words) —

ভাষায় এদের আলাদা অস্তিত্ব আছে, তবু বিশেষ্যের পরে যোগ হয়ে তাকে নির্দিষ্ট কারকের রূপ দিতে সাহায্য করে।

ক. খাঁটি বিভক্তি (যথার্থ বিভক্তি বা বাংলায় সুপ্) : এই বিভক্তি তিন রকম

(ক) কর্তৃকারকে—শূন্য -'এ' (-'য়ে', -'য়'), -'তে (-'এতে') ;

(খ) কর্মকারকে ও সম্প্রদানে –'এ' (–য়ে', —'য়'), –'কে', '–রে' (–এরে) ;

(গ) করণ–অধিকরণে 'এ' (–'য়ে',–'য়'), –'তে' (–'এতে') সম্বন্ধে –'র', – 'এর'।

শব্দরূপ (ড. সুকুমার সেন অনুসরণে)

১. প্রাচীন বাংলায় বচন নির্বিশেষে

কর্তা : (সাধারণ) গরাহক, কাল (– কালা), সহব, নাহি (= নাভি), ভুসুকু, কাহ্ন।

পুং আ–কারান্ত — করিআ (=করী), হরিণ, সীসা।

স্ত্রী ঈ–(ই) কারান্ত — জোইনী, মালী (=মালা)

অপভ্রষ্ট–আগত, ও –কারান্ত –ভান্তে (–ভ্রান্ত), বোড়ো (= বেড়া)।

নির্দেশক শব্দযুক্ত — পবড়ি–খাণ্ডি (=নাওখানি)

কর্ম : মুখ্য ও গৌণ–সম্প্রদায় — রূপা, হরিণা, মুমা।

করণ : – ঐতে' –এঁ', 'এ'–বিভক্তিযুক্ত –কালে, 'আলিএঁ', নাবে (=নৌকায়)

'–'তে', '–এঁতে' বিভক্তিযুক্ত — তরঙ্গতে, বিআরেঁতে (=বিচারে)

গৌণকর্ম –সম্প্রদান : –'এ' '–এঁ' বিভক্তিযুক্ত — নিবণে, মাংসেঁ, সাঙ্গে।

—'রে', '–রেঁ' বিভক্তিযুক্ত – রমানেরে, করিণিরেঁ

–'কে', –'কুঁ'– বিভক্তিযুক্ত — নাশক, পথক, দমকুঁ।

অপাদান : –'এ', –'এঁ' বিভক্তিযুক্ত — কুলে, কুলে, জামে।

অপভ্রষ্টের :– 'হুঁ' –'হু', বিভক্তিযুক্ত –হেপহুঁ, রঅণ্ডু।

অধিকরণ :– 'ত' বিভক্তিযুক্ত — হাঁড়ীত, ডোম্বিত, বাটত।

'–এঁ' বিভক্তিযুক্ত —ঘরেঁ, গলেঁ, হিত্রেঁ।

'–'হি' বিভক্তিযুক্ত — হিআহি, সংবোহি

সম্বন্ধপদ : সাধারণ — মুসার, ডোম্বীএর, হরিণর

স্ত্রী লিং বিণ.— চন্দেরি, হড়েরি।

প্রাচীন পদ — সমুদ্রা (< সমুদ্রস্য), সঅলা (< সকলস্য)।

অপভ্রষ্টের '–হ' বিভক্তিযুক্ত — খনহ, পাতহ।

–'ক' বিভক্তিযুক্ত — ঠাকুরক।

২. আদি–মধ্যবাংলার বচন নির্বিশেষে

কর্তা ও কর্ম : কহ্নি, রাহী, রাখেয়াল।

কর্ম : 'এঁ', –'এ' বিভক্তিযুক্ত —কংসেঁ, কংসে, আনে।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদান : –'কে', –'কেঁ' বিভক্তিযুক্ত —আগক, কংসাকে, ঘরকে

'–রে', '–এরে', '–এরৈ' বিভক্তিযুক্ত —কংসেরে, জীবারে, কহ্নাঞিরে।

'–এ' বিভক্তিযুক্ত —বিকে।

করণ : দেবেঁ, মসেঁ কংসে।

অপাদান : '—এ', 'ত, '–তে' বিভক্তিযুক্ত –জলতে, সেজাত, মুখে।

অধিকরণ : ঘাটে, বাটে, ঘরে, মাথাএ, বাটিতে।

সম্বন্ধপদ : কাহ্নের, যমুনার, দেবের

'–কের' বিভক্তিযুক্ত —নদীকের, লক্ষ্মকের

–'ক' বিভক্তিযুক্ত — যমুনাক।

৩. আদি–মধ্যবাংলা বহুবচন

কর্তা : –'রা', প্রত্যয়যুক্ত — রাজারা, গোষ্ঠীরা।

বহুত্ববোধক শব্দ প্রত্যয়ের মতো যোগ করে—

দেবগণ, বাদ্যগণ, গোপীজন, সখীজন।

৪. অন্ত–মধ্যবাংলায় শব্দরূপ মোটামুটি আদি–মধ্যযুগের মতোই ব্যতিক্রম হচ্ছে--

–'ক' (কর্ম–সম্প্রদান) ও '–ত' (অধিকরণ) সাধারণত উপভাষায় আবদ্ধ হয়ে পড়লে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় অবলুপ্ত এবং সাহিত্যের ভাষায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে।

করণের –'এ' বিভক্তির অনুনাসিক অংশ লুপ্ত।

কর্তার বহুবচনে –'রা' বিভক্তির প্রচলন হয়। সম্বন্ধের বহুবচনে ফারসি 'দিগর'–জাত 'দিগের', –'দের' চালু হয়।

৫. আধুনিক বাংলায় কর্তা ও মুখ্যকর্ম ছাড়া কারকে (প্রধানত সম্বন্ধপদে) '– দিগের', –'দের' বিভক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং এ থেকে'–'দি', 'দে' তির্যক কারকের প্রত্যয়রূপে প্রচলিত হয় যেমন, আমাদিগকে (গৌণকর্ম) ১ আমাদের (সম্বন্ধপদ)।

গৌণকর্মে –'এ' বিভক্তির মুখ্য কর্মে ব্যবহার আধুনিক বাংলায় শব্দরূপের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

উপসর্গ
(Preposition)

আমাদের ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়বাচক পদ বা পদাংশ আমরা পাই, যা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না, বরং অন্য পদ বা পদাংশের আগে সমাসবদ্ধভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে (১) নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে, কিংবা (২) শব্দার্থের সম্পূর্ণতা সাধন বা পদকে সম্প্রসারণ করে, অথবা (৩) পদের অর্থ সংকোচ বা পরিবর্তিত করে, এর নাম উপসর্গ বা Preposition. যেমন, 'পরি' উপসর্গের সাহায্যে পরিশোধ, পরিশেষে ইত্যাদি পদ গঠিত হতে পারে; অথবা বাংলা উপসর্গ 'অ' দিয়ে হতে পারে অভাব, অপয়া, অজানা ইত্যাদি।

পালিতে অব্যয়ের দুটি ভাগ — উপসর্গ 'গ' এবং অন্যটি নিপাত। প্রাচীন বাংলায় তদ্ভব উপসর্গ 'বিণ' এবং 'মাঝ' এই দুইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের ভাষায় প্রচলিত উপসর্গগুলোকে আমরা মোট তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি : ১. তৎসম উপসর্গ; ২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ; এবং ৩. বিদেশী উপসর্গ।

১. **তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ :** মোট সংখ্যা কুড়িটি।

প্র : প্রভাত, প্রভাব, প্রতাপ, প্রবেশ, প্রসার।
পরা : পরাভব, পরাজয়, পরায়ণ, পরাকাষ্ঠা।
অপ : অপমান, অপব্যয়, অপসারণ, অপমৃত্যু, অপবাদ।
সম : সম্মুখ, সমাগত, সম্পূর্ণ, সমাদর, সমৃদ্ধ।
নি : নিবৃত্তি, নিপাত, নিবারণ, নিশ্চয়।
অনু : অনুক্ত, অনুগামী, অনুবাদ, অনুক্ষণ, অনুকূল।
অব : অবগত, অবমাননা, অবরোধ, অবসান।
নির : নিরক্ষর, নির্ভর, নির্ণয়, নির্গত, নির্ধারণ।
দুর : দুর্নাম, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্মূল্য।
বি : বিবর্ণ, বিফল, বিহার, বিকার, বিপর্যয়।
অধি : অধিকার, অধিপতি, অধিষ্ঠান, অধিবাসী, অধিরোহণ।
সু : সুকণ্ঠ, সুনীল, সুগম, সুলভ, সুকঠিন।
উৎ : উৎসুক, উত্তাল, উৎক্ষিপ্ত, উৎপাদন, উত্তপ্ত।
পরি : পরীক্ষা, পরিভ্রমণ, পরিতোষ, পরিসীমা, পরিশ্রান্ত
প্রতি : প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিমাস, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিষ্ঠান।
অতি : অতিকায়, অতিবৃষ্টি, অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
অপি : অপিচ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হতো, মানে—যদিও)।
অভি : অভিশাপ, অভিসার, অভিনয়, অভিষেক, অভিবাদন।
উপ : উপকণ্ঠ, উপবন, উপদ্বীপ, উপহার, উপকূল।
আ : আকণ্ঠ, আসমুদ্র, আভাস, আরম্ভ।

২ **খাঁটি বাংলা উপসর্গ : বাংলার খাঁটি উপসর্গের সংখ্যা একুশটি।**

অ : অবেলা, অঘোরে, অকেজো, অচেনা, অসময়।
অঘা : অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ : অজপুকুর, অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ।
অনা : অনাচার, অনাসৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
ইতি : ইতিকথা, ইতিহাস, ইতিপূর্বে, ইতিকর্তব্য।
উন (উনা) : উনপাঁজরে, উনবর্ষা।
কদ : কদাকার, কদবেল, কদর্য।
কু : কুকথা, কুঅভ্যাস, কুসঙ্গ, কুশল, কুআচার।
আ : আগাছা, আকাঠা, আধোয়া, আলুনা, আকাঁড়া।
আড় : আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়কোলা, আড়কাঠি, আড়পাগল
আন্ (অন) : আনমনা, অনচান, আনকোরা, আনসেলাই।
আব : আবছায়া, আবডাল।
পাতি : পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল।
নি : নিরেট, নির্ভেজাল, নিলজ্জ, নিখুঁত, নিখোঁজ।
বি : বিফল, বিভূঁই, বিজন্মা।
ভর : ভরপুর, ভরসাঁঝ, ভরপেট
রাম : রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা।
স : সঠিক, সলজ্জ, সরব।
সা : সাজোয়ান, সামরিচ, সাজির।
সু : সুদিন, সুখবর, সুনাম, সুনজর, সুসময়
হা : হাভাত, হাঘরে, হাপিতেশ

৩. **বিদেশী উপসর্গ :** আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত উপসর্গের ব্যবহার বাংলায় প্রচলিত।

(ক) আরবি থেকে আগত :

আম (عام) : আমদরবার, আমমোক্তার।
লা (لا) : লাচার, লাওয়ারিস, লাজওয়াব, লাখারেজ।
গর (غير) : গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
খাস (خاص) : খাসমহল, খাসকামরা, খাসদখল।
বাজে (بعض) : বাজে কথা, বাজে খরচ, বাজে জমা।

(খ) ফারসি থেকে আগত

ফি (فى) : ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাসে।
না (نا) : নামঞ্জুর, নালায়েক, নাছোড়বান্দা।
দর (در) : দরদালান, দরপাট্টা, দরকাচা।
কার (كار) : কারবার, কারসাজি, কারখানা।

নিম (نیم) : নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
ব, বা (بے، با) : বনাম, বকলম, বা-মাল, বমাল।
কম (کم) : কমজোর কমবখ্‌ত, কমঅক্কেল
বর (بر) : বরদাশ্‌ত, বরখেলাপ, বরখাস্ত।
বে (بے) : বেআদব, বেকসুর, বেকার, বেতার।
বদ (بد) : বদজাত, বদহাল, বদমেজাজ

গ. ইংরেজি থেকে আগত :

সাব (Sub) : সাবজজ, সাব-অফিস, সাব-ইন্সপেক্টর।
হাফ (Half) : হাফনেতা, হাফহাতা, হাফটিকেট।
ফুল (Full) : ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলসার্ট।
হেড (Head) : হেড অফিস, হেডমাস্টার, হেডসাহেব, হেডপণ্ডিত।

ঘ. হিন্দি থেকে আগত :

হর ( ) : হররোজ, হর-মাহিনা, হরকরা, হর-কিস্মি।

কারকবাচক অনুসর্গ
(Post Position)

আমাদের ভাষায় দেখা যায়, কতকগুলো শব্দ বা পদ অন্য কোনো শব্দ বা পদের পরে বসে আগের পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্টতর করে, তাকে বলে অনুসর্গ বা **Post position.** একে আরো নানা নামে চিহ্নিত করার চেষ্টাও করা হয়েছে—পরসর্গ, সম্বন্ধীয় বা কর্মপ্রবচনীয়। কর্তা ও মুখ্য কর্মের পরে ছাড়া অন্য সব কারকেই বিবিধ অর্থে এর ব্যবহার দেখা যায়। এগুলো কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য পদের পরে শব্দ-বিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় অনেক অনুসর্গের সন্ধান পাওয়া যায় — প্রতি, বিনা (বিহনে, বিনে), সহ, উপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন (বই, ব্যতীত), জন্যে (জন্য), পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, পানে, তরে, নামে, মত (মতো), নিকট, অধিক, পক্ষে, মাঝে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, সাথে, থেকে, চেয়ে, হইতে (হতে), পাছে, ভিতরে ইত্যাদি। আরো কয়েকটি প্রাচীন অনুসর্গের খবর পাওয়া যায় (কার, কের, কর) সেগুলো বিভক্তি হিসেবেই পরিগণিত হয়। এগুলো প্রায়ই সম্বন্ধপদের পরে বসে।

'রাজের আগে কবির গোহারী— মধ্যবাংলায় সম্বন্ধপদের পরে অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষণীয়।

'গোঠে হৈতে আসি' আমি এখানে অধিকরণ কারকে অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, তবে এর প্রচলন খুব বেশি নেই।

অনুসর্গ দুরকম—

১. নাম অনুসর্গ (বিশেষ্য ও বিশেষণ) বা Nominal post-position.

২. অসমাপিকা অনুসর্গ বা participal post-position.

১. নাম অনুসর্গ : এর তিন ভাগ—তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী

(ক) তৎসম অনুসর্গ : (এদের প্রধান)

অপেক্ষা—রাত্রি অপেক্ষা দিবা উত্তম।

অর্থ—'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গড়ই।'

কারণ—শীতের কারণে আমি যেতে পারি নি।

গোচর—এ যেন রাজার গোচরে না যায়।

প্রতি—কার প্রতি কর অনুরাগ।

নিকট—তোমার নিকটে দয়া, অরণ্যে রোদন আর কি।

মুখ—সাগরমুখে গিয়ে থামবে

সকাশ—রাধিকা সকাশে আসে বনমালী।
সমীপ—কানু সমীপে এলে আর ভয় নাই।
সহিত—'কানুর সহিত করিব পীরিতি।'
সঙ্গ—'ডোম্বী এর সঙ্গে জো রই রত্ত।'
সমভিব্যাহার—পত্নী সমভিব্যাহারে সে যে যায় মথুরায়।

(খ) তদ্ভব অনুসর্গ : (এদের প্রধান)
অগ্র > আগ : 'রাজার আগে করিব গোহারী।'
অন্তর > দ্বীপের অন্তরে যাবো চলে।
কক্ষ > কাছ : ওর কাছে কি আছে চাহিবার।
কার্য > কাজ : 'কি কাজ তাহার সাথে।'
পশ্চাৎ > পাছ : ওর পাছে ঘুরে কি লাভ।
পার্শ্ব > পাশ : রমার পাশে আর যাবো না ভুলে।
বর্গ > বাগ : চেয়ে থেকে কি লাভ জোছনার বাগে
মধ্য > মাঝ : শতেক তারার মাঝে তুমি দিশাহারা
সম : 'হালো ডোম্বী তোএ সম করিব মোঁ সাঙ্গ।'
স্থান > থান : রেখে আস ঐ মন ঠাকুরের থানে।
ঠাঁই > তুমি যাও কার ঠাঁই।
হস্ত > হাত : তোর হাতে শামীমের এ অবস্থা হবে, ভাবি নি।

(গ) বিদেশী অনুসর্গ : (বহুল প্রচলিতগুলো হচ্ছে)
বাদ : বহুদিন বাদে তোমাকে পেলাম।
বদল : 'দেহের বদলে দেহ, মনের বদলে দেবো মন।'
বরাবর : রাজার বরাবরে গিয়ে নালিশ করো।
হুজুর : হুজুরে না পারে তো পারবো আমি।

২. অসমাপিকা অনুসর্গ : এর প্রধান হচ্ছে :
√ কর্ > করি', করে : ভালো করে বলে দাও।
√ গম > গই : 'খররবি-কিরণ-সন্তাপে রে গগন-গঙ্গা গই পইঠা।'
√ চাহ্ > চেয়ে, চাইতে : 'সব চেয়ে যে অল্পে ছিলো খুশী।'
√ থাক্ > থেকে : সব থেকে ভালো লুবনা।
√ দা > দিয়া, দিয়ে : তাকে দিয়ে আমি ভরসা পাই না।
√ ভূ > হতে, হইতে : আমা হতে হবে না গান, হবে না।
√ লহ্ > লইয়া, লই, নিয়ে, নিয়া : 'বিলসন্তি লইআ সুণ নেহেলী।'

সর্বনাম
(Pronoun)

নাম বা বিশেষ্যের পরিবর্তে যে সব পদ বসে তাকে বলে সর্বনাম বা **Pronoun** এর দু ভাগ—

১. পুরুষবাচক (Personal) এবং
২. নির্দেশক (Demonstrative)।

লিঙ্গ অনুসারে বাংলায় সর্বনামের রূপভেদ হয় না। এর শব্দরূপ বিশেষ্যের মতোই — বিভক্তি চিহ্নের ব্যাপারেও বিশেষ্যের সাথে অভিন্ন বাংলা সর্বনামের বিশেষত্ব অন্যদিকে — ক. কর্তৃকারকের বিভক্তিহীন রূপ (Nominative form) ; খ. বিভক্তিযুক্ত রূপ (Base form) বা তির্যকরূপ (Olique form) কিংবা প্রাতিপাদিক রূপ (Stem form) এই দ্বিতীয় রূপটিতে বিভক্তির যোগ হতে পারে।

১. পুরুষবাচক সর্বনাম (Personal Pronouns) :

এ জাতীয় সর্বনাম সংস্কৃতে দুটি— 'অস্মদ্' (উত্তম পুরুষে) এবং 'যুষ্মদ্' (মধ্যম পুরুষে)। এগুলো বিশেষণও নয়, এর কোনো লিঙ্গভেদও নাই। বাংলায় অবশ্য কোনো সর্বনামেরই লিঙ্গভেদ নাই, তবে উত্তম পুরুষ বাদ দিলে অন্য সর্বনামের দু'টো ক'রে রূপ রয়েছে সাধারণ ও সম্ভ্রম অর্থে।

পুরুষবাচক সর্বনামের দুটি রূপ — উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম (First Personal pronoun) ও মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম (Second Personal Pronoun)।

ক. উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম : সংস্কৃত 'অস্মদ্' এর প্রাতিপাদিক তিনটি — 'ম', 'মো', ও 'আমা'।

সংস্কৃত অহং+ক (স্বার্থে) = অহকং > মাগধী প্রাকৃতে অহকম্ > হকম > হকং > অপভ্রংশে হঁউ > প্রাচীন বাংলায় হঁউ কিংবা হঁউ > মধ্য বাংলায় হাঁউ বা হঁউ > হোঁ = আধুনিক বাংলায় তা অবলুপ্ত।

সংস্কৃত অস্মদ্ তৃতীয়ার বহুবচনে এর রূপ অস্মাভিঃ > অম্মাভিঃ > প্রাকৃতে অম্হাহি> অপভ্রংশে অম্হহি > প্রাচীন বাংলায় অম্হে, অহ্মে, আম্হে, আহ্মে > মধ্য বাংলায় আম্হে, আম্হি এবং আমি> আধুনিক বাংলায় আমি বৈদিক এর আদি ধরলে অস্মদ্-এর চতুর্থী সপ্তমী অস্মে > অম্মে > অম্হে > আম্হে > আহ্মি > আহ্মে > আমি। মূলে বহুবচন থাকলেও 'আমি' বাংলায় একবচন।

অস্মদ্-এর তৃতীয়ার একবচন 'ময়া'> মুই এসেছে বাংলায় ক্রম হচ্ছে ময়া > প্রাকৃতে মএ > অপভ্রংশে মই, মুই > প্রাচীন বাংলায় ম, মই > মধ্য বাংলায় মুঞি, মোঞি > আধুনিক বাংলায় মুই।

অস্মদ্-এর ষষ্ঠীর একবচনের রূপ মম > বাংলায় 'মো' এসেছে। ক্রম হচ্ছে, মম> পালিতে মম, মমং, মজ্ঝং, মে > প্রাকৃতে ম, মম, অম্হং > অপভ্রংশে মঞো > প্রাচীন বাংলায় মো > মধ্য বাংলায় মো। আধুনিক বাংলায় এই 'মো'র কোনো ব্যবহার নেই।

সংস্কৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে অস্মদ্ > অস্মাকম্। এ থেকে পালি-প্রাকৃতে অংহাকং > অংহাণ > অপভ্রংশে অংহাকং এবং অম্হাঅ > প্রাচীন বাংলায় অম্হা > মধ্য বাংলায় আম্মা > আধুনিক বাংলায় আমরা।

খ. মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম : সংস্কৃত 'যুস্মদ্' বাংলা প্রাতিপাদিক দুটি — 'তো' এবং 'তোমা'।

সংস্কৃত কর্তৃকারকের ত্বম্ > বাংলায় তু
সংস্কৃত কর্মকারকের ত্বাম্ > বাংলায় তোমাকে
সংস্কৃত করণকারকের ত্বয়া >বাংলায় তুই
সংস্কৃত সম্বন্ধপদের তুভ্যম, তব > তোর

বিস্তারিত ক্রম বিবর্তন —

সং. ত্বম্ > পালি তং, তুবং > প্রা. তং, তুবং, তুমং > অপ. তুঅং > প্রা. বাং. তু, তো > ম. বাং. আদি স্তরে তো, তোঁ > অন্ত্য-মধ্য-বাং. তু, তো, তুই, তুঞি> আধুনিক বাংলায় তুই, তু।

সং. ত্বম্ > পা. তং, তুবং > প্রা. তুং, তুবং, তুএ, তুমে > অপ. তুঅং, তুএ, তুমে >প্রা. বাং. তঁই, তে > আ. ম. বাং. তোঞে, তোএ, তোঞি, তুঞি > ম. বাং. অ. তুঁত্ত, তোক্ > আধুনিক বাংলায় তোমাকে, তোকে।

সং. ত্বয়া > পা. তয়া. > প্রা. তই, তে, তুমএ > অপ. তই, তেএ > প্রা. বাং. তই, তোএ > অ. ম. বাং.তুঞি. আধুনিক বাংলায় তুই (তুচ্ছার্থে)।

সংস্কৃতের চতুর্থী তুভ্যম্ > পা. তব তুজ্ঝং > প্রা. তুং, তুবং, তুজ্ঝং > অপ. তুজ্ঝং > ব্রজবুলিতে তুঝ আর প্রাচীন বাংলায় তুঁহু — ম. বাং. তুঁহু — এর প্রাতিপাদিক তোহ, বিভক্তি যুক্ত হয়ে তোহর, তেহোরি, তোহার, তোহাঁক, তোহারে > আধুনিক বাংলায় তোর, তোরে ও তোক্ (কথ্য বাংলায়)।

সংস্কৃতের ষষ্ঠীর তব > প্রা. তো > অপ. তো > প্রা. বাং. তো > ম. বাং. তো (প্রথমার একবচনে) > প্রাতিপাদিক হয়ে বিভক্তিযুক্ত হওয়ায় তোক, তোকে, তোরে এবং ষষ্ঠীর তোর, তোক, এবং সপ্তমীর তোত, তোতে পরিণত।

সম্ভ্রমাত্মক 'আপনি' সম্পর্কে নানা মুনীর নানা মত। অনেকের মত, সংস্কৃত আত্মন > মা. প্রা. অত্ত, পরে অৎপা > অপ. আপ্পা > বাং. আপ > ষষ্ঠীর বহুবচনের 'ন' সম্ভ্রমার্থে যোগ হয়ে 'আপন'. এরপর সাদৃশ্যগত কারণে তিনি হিনি ইত্যাদির সাদৃশ্যে আপনি (আপন+ই) হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই 'আপনি' শব্দের প্রচলন শুরু হয়।

'তুই'-এর ব্যবহার দেখা যায়, স্নেহের সম্পর্কের কারণে, তুচ্ছার্থে কিংবা অনাদর প্রকাশ কল্পে। অনেক সময় অতিরিক্ত নৈকট্য কল্পনায় 'তুই'-এর ব্যবহার হয়। যেমন, হে আল্লাহ, তুই আমাকে ক্ষমা কর।

ঘনিষ্ঠতা প্রকাশে, বয়সে ছোটদের সাথে কথাবার্তায় 'তুমি'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সম্মান, গৌরব এবং সৌজন্যবোধ সম্বোধনে ভদ্রসমাজে 'আপনি'র প্রচলন স্বীকৃত।

২. **নির্দেশক সর্বনাম** (Demonstrative Pronouns) :

আমাদের ভাষায় এই জাতীয় পাচ রকম নির্দেশক সর্বনাম রয়েছে—

১. সাধারণ নির্দেশক (General Demonstrative) ;

২. নিকট নির্দেশক (Near Demonstrative) ;

৩. দূর নির্দেশক (Far Demonstrative) ;

৪. সম্বন্ধ নির্দেশক (Relative pronoun) ;

৫. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক নির্দেশক (Indefinite & Interrogative Pronoun) ।

লিঙ্গভেদে এর ভাগ তিনটি

১. পুরুষ মনুষ্যবাচক,

২. স্ত্রী মনুষ্যবাচক, ও

৩. অমনুষ্যবাচক ক্লীব।

মনুষ্যবাচক নির্দেশক সর্বনাম পদের ভাগ দুটি— সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক।

১. সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম (General Demonstrative Pronoun) ; সে, তা, তাহা এবং এগুলোর সম্ভ্রমবাচক তিনি, তাঁহা ইত্যাদি বাংলায় সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

সং. সঃ > প্রা. সো, সে > অপ. সু, সউ > বাং. সে, মধ্য বাংলায় সেহ, সে থেকে মধ্য বাংলায় নির্দেশক বহুবচন সেইগুলি, সেগুলো।

সং. তস্য, তাস > প্রা. তাহ > অপ. তহ > বাং. তা, তহ — অমনুষ্যবাচক কর্তা এবং কর্ম অর্থে প্রযুক্ত। তা-কে এবং তাহা-কে প্রাতিপাদিক হিসেবে বিভক্তিযুক্ত ক'রে তাকে, তাক, তা'র, তারে, তাতে, তায়, তাহার, তাহাকে ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহার করা হয়।

সং. 'তেষাম্', 'তাসাম' >তনাম্, তীনাম্ > প্রা. তেণহং, তিণহং, তিনহং > ম. বাং. তেণহং, তিণহং > আধুনিক বাংলায় তিনি।

প্রা. তেণহং, তিণহং বাংলায় প্রাতিপাদিক হয়ে তাঁ। তাতে বিভক্তিযোগ ক'রে তাঁহা, তাঁহাকে, তাঁহার, তাঁহাতে ইত্যাদি।

২. নিকট নির্দেশক বিশেষণ (Near demonstrative Pronoun) : বাংলায় এ ধরনের বিশেষণ হচ্ছে প্রাতিপাদিক হিসেবে এ, এহা (ই, ইহা), আর সম্ভ্রমাত্মক হিসেবে ঐ, ঐহা (ঈ, ইহা) । এগুলোর ব্যুৎপত্তি হলো—

সং. এষঃ > প্র. এসো, এস, এসে > অপ. ও > প্রা. বাং. এহু, এহ > ম. বাং. এহ (ইহ), এহা (ইহ) > আধুনিক বাংলায় এ, ইহা।

সং. এষাম > প্রা. এণহং > অপ. এন ইন > ম. বাং. এনা, ইহি, এহ > আধুনিক বাংলায় ইনি, ইহ, ঐ। এদের ইহ এবং ঐতে বিভক্তি যোগ ক'রে ইহার, ইহাতে, ইহাকে, এবং ঐর, ঐতে, ঐকে ইত্যাদি।

৩. দূর নির্দেশক বিশেষণ (Far Demonstrative Pronoun) : বাংলা ভাষায় দূর নির্দেশক বিশেষণগুলো প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক ক্লীবলিঙ্গ এই দুভাবে ভাগ করা যায়। প্রাণীবাচক আবার দু'রকমের — সাধারণ ও সম্ভ্রমাত্মক। উদাহরণ —

ক. প্রাণীবাচক —

১. সাধারণ — ও, ওই, উহারা, ওরা, উহা।

২. সম্ভ্রমাত্মক — উনি, ওঁরা।

খ. অপ্রাণীবাচক ক্লীবলিঙ্গ—উহা, ওই (অই, ঐ), ওটি, ওটা, এখানা, ওখানি।

বিভক্তিযোগে এবং বিভক্তিযোগ না করেও এগুলো বাংলায় প্রচলিত।

এগুলোর ব্যুৎপত্তি —

সং. অসৌ > অপ. ও > বাং. ও।

সং. অবস্য > অপ. ওহ > বাং. ওহা, পরে উহা—এতে বিভক্তির যোগ হলে—উহার, উহাকে, উহাতে। নিকট নির্দেশক সর্বনাম 'ইনি'র সাদৃশ্যে সৃষ্ট 'উনি'।

৪. সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম (Relative Pronoun) : যে, যিনি, যাহা (যা)—এই সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনামগুলোর প্রাণীবাচক রূপ—যে, যাহারা, যাঁরা, যাহা (সম্ভ্রমাত্মকভাবে—যিনি, যাঁহা, যাঁ) ; অপ্রাণীবাচক ক্লীবলিঙ্গের রূপ—যাহা, যা, যেটা,যেটি।

এদের ব্যুৎপত্তি—

যে = সং. সং > প্রা. জো, জএ > অপ. জু, জি, জ > প্রা. বাং. জে > আধুনিক বাংলায় যে।

যিনি= সং. যেষম্ > প্রা. জেনহং > বাং. যিনি, যাঁ ; বিভক্তি সহযোগে যাঁকে, যাঁর, যাঁতে।

যাহা=সং. যস্য > প্রা. জাহ > অপ. জাহ > বাং. যাহা।

বিভক্তি সহযোগে যাহাকে, যাহাতে, যাহার এর কথ্যরূপ—যাকে, যার, যাতে।

৫. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক সর্বনাম (Indefinite & Interrogative Pronoun) : কে (কেহ), কেউ, কিছু (অপ্রাণীবাচক) এবং প্রশ্নাত্মক কে, কি ইত্যাদি।

ব্যুৎপত্তি —

কে– সং. কঃ > প্রা. কে, কো > অপ. কে, কি, কএ (কই) > প্রা. বাং, কো কে > আধুনিক বাংলায় কে।

কেউ= সং. কিম্ > প্রা. ও অপ. কিং >বাংলায় কি।

বিশেষ্য বিশেষণ কিংবা অব্যয়ের কিংবা অন্য কয়েকটি সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনির্দিষ্ট নির্দেশক সর্বনাম কেহ, কেউ, কিছু অনির্দিষ্ট মিশ্র সর্বনাম গঠন করে, যেমন—যে-কেউ ; কেউ-না-কেউ, কিছু না-কিছু, যা-কিছু, যে-কোনো ইত্যাদি বাংলায় বহুল প্রচলিত।

সর্বনামের রূপ

(ড. সুকুমার সেন অনুসরণে)

উত্তম পুরুষ (একবচন)

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাংলা	আদি বাংলা	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
কর্তা	অহ(ক)ম্	হঁউ, হঁউ	হৌ (ক্রিয়া বিভক্তি)	ঔ (ক্রিয়া বিভক্তি)
	ময়া	মই, মোএ	মোই, মোঞে	মুই
	মম	(অনুক্তকর্তা) মো	মো	মো, মু
করণ	ময়া	মই	—	—
গৌণকর্ম	মম+	মকুঁ	মোক, মোকে, মোরে	মোক, মোকে মোরে
অধিকরণ	মম+		মোতে	মোতে
সম্বন্ধ	মম	মো	মোর	মোর
	মম+	মের, মোরি	মোক	মোক
	মঙমম+	মোরি	মোহোর	মোহর
		মোহোর		

মূলে এবং আদি-মধ্য বাংলায় বহুবচন, প্রাচীন বাংলায় কখনো কখনো একবচন আর অন্ত্য-মধ্য বাংলায় সাধারণত একবচন হিসেবে সর্বনামের উত্তম পুরুষের রূপ :

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাংলা	আদি মধ্য-বাংলা	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
কর্তা	অস্মাভিঃ	অ(া)মহে,	আম্মে, আম্মি	আমি
	অস্ম+	অ(া) স্তে	আম্মারা	আমরা
কর্ম	অস্মে	—	আম্মা	আমা
করণ	অস্মাভিঃ	অমহে	আম্মা	আম্মা
গৌণকর্ম	অস্মা+	—	আম্মা (ে)ক	আমা(ে) ক
			আমারে	আমারে
অপাদান	"	—	আম্মাক	"
			আম্মা (ে)ত	
অধিকরণ	অস্মাসু	—	আম্মাত	আমাত
			আম্মাতে	আমাতে
সম্বন্ধ	অস্মাসু		আম্মার	আমার

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাংলা	আদি-মধ্য বাংলা	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
কর্তা	ত্বম্ ত্বয়া তুভ্যং	তু, তো তঁই	তো, তৈঁ তোএ, তোঞে তোঞি, তুঞি	তু, তে তুঞি, তুই তুহু, তুহঁ
কর্ম	তব	তো		
করণ	ত্বয়া	তঁই, তোএ		
গৌণকর্ম	তব- তুভ্য(ং)+	তোরো তোহ'রো	তোকে, তোরে তোহাঁকে	তো(ঁ)ক, তোরে তোহাকে তোহারে
অধিকরণ	তব+		তোত, তোতে	তোতে
	তব	তো		তোর
সম্বন্ধ	তব+ তুভ্যম+	তোরা তোহোর, তোহোবি	তোর তোহোর	তোহর, তোহর

মূলে এবং আদি-মধ্য বাংলায় বহুবচন, প্রাচীন বাংলায় কখনো কখনো একবচন এবং অন্ত্য-মধ্য বাংলায় সাধারণত একবচন।

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাংলা	আদি-মধ্য বাংলা	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
কর্তা	তুষ্ম,তুষ্মাভিঃ তুষ্ম-	তুমহে	তুমি, তোহ্মে তোহারা	তুমি তোমর
গৌণকর্ম	তুষ্মা		তোহ্মাক, তোহ্মাকে তোহ্মারে	তোমাকে তোমারে
অধিকরণ	তুষ্ম-	—	তোহ্মা(ঁ)ত	তোমাতে
সম্বন্ধ	তুষ্মম্ তুষ্ম তুষ্ম	—	তোহ্মা তোহ্মার তোহ্মাক	তোমা তোমার

18375

সর্বনাম জাত ও ক্রিয়া বিশেষণ
(Pronominal Adjectives & Adverbs)

দেশ, কাল, সাদৃশ্য, পরিমাণ ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রচলন আমাদের ভাষায় খুব বেশি। এসব শব্দ হয় সর্বনাম পদের মূল অংশের সাথে কতক প্রত্যয় যোগ করে গঠিত বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের সাহচর্যে। এগুলোকে তাই বলা হয় সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ।

অ, সে, তে, তা, সেই, এ, এই, ও, ওই, হে, হো, ক, কে, কো ইত্যাদি মূল সর্বনাম পদের সাথে প্রয়োজন মতো ত (তো), মন, মত, থা, থায়, খন, খানে, খান, ক্ষণ এগুলো যোগ করায় সর্বনামের ও ক্রিয়ার নতুন নতুন বিশেষণ গঠিত হয়।

ক্রিয়া বিশেষণের কালবাচক অর্থে যেগুলোর ব্যবহার হয় তা হলো— এখন, এবে (কবিতায়), এক্ষণ, অইখন, কখন, কবে, কোনক্ষণ, কখনো, কখনও, তবে, তখন, সেইখন, যখন, যেইক্ষণ, যবে ইত্যাদি। আর স্থানবাচক অর্থে পাওয়া যায় — এখান, এখানে, এইখানে, ওখানে, ওইখানে, কোথা, কোথায়, কই, কোনখানে, কোথাও, কোনোখানে, হোথা, হোথায়, যেথা, যেথায়, যেখান, যেখানে ইত্যাদি। পরিমাণবাচক বিশেষণ হচ্ছে অতো, এতো, কত (কতো), কতক, তত (ততো), যত (যতো) ইত্যাদি। এবং সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ হলো — অমন, এমন, এমত, এইমত, তেমন, তেমত, কেমন, কেমত, কিমত, কোনো, কোনও, কোনমত, সেইমত, যেমত, যেমন ইত্যাদি।

এগুলোর ব্যুৎপত্তি সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যায় :

সং. তেমন্ত > অপ. তেম, তিম > প্রা. বাং. তিম > আধুনিক বাংলায় তেমন।

এভাবে—যেমন্ত > যেমন ; কিমন্ত > কেমন ; অমন্ত > অমন।

সং. যাদৃক্, তাদৃক্ > অপ. জাদি, তাদি > বাং. যাই, তাই।

সং. কীদৃশ > অপ. কিণহ > প্রা. বাং কেহু > আধুনিক বাংলায় কেন।

এই নিয়মে—যাদৃশ > যেহ > যেন ; তাদৃশ > তেহ > তেন।

সং. এতৎ+তক্ > অপ. এত্তত্র > বাং. এত

একই নিয়মে- কৎ +তক্ > কত ; যৎ+তক্ > যত ; অমৎ+তক > অত ইত্যাদি।

সং. এত্র > প্রা. এত্থ > অপ. এত্থ > বাংলা এথা

এইভাবে যত্র > যথা ; তত্র > তথা, কুত্র > কোথা ; অমত্র > ওথ', হোথা।

সং. যদ্বৎ > অপ. জব্ব > বাং. যবে।

এই নিয়মে—তদ্বৎ > তবে ; কদ্বৎ > কবে ; এতদ্বৎ > এবে।

সং. যৎ+ক্ষণ > অপ. জক্খন > বং. যখন।

এইভাবে—এতৎ+ক্ষণ > এখন ; তৎ+ক্ষণ > তখন ; কৎ-ক্ষণ > কখন

সং. 'যদাহি' 'তদাহি' থেকে বাংলা 'যাই', 'তাই' কালবাচক ও সংগতিদ্যোতক বিশেষণের আগমন।

যেন, তেন এই পদগুলো সংস্কৃত থেকে অবিকৃতভাবে সরাসরি চলে এসেছে। কতকগুলো সংস্কৃত সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদও বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। দলিল-দস্তাবেজ ও নিমন্ত্রণপত্রেই অবশ্য এগুলো সীমাবদ্ধ, সাহিত্যে বা কথ্য ভাষায় এর ব্যবহার অচল।

বাংলা সংখ্যা-শব্দ
(Numerals)

বাংলা সংখ্যা-শব্দগুলোর প্রায় সবই তদ্ভব। যেগুলো তা নয়, সেগুলো হয় বিদেশী, নয়তো দেশী শব্দ থেকে আগত। যেমন, 'কুড়ি' (২০) কোল ভাষা থেকে আগত ; 'হাজার' (১০০০) ফারসি থেকে

বাংলার সংখ্যা-শব্দগুলো দুভাবে ভাগ করা যায়- বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ (Cordinal Numerals) এবং ক্রমিক সংখ্যা-শব্দ (Ordinal Numerals) বাংলা সংখ্যা-শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি এখানে দেখানো হচ্ছে :

সংখ্যা		সংস্কৃত >	প্রাকৃত >	অপভ্রংশ >	প্রাচীন বাংলা >	মধ্য- বাংলা >	আধুনিক বাংলা
এক	১	ঐক্য	এক্ক, ইক্ক	এক্ক, ইক্ক	এক, এক্ক	এক	এক
দুই	২	দ্বে	দুবে	দুই	দুই		দুই, দু
তিন	৩	ত্রীনি	তিন্নি		তিণা, তিণি		তিন
চার	৪	চত্বারি	চত্তারি	চারি	চারি	চারি	চার
পাঁচ	৫	পঞ্চ	পঞ্চ		পঞ্চ		পাঁচ
ছয়	৬	ষট	ছ	ছঅ	ছ		ছয়, ছ
সাত	৭	সপ্ত	সত্ত		সাত	সাত	সাত
আট	৮	অষ্ট, অষ্টা	অট্ঠ		অট, অঠ	অট, অঠ	আঠ, আট
নয়	৯	নব	নো, নঅ				নয়, ন
দশ	১০	দশ	দশ, দহ	দস, দহ	দশ, দহ		দশ
এগার	১১	একাদশ	এগগরহ				এগার
বার	১২	দ্বাদশ	দুবাদস দুবাড়স	বারহ	বারহ	বার	বার, বারো
তের	১৩	ত্রয়োদশ ত্রেদস	তেরা তেদস (পালি)	তেরহ তেদস	তেরহ তেদস		তের, তেরো
চৌদ্দ	১৪	চতুর্দশ	চউদ্দস চৌদ্দস	চউদ্দহ		চৌদ্দ	চৌদ্দ, চোদ্দ
পনের	১৫	পঞ্চদশ	পন্নরস	পন্নরহ			পনর, পনের
ষোল	১৬	ষোড়শ	সোলস	সোলহ			ষোল

সতেরো ১৭	সপ্তদশ	সতরস				সতর, সতেরো
আঠারো ১৮	অষ্টাদশ	অটঠারস	অটঠারহ			আঠারো, আঠেরো
উনিশ ১৯	একোনবিংশ	এগুণবীস	অউনবীস			উনিশ
বিশ ২০ কুড়ি[২]	বিংশ	বীস				বিশ, কুড়ি
একুশ ২১	একাবিংশ	এক্কবীস	এক্কুবীস			একুশ
বাইশ ২২	দ্বাবিংশ	বাবীস	বাইস			বাইশ
তেইশ ২৩	ত্রয়োবিংশ	তেবীস	তেইশ			তেইশ
চব্বিশ ২৪	চতুর্বিংশ	চউবীস				চব্বিশ
পঁচিশ ২৫	পঞ্চাবিংশ	পঞ্চবীস	পচীশ			পঁচিশ
ছব্বিশ ২৬	ষড়্বিংশ	ছাববীস	ছাব্বীস			ছাব্বিশ
সাতাশ ২৭	সপ্তবিংশ	সত্তবীস	সত্তাইস	সাতাইশ		সাতাইশ, সাতাশ
আঠাশ ২৮	অষ্টাবিংশ	অটঠবীস	অটঠাইস	আঠাইশ		আঠাইশ, আঠাশ
উনত্রিশ ২৯	একোন-বিংশ	এগুনতীস	উনতীস			উনত্রিশ
ত্রিশ ৩০	ত্রিংশ	তীস	তীস, তিস			ত্রিশ, তিরিশ (কবিতায়)
একত্রিশ ৩১	একত্রিংশ	একতীস				একত্রিশ
বত্রিশ ৩২	দ্বাত্রিংশ	বত্তিস		বতিস		বত্রিশ
তেত্রিশ ৩৩	ত্রয়স্ত্রিংশ	তেত্তীস		তেতিস		তেত্রিশ
চৌত্রিশ ৩৪	চতুস্ত্রিংশ					চৌত্রিশ
পঁয়ত্রিশ ৩৫	পঞ্চত্রিংশ	পঞ্চতীস				পঁয়ত্রিশ
ছত্রিশ ৩৬	ষট্‌ত্রিংশ			ছত্তিস		ছত্রিশ
সাঁইত্রিশ ৩৭	সপ্তত্রিংশ					সাঁয়ত্রিশ,
আটত্রিশ ৩৮	অষ্টাত্রিংশ					আটত্রিশ
উনচল্লিশ ৩৯	একোন চত্বারিংশ	এগুণ-চতারীস	উনচালীস			উনচল্লিশ
চল্লিশ ৪০	চত্বারিংশ	চতারীস	চালীস			চল্লিশ

১. ইন্দো-ইউ. সেক্সম্ বা সেকস ১ইন্দো-ইরানীয় ষজ্‌দশ ১সং ষোড়শ ১প্রা. ষোলস্ অপ. সোলহ ১বাং ষোল

২. 'কোল' ভাষা থেকে বাংলার 'কুড়ি'-র আগমন

একচল্লিশ ৪১	একচত্বারিংশ	একচত্বারীস	একচালীস			একচল্লিশ
বেয়াল্লিশ ৪২	দ্বাচত্বারিংশ	দুবাত্বারীস	বাতরীস	বয়ালীস		বেয়াল্লিশ, বিয়াল্লিশ
তেতাল্লিশ ৪৩	ত্রিচত্বারিংশ				তেয়ালিশ	তেতাল্লিশ
চুয়াল্লিশ ৪৪	চতুশ্চত্বারিংশ				চয়ালিস	চুয়াল্লিশ, চোয়াল্লিশ
পঁয়তাল্লিশ ৪৫	পঞ্চত্বারিংশ				পাঁচালিস	পঁয়তাল্লিশ
ছেচল্লিশ ৪৬	ষট্চত্বারিংশ				ছইচালিশ	ছচল্লিশ ছেচল্লিশ
সাতচল্লিশ ৪৭	সপ্তচত্বারিংশ					সাতচল্লিশ
আটচল্লিশ ৪৮	অষ্টচত্বারিংশ					আটচল্লিশ
উনপঞ্চাশ ৪৯	একোন-পঞ্চাশৎ			উনঞ্চাশ	উনঞ্চাশ	উনপঞ্চাশ
পঞ্চাশ ৫০	পঞ্চাশৎ					পঞ্চাশ
একান্ন ৫১	একপঞ্চাশৎ	একান্নহ্	একান্নহ্			একান্ন
বাহান্ন ৫২	দ্বিপঞ্চাশৎ	বাবন্নাহ্				বাহান্ন, বাহ্‌ন্ন
তিপ্পান্ন ৫৩	ত্রিপঞ্চাশৎ				তেপন	তিপ্পান্ন
চুয়ান্ন ৫৪	চতুষ্পঞ্চাশৎ				চবান	চুয়ান্ন
পঞ্চান্ন ৫৫	পঞ্চপঞ্চাশৎ	পঞ্চপন্নাহ্			পাঁচন	পঞ্চান্ন
ছাপ্পান্ন ৫৬	ষট্পঞ্চাশৎ		পালি ছপ্পঞ্ঞাস-এঃস			ছপ্পান্ন
সাতান্ন ৫৭	সপ্তপঞ্চাশৎ				সাতন	সাতান্ন
আটান্ন ৫৮	অষ্টপঞ্চাশৎ				আটন	আটান্ন
উনষাট ৫৯	একোনষষ্ঠী	এগুণষট্‌ঠি	উনসট্‌ঠি			উনষাট
ষাট ৬০	ষষ্টি	সট্‌ঠি				ষাট
একষট্টি ৬১	একষষ্টি	একসট্‌ঠি				একষট্টি

বাষট্টি ৬২	দ্বাষষ্টি	বাসসটঠি			বাসাইট	বাষট্টি
তেষট্টি ৬৩	ত্রিষষ্টি					তেষট্টি
চৌষট্টি ৬৪	চতুঃষষ্টি	চউসটঠি		চউসঠি	চৌষাঠ	চৌষট্টি
পঁয়ষট্টি ৬৫	পঞ্চষষ্টি					পঁয়ষট্টি
ছেষট্টি ৬৬	ষট্‌ষষ্টি	ছসটঠি				ছেষট্টি, ছিষট্টি
সাতষট্টি ৬৭	সপ্তষষ্টি					সাতষট্টি
আটষট্টি ৬৮	অষ্টসষ্টি					আটষট্টি
উনসত্তর ৬৯	একোনসপ্ততি	উনসত্তরি				উনসত্তর
সত্তর ৭০	সপ্ততি	সত্তরি				সত্তর
একাত্তর ৭১	একসপ্ততি	একসত্তরি	একহত্তরি			একাত্তর
বাহাত্তর ৭২	দ্বাসপ্ততি				বাহাত্তরি	বাহাত্তর, বাত্তর
তেয়াত্তর ৭৩	ত্রিসপ্ততি				তেত্তের	তেয়াত্তর, তিয়াত্তর
চুয়াত্তর ৭৪	চতুঃসপ্ততি				চত্তের	চুয়াত্তর
পঁচাত্তর ৭৫	পঞ্চসপ্ততি					পঁচাত্তর
ছেয়াত্তর ৭৬	ষট্‌সপ্ততি				ছেহত্তর	ছেয়াত্তর, ছিয়াত্তর
সাতাত্তর ৭৭	সপ্তসপ্ততি	সত্তসত্তরি				সাতাত্তর
আটাত্তর ৭৮	অষ্টসপ্ততি	অটঠসত্তরি				আটাত্তর
উনআশি ৭৯	একোন-অশীতি	এগুণঅসীহ	উনঅসি			উনআশি, উনাশি
আশি ৮০	অশীতি	অসীহ	অসি			আশি
একাশি ৮১	এক অশীতি					একাশি
বিরাশি ৮২	দ্বিঅশীতি					বিরাশি
তেরাশি ৮৩	ত্রি অশীতি					তেরাশি, তিরাশি

চুরাশি ৮৪	চতুঃঅশীতি চৌ-আসি					চুরাশি
পঁচাশি ৮৫	পঞ্চঅশীতি					পঁচাশি
ছিয়াশি ৮৬	ষট্-অশীতি				ছয়াসি	ছেয়াশি, ছিয়াশি
সাতাশি ৮৭	সপ্তঅশীতি					সাতাশি
অষ্টাশি ৮৮	অষ্টঅশীতি					অষ্ট-আশি, অষ্টাশি
উননব্বই ৮৯	একোনবতি	উণনবতি				উননব্বই
নব্বই ৯০	নবতি	পউই			নই, নবৈ	নব্বই
একানব্বই ৯১	এক-নবতি					একানব্বই
বিরানব্বই ৯২	দ্বি-নবতি					বিরানব্বই
তিরানব্বই ৯৩	ত্রি-নবতি					তিরানব্বই
চুরানব্বই ৯৪	চতুঃনবতি					চুরানব্বই
পঁচানব্বই ৯৫	পঞ্চনবতি				পচানই	পচানব্বই
ছিয়ানব্বই ৯৬	ষট্-নবতি					ছিয়ানব্বই
সাতানব্বই ৯৭	সপ্ত নবতি					সাতানব্বই
আটানব্বই ৯৮	অষ্ট-নবতি					আটানব্বই
নিরানব্বই ৯৯	নব-নবতি				নিরনই	নিরানব্বই
একশো ১০০	শতম্	সঅ			শ, শয়	একশো
সহস্র বা এক হাজার ১,০০০	সহস্র					সহস্র

ফারসি থেকে হজার

কবি-শকাঙ্ক

আমাদের প্রাচীন ও মধ্য বাংলার সাহিত্যে কবিদের রচনায় এমন কতকগুলো সংখ্যাবাচক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থের লিপিকাল, রচনাকাল ইত্যাদি নির্দেশ করে গেছেন। এগুলোর মজা হলো, এগুলো ডান থেকে বাঁ দিকে পড়লে যথার্থ অর্থ উদ্ধার করা যায়। এই নিয়মের নাম সংস্কৃতে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ', বাংলায় একে বলা হয় কবি-শকাঙ্ক।

উদাহরণ দেয়া যাক : সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী অর্থাৎ ৭১৪১, কিন্তু অর্থ ১৪১৭ ; তেমনি, বেদ ঋষি রস ব্রহ্ম অর্থাৎ ৪৭৬১, যার অর্থ ১৬৭৪

এর শিক্ষা আমাদের স্কুলে পাঠশালায় কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ছেলেবেলায় পড়েছি—

একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারে বেদ পাঁচে বাণ ছয়ে ঋতু সাতে সমুদ্র আটে বসু নয়ে নবগ্রহ দশে দিক ইত্যাদি।

ভগ্নাংশ সংখ্যা-শব্দ
(Fractional Numerals)

ভাষায় তেমন প্রচলিত নয়, কিন্তু অংক কিংবা বিজ্ঞানের পড়াশুনোয় একের অর্ধেক, তারো অর্ধেক ইত্যাদি ভাবে যেখানে সংখ্যাকে ভাগ করা হয়, সেখানে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একেই বলা হয় ভগ্নাংশ সংখ্যা-শব্দ। যেমন, $\frac{১}{২}$ (দুয়ের এক) ; $\frac{২}{৫}$ (পাঁচের দুই) ; $\frac{৩}{১০}$ (দশের তিন) ইত্যাদি।

এগুলোর উৎপত্তি এভাবে হয়েছে :

ভগ্নাংশ সংখ্যা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
আধ = $\frac{১}{২}$	অর্ধ	অড্ঢ	আধ
দেড় = $১\frac{১}{২}$	দ্বি-অর্ধ	দিঅড্ঢ	দেড়
আড়াই = $২\frac{১}{২}$	অর্ধ-তৃতীয়	অড্ঢ তীঅ	আড়াই
তেহাই = $\frac{১}{৩}$	ত্রিভাগিক	তেহাইঅ	তেহাই
চৌঠা = $\frac{১}{৪}$	চতুর্থ	চউথ	চৌঠা
সওয়া = $১\frac{১}{৪}$	সপাদ		সওয়া
পৌণে = $\frac{৩}{৪}$	পাদোন		পৌণে
সাড়ে	সার্ধ	সড্ঢ	সাড়ে
আড়	অর্ধ	অড্ঢ	আড়

পূরণবাচক সংখ্যা-শব্দ
(Ordinal Numerals)

এক সময় সাধারণ পূরণবাচক সংখ্যা-শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা তদ্ভব শব্দ হিসেবে বাংলায় সাধারণতঃ মাসের দিন বোঝাতে প্রচলিত রয়েছে। এদের আগমন এইভাবে :

সংখ্যা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	আধুনিক বাংলা
পয়লা = ১লা	প্রথম + ইল	পহিল্ল	পহিল	পহিলে	পহেলা, পয়লা
দোসরা = ২রা	দ্বি-সর				দোসরা
তিসরা = ৩রা	ত্রি-সর				তিসরা
চৌঠা = ৪ঠা	চতুর্থ	চউট্ঠ		চৌঠ	চৌঠা
পাঁচই = ৫ই	পঞ্চমিক				পাঁচই
ছয়ই = ৬ই	ষট্ + মিক				ছয়+ই-ছয়ই
সাতই = ৭ই	সপ্ত + মিক				সাত+ই-সাতই
আটই = ৮ই	অষ্ট + মিক				আট+ই - আটই
নয়ই = ৯ই	নব + মিক				নয়+ই - নয়ই
দশই = ১০ই	দশম + মিক				দশ+ই - দশই
মেজো	মধ্যক				মেজো
দোজ	দ্বিত্য				দোজ
তেজ	ত্রিত্য	তইজ্জ	তইজ্জ		তেজ

গুণবাচক সংখ্যা-শব্দ
(Multiplicative Numerals)

গুণবাচক সংখ্যা-শব্দের আগমন এখানে দেখানো হলো :

সংখ্যা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
একলা	এক + ল	একল্লা	একলা, একেলা
একহারা	একভারক		একহারা
দোহারা	দ্বিভারক		দোহারা
তেহারা	ত্রিভারক		তেহারা
দুগুণ	দ্বিগুণ	দুউণ	দুগুণ (দুনা)
চৌগুণ	চতুর্গুণ		চৌগুণা

নির্দেশক সংখ্যা-শব্দ
(Definite Numerals)

বাংলায় নির্দেশক সংখ্যা-শব্দের পরিমাণ একেবারে কম নয়। এগুলো যখন প্রত্যয়ের সাথে ব্যবহৃত হয় এর মানে হয় গণনা, আর প্রত্যয় ছাড়া এর মানে দাঁড়ায় পরিমাণ।

'বইটার দাম দশ টাকা'—পরিমাণ বুঝাচ্ছে।

'এটা কিনতে দশ টাকা লেগেছে'—গণনা বুঝাচ্ছে।

সংখ্যা-শব্দগুলো এমনিতে সমানাধিকরণ পদ, তবে প্রত্যয়যুক্ত হলে তা হয়ে যায় বিশেষণ—এইটুকু পার্থক্য।

ধাতু, ক্রিয়া ও তার কাল
(Roots, Verb & Tense)

ক্রিয়ার মূল অংশের নাম ধাতু। অর্থাৎ এমন কোনো ক্রিয়াপদ, যার বিভক্তি, বিকরণ[১] ইত্যাদি থেকে ছাঁটাই হয়ে যখন মূল অংশে এসে পৌঁছায়, ধাতু বলতে আমরা তাকেই বুঝি। এই অংশটি অবিভাজ্য। এজন্যে এর আরেক নাম ক্রিয়া প্রকৃতি (Root)। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ক্রিয়া ধাতু নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো ক্রিয়া ছাড়াও অনেক সময় অনেক ধাতুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধাতুগুলো নিঃসন্দেহে ক্রিয়ামূল , অতএব ধাতু। কিন্তু বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সংযোগ না হওয়ায় ক্রিয়া হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বোঝা যায়, সব ধাতু ক্রিয়া হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ক্রিয়া-ধাতু নামে তাই একে অভিহিত করার প্রচেষ্টা অযৌক্তিক নয়।

বাংলা ধাতুগুলোকে উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায় —

ক. সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots) ;

খ. সাধিত ধাতু (Secondary or Derivative Roots) ;

গ. সংযোগী ধাতু (Compounded Roots).

ক. সিদ্ধ ধাতু (Primary roots) : যে সব ধাতুকে ভাষায় বিশ্লেষণ করা যায় না, মূল ধাতুটি নিজের অর্থ নিয়ে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার নাম সিদ্ধ ধাতু। পড়, লেখ, দেখ, চল, খা, শুন ইত্যাদি।

খ. সাধিত ধাতু (Secondary roots or Derivative roots) : যে সব ধাতু বিশ্লেষণযোগ্য, অর্থাৎ ধাতুর মূলের সাথে প্রত্যয়, বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভাষায় বিরাজ করে, তার নাম সাধিত ধাতু। এমন কতকগুলো নামধাতু আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে, যার প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত না হয়েও ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়—এগুলো সংস্কৃত কিংবা বাংলার বিশেষ্য শ্রেণীর পদ, এগুলোকেও সাধিত শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

√খা + ওয়া = খাওয়া ; দেখ্ + আ = দেখা ; লাঠি + আ = লাঠা ; রঙ্ + আ = রঙ্গ ; ধমক + আ = ধমকা ইত্যাদি।

গ. সংযোগী ধাতু (Compounded roots) : সিদ্ধ ধাতুর সাথে বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদি যোগ হলে হয় সংযোগী ধাতু। সিদ্ধ ধাতু অর্থাৎ হ, পা, কর, দেখ, পড় ইত্যাদির সাথে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ যোগ হওয়া অর্থাৎ দুটি বা তারো বেশি পদের সংযোগ হওয়ার কারণেই এর নাম সংযোগী ধাতু। প্রবাহিত + হ = প্রবাহিত হ ;

---

১. বিকরণ : সংস্কৃত ক্রিয়ার অংশ তিনটি—ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি। যেমন: চরতি=চর (ধাতু) + অ (বিকরণ)। তি (বিভক্তি) এই তিনের মধ্যের অংশকে বলা হয় বিকরণ (Base-affix)।

দেখা + পা = দেখা পা ; ভালো + কর্ = ভালো কর্ ; কাজল + দেখ্ = কাজল দেখ্ ; সজোরে + পড়্ = সজোরে পড়্ ইত্যাদি।

বাংলার ধাতুর মূল উৎস হয় সংস্কৃত, নয় প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশ। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের এই ধাতুর মূল শুধু সেই সংস্কৃত অনেক সময় দেশী শব্দ থেকেও এর আগমন হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। যেমন, দেশী শব্দ হাঁকার প্রাকৃতে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হলো, অতঃপর তার পরবর্তী রূপটি হলো এইভাবে : প্রাকৃত হাঁকর > হক্কার ; প্রাকৃত কোটা > কুট্টা ইত্যাদি।

সংস্কৃত থেকে এভাবে দেখানো যায় : সংস্কৃত ব্রজ > বাঁচা
সং. √হিংস > হিঁটা
সং. √ব্রূ > বলা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ক্রম বা স্তরভিত্তিক ক্রমবিকাশ খুঁজে বার করা গেছে ; এতে করে মূল ভাষার সাথে পরবর্তী কালের প্রচলিত ভাষার সামঞ্জস্য, যোগসাজশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, ভাষার যথার্থ পরিচিতি এতে মিলে যায় অনায়াসে। কিন্তু বাংলা ক্রিয়াপদের ধ্বনি–পরিবর্তনে খানিকটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাই সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত থেকে উদ্ধৃত ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থ মূল ধাতুটির সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে রক্ষে, এ রকম ধাতুর সংখ্যা আমাদের ভাষায় খুব বেশি নেই।

সংস্কৃতে ধাতুর অব্যবহিত পরে এবং উত্তরে যথাক্রমে কালবাচক প্রত্যয় এবং বিভক্তি যুক্ত হয়ে নতুন নতুন ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ধাতুর অব্যবহিত পরে যুক্ত কালবাচক প্রত্যয়ের নিদর্শন : √জ্ঞা > জানাতি > জান্ (জানে) ; √শ্রু > শৃণোতি > শোন্ (শোনে) ; √নৃৎ > নর্ততি > নাচ্ (নাচে) ইত্যাদি।

আর ধাতুর উত্তর যে বিভক্তির যোগ হতো, তা হলো :

১. লট্ (Present Indefinite, Imperfect and Imperfect Continuous) ;
২. লোট্ (Imperative) ;
৩. লঙ্ (Inperfect) ;
৪. বিধিলিঙ (Potential) ;
৫. আশীর্লিঙ (Benedictive) ;
৬. লৃঙ (Conditional) ;
৭. লিট্ (Perfect or Second Preterite) ;
৮. লুট্ (First or Periphrastic Future) ;
৯. লৃট্ (Second Future) ;
১০. লুঙ (Aorist or Third Preterite)

এগুলো তিন পুরুষে (উত্তম, মধ্যম ও প্রথম) বিভক্ত হয়ে প্রতিটি আবার তিন বচন অনুযায়ী ভাগ হয়ে পদে ব্যবহৃত হয়। পরস্মৈপদ (Active) ও আত্মনেপদ (Middle) এই দুই

ভাগে এই বিভক্তিগুলো ভাগ করা হয়। একেকটি বিভক্তির আবার আঠারোটি আকার রয়েছে—পরস্মৈপদের ন'টি এবং আত্মনেপদের ন'টি। এভাবে দেখা যায়, সংস্কৃত ধাতুরূপে বিভক্তির সর্বমোট আকার একশো আশিটি—পরস্মৈপদে নব্বইটি এবং আত্মনেপদে নব্বইটি।

উপসর্গের সহযোগে ধাতু নতুন নতুন ধাতুতে রূপান্তরিত হতে পারে—পত্ ধাতু নিজন্তে > পাতে, পত্ ধাতুর সাথে 'উৎ' (উপসর্গ) যোগে নিজন্ত উৎপাতয়তি > উপাড়ে, উপড়ায়।

বিশ্ + আ > আবিশতি > আসে ;
আ - বৃত্ (নিচ) > আবর্তয়তি > আওটায় ;
উৎ + বৃত্ (নিচ) > উৎবর্তয়তি > উবটায়

বাংলার ঘাঁটা, টোড়া, হাঁটা, ছোটা ইত্যাদি কতকগুলো ধাতুর ব্যুৎপত্তি জানা যায় না।

নামধাতু (Denominative Verb)

বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার এবং ভাষার সৌন্দর্য বিধানের জন্য অনেক সময় নাম বা বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদকে ধাতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এভাবে নাম বা বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদকে ধাতু হিসেবে ব্যবহার করাকে **নামধাতু** (Denominative Verb) বলে। যেমন, আদেশ > আদেশিল ; প্রভাত > প্রভাতিল ; পবিত্র > পবিত্রিল ইত্যাদি।

নামধাতু প্রচলন প্রসংগে একটি মজার গল্প রয়েছে। বাংলা ভাষায় নামধাতুর প্রচলন খুব বেশি পুরনো নয়। কবি মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে সবেমাত্র আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি এই নামধাতুর বহুল ব্যবহারে বাংলা ভাষাকে গতিশীল করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এর বড় প্রমাণ। এতে এক জায়গায় রয়েছে :

'প্রভাতিল বিভাবরি'

তৎকালীন পণ্ডিতদের কেউ কেউ এই নামধাতুর ব্যবহার ব্যাকরণগত নয় বলে মন্তব্য করে 'ছুছুন্দরি বধ কাব্য' রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যকে প্যারোডি করে। তাতে এই নামধাতুই প্যারোডির প্রধান বিষয় ছিলো :

'টেবলিল সূত্রধর কাঁঠালের কাঠে'

কিন্তু এই নামধাতু বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আজ এক বিশেষ ভূমিকা হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের ভাষায় নামধাতুর ব্যবহার হয় এভাবে—

১. সংস্কৃত শব্দকে নামধাতু হিসেবে ব্যবহার —
প্রশংসা > প্রশংসিল ; আদেশ > আদেশিল ; নিবেদন > নিবেদিল ইত্যাদি।

২. অনুকারসূচক অব্যয়কে 'অ' প্রত্যয় যোগে নামধাতু হিসেবে ব্যবহার। যেমন –
ঝনঝন> ঝনঝনিয়ে ; ভনভন > ভনভনিয়ে ; তড়তড় > তড়তড়িয়ে।

৩. বাংলা ভাষায় কেবলমাত্র 'আ' প্রত্যয় যোগ করেই নামধাতু গঠন করার রীতি রয়েছে। যেমন — পিছল > পিছলায় ; লতা > লতায় ; তল > তলায়।

৪. বিদেশী শব্দকে নামধাতু হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন— টেবিল >টেবলিল ; চাবুক ; > চাবকায় ; বদল > বদলায়।

৫. সংস্কৃত থেকে বাংলায় আগত অনেক নামধাতু আজ বাংলার মতোই সহজাত ও স্বাভাবিক ধাতু হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন কর্ম > কামায় ; দণ্ড > দাঁড়ায় ; ব্যাখ্যান > বাখানে ; অঙ্গুল > অঙ্গুলিল ; গোড় > গোড়াইল ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb)

একাধিক পদের সাহায্যে গঠিত হয়েও যদি একটি মাত্র ক্রিয়াপদের ভাব প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb)। যৌগিক ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা দিয়েছেন ড. সুকুমার সেন, যা এখানে দেখা যেতে পারে, "যদি কোনো ক্রিয়াধাতু অন্য পদের যোগে একটিমাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশ করে তবে তাহাকে যৌগিক ক্রিয়াপদ বলে।" যৌগিক ক্রিয়াপদের ধাতুর সাথে 'ইতে' বা 'ইয়া' যোগ করার পর 'আছ' ধাতুর যোগে সাধারণভাবে এই যৌগিক ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়। এছাড়া 'ইয়া'-অন্ত পদের সাথে 'দা', 'লভ্' ধাতুর সহযোগেও যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হতে পারে।

পালি-প্রাকৃতে লভ্, গম্, কৃ, যা ইত্যাদি সহযোগে যৌগিক ক্রিয়াগুলো গঠিত হতো। প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাবের ফলে অর্বাচীন সংস্কৃতেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন, শোকং করোতি > শোচতি ; দৃষ্টং ভবতি> অদৃশ্যত ; গমনং করোতি > গচ্ছতি ; কর্তুং লভতে> কুর্যাৎ ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় এর নিদর্শন — 'টুটি গেলি কংখা' ; 'পঞ্চনালেঁ উঠি গেল পাণী ; 'গুণিআ লেঙ্গ ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায়—পকেট মারে ; জবাব দেয় ; প্রশ্ন করে ; ঘুরপাক খায় ; উঠে গেলো, ঘুম গেলো ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়াপদকে গঠনের দিক দিয়ে বিচার করে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার একে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন :

১. সমাপিকা-সমাপিকা=পড়ে শোনে ; রয় সয় ; যায় আসে।

২. সমাপিকা + অসমাপিকা = দেখ গিয়ে ; বল গিয়া ; নাও এসে।

৩. সমাপিকা + অসমাপিকা+ সমাপিকা=নাও গিয়ে যাও (নাও গে যাও) ; খাও গিয়ে যাও (খাও গে যাও)

৪. অসমাপিকা-সমাপিকা - দিয়ে দিলো ; বলে যাও ; এঁকে নাও।

৫. বিশেষ্য (বা বিশেষণ) + সমাপিকা = ভালো বাসে ; লজ্জা পায় ; সালাম করে।

অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-Finite Verb)

অসমাপিকা ক্রিয়া সংস্কৃতের মতোই মূলত নামপদ। পদের শেষে প্রত্যয় স্থানীয় তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় প্রচলিত রয়েছে—

১. ল্যবর্থ অসমাপিকা (Conjunctive) : -'ই' ও '-ইয়া' ;

২. ভূতার্থ অসমাপিকা (Conditional) : 'ইলে' এবং

৩. তুমর্থ অসমাপিকা (Infinitive) : 'ইতে'।

ণিজন্ত ক্রিয়া (Causative Verb)

সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ণিচ্, প্রেরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ণিচের 'ই' থেকে যায়। এই ধাতু উভয়পদী। সংস্কৃতে 'ণিচ্' হলে তা স্বতন্ত্র ধাতু বলে ণিজন্ত নামে অভিহিত হয়। যেমন, শ্রু ধাতুর ণিচ্ > শ্রাবি।

সংস্কৃতে এই ক্রিয়ার বিকরণ –'অয়' আর ধাতু ঋ, হ্রী, আব, আকারান্ত হলে 'পয়' হতো। যেমন —

পতি আবেই > পতিআই > পতিয়ায়;

বন্ধ পয়তি > বন্ধাবেই > বন্ধাবএ > বঁধায়;

ঋ অর্পয়তি > হ্রী অর্পয়তি > হ্রপয়তি ইত্যাদি।

কৃ–ধাতু সহযোগে ণিজন্ত ক্রিয়া আমাদের প্রাচীন বাংলায় বিরল নয় —ডাহ কএলা>দাহ করলো। আজকের কথ্য ভাষায় এর নিদর্শন মেলে —দাঁড় করানো, কান ধরে ওঠ বস করানো ইত্যাদি।

স্বয়ংক্রিয়' ক্রিয়া (Reflexive Verb)

ক্রিয়ার কর্তা রূপে যখন কর্মকে দেখানো হয়, তখন ক্রিয়াকে বলে স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া। যেমন, পেয়ালাটা ভাঙলো; কাঁচের চুড়ি ভাঙে না আঁচড় লেগে; এ কাপড় সহজে ছিঁড়বে না বলে রাখলাম ইত্যাদি।

ণিজন্ত ক্রিয়াও স্বয়ংক্রিয় অর্থ প্রকাশ করতে পারে, এ নিদর্শন মেলে আমাদের মধ্য–যুগের সাহিত্যে যেমন, 'সেহি এহা পথে মহাদানী বোলায়'; 'কহ্নয় মূলজরদ্গব' ইত্যাদি

অকর্তৃক ক্রিয়া (Impersonal Verb)

যে ক্রিয়ার কোনো কর্তা থাকে না, তার নাম অকর্তৃক ক্রিয়া (impersonal verb)। 'ভালো লাগে' (আমার ভালো লাগে); 'ঠাণ্ডা লাগে' (লুনার ঠাণ্ডা লাগে) ইত্যাদি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী কর্তা আসলে কর্তৃকারক বিভক্তিযুক্ত নয়, সম্বন্ধ পদের বিভক্তি যুক্ত পদ মাত্র। লাগ, পা, হ ইত্যাদি ধাতু সহযোগে অকর্তৃক ক্রিয়া গঠন করা হয়ে থাকে — খিদে লাগা, তেষ্টা পাওয়া, কষ্ট হওয়া, সুখ হওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের কয়েকটি বিশুদ্ধ অকর্তৃক ক্রিয়ার উদাহরণ দেয় হলো এখানে — মন হয়েছে, চোখ লেগেছে, ঘোর লেগেছে, আঁধার করেছে, কালো হয়েছে, ফর্সা হয়েছে ইত্যাদি।

অপূর্ণরূপ বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (Defective Verb)

সব ভাষাতেই এমন কতকগুলো ক্রিয়াপদের সন্ধান মেলে যেগুলো সবকালে (tense) এবং ভাবে (mood) সম্পূর্ণ হতে পারে না বা হয় না; সংস্কৃতে 'অস্' (লট্–লুঙে রূপ হয় না); 'দৃশ্' (বর্তমান কালে লট্–লো–লেট্–লঙ্ বিধিলিঙ্ অচল); 'স্পৃশ্' (বর্তমান কালে অচল); 'ব্রূ' (বর্তমান কালে অব্যবহৃত)। অপূর্ণরূপ বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া এগুলোই। আধুনিক বৈয়াকরণে কেউ কেউ একে 'পঙ্গুক্রিয়া' নামেও অভিহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এ ধরনের অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণরূপ ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অস্' > 'অছ' (ভবিষ্যৎ কিংবা অনুজ্ঞায় (আধুনিক বাংলায়) এর রূপ নাই। এ রকম অপূর্ণরূপ ক্রিয়া —বৃৎ > বট্ (বর্তমান কাল ছাড়া এর রূপ নাই) ; আ+ য >'আ' (শুধু অতীত কালে) ইত্যাদি।

অস্ত্যর্থ ও নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া (Substantive & Negative Verbs)

অস্ত্যর্থ ধাতু সংস্কৃতে চারটি ছিলে—অস্, বৃৎ, ভূ ও স্থা।

সং. অস্+ লট্–তি=অস্তি—বর্তমানের এই রূপটির সন্ধান পালি প্রাকৃতে 'আত্থি' হয়েছে। অপভ্রংশে কিংবা বাংলায় 'আত্থ' বা 'অত্থি'র কোনো রূপ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে, 'অস্তি'র আরেকটি রূপ 'অচ্ছতি' থেকে প্রাকৃত–অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে এসে বাংলায় হয়েছে 'আছি' (অচ্ছতি > অচ্ছই > অছই > আছি) । বাংলায় 'আছ' ধাতুর সব কালের রূপ পাওয়া যায় না। মধ্য বাংলায় বর্তমান ও অতীতের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলায় কেবল অতীত কালের রূপ পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলায় আছহুঁ চউহন সংযোহী।

মধ্য বাংলায় —আছো, আছহ, আছে, আছএ, আছিল, আছিলাহোঁ ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায়—আছে, আছিল (কথ্য ভাষায়), আছ ইত্যাদি

সং. ভূ+লট্–তি=ভবতি প্রাকৃতে, হোই >অপ হোই > প্রা. বাং. হোই, আধুনিক বাংলায় হয় সব কালের রূপেই একে পাওয়া যায়। যেমন, হই, হও, হবে, হলো ইত্যাদি। সম্ভ্রমার্থে হন, হবেন, হলেন ইত্যাদি।

সং. বৃৎ+ আত্মনেপদ লট্তে > বর্ততি> প্রা. বট্টই > অপ. বট্টই > বট্ থেকে বটে। বর্তমান কালের রূপ হয়—বটি, বট, বটে ইত্যাদি

রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়

সং. স্থা থেকে বাংলায় থাক্ সব কালের রূপ এর হয়—থাক, থাকে, থাকি ইত্যাদি। সম্ভ্রমার্থে এর ব্যবহার হচ্ছে— থাকলেন, থাকবেন, থাকেন ইত্যাদি। 'রহ্'-ধাতুর সাথে 'থাক্' –এর মিল থাকলেও 'থাক্' সাধারণত দীর্ঘকাল ব্যাপিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় আর্যভাষায় আদি ও মধ্য-বাংলা পর্যন্ত 'ন' ক্রিয়ার অব্যবহিত আগে বসে নিষেধার্থ প্রকাশ করতো। এ কারণে পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি বহু ব্যবহৃত ক্রিয়ায় উপসর্গের মতো ক্রিয়ার সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়ে মধ্য বাংলায় নাস্ত্যর্থ প্রকাশ করতো। অপভ্রংশে এ পর্যন্ত একটিমাত্র নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া পাওয়া গেছে—

নীআণই (জানে না)

সংস্কৃতে অস্ত্যর্থক 'অস্' ধাতুর পূর্বে নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' যুক্ত করে নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া তৈরি করা হতো যেমন, ভয়ং নাসী=ন-আসীৎ কিংবা ভয়ং নাস্তি = ন - অস্তি ইত্যাদি। প্রাকৃতেও এর অনুসরণ রয়েছে পথি (ন-অত্থি)। আমাদের বর্তমান বাংলা ভাষায়ও এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন লক্ষণীয়—

সং. ন জানামি > ণ জানই > না জানি।

না জানি কি ব্যথা সে পেয়েছিলো।

না জেনে না শুনে তাসমীম কি জানি ভেবেছে আমাকে।

সং. ন+ভূ > ণউ > বাং. নহ। এই 'নহ'র বিভিন্ন কালের রূপ পাওয়া যায় —নহ, নহি, নহে ইত্যাদি।

সংস্কৃতের 'নি' অব্যয় সহযোগে বাংলায় বেশ কয়েকটি বিশেষ পদ সৃষ্টি হয়েছে—নিলাজ, নিখাঁকী ইত্যাদি।

বাংলায় আরেকটি নঞর্থক ক্রিয়া হচ্ছে 'নার'। মধ্য বাংলায় 'নার'-এর রূপ ছিলো নারিঅ, নারিব, নারিলোঁ। আধুনিক বাংলায় কখনো কখনো দেখা যায়—নারবো (পারবো না), কবিতায় পাওয়া যায় এর ব্যাপক ব্যবহার 'চিনিতে নারিলাম আপনায়।'

ক্রিয়ার কাল (Tense)

আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি, বাংলা ক্রিয়াপদের কাল তিনটি—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ; এবং এই তিনটি কালের প্রত্যেকটি আবার চারভাগে বিভক্ত — সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত ও নিত্যবৃত্ত।

প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ার এই কাল ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে সৃষ্ট। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বাক্য সংগঠন অনুযায়ী এতগুলো বিভাগ কতোখানি সঠিক তা অবশ্যই বিচার্য।

সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের ছয়টি কালের প্রয়োগ ছিল : একটি বর্তমান (Present বা লট্); তিনটি অতীত সম্পন্ন (Perfect) বা লিট্, অসম্পন্ন (Imperfect) বা লঙ্ এবং অনির্দিষ্ট (Aorist)বা লুঙ্] এবং একটি ভবিষ্যৎ (Future) বা লৃট্; আর একটি সম্ভাব্য অতীত (Conditional) বা লৃঙ্। পরবর্তীকালে লুপ্ত, কিন্তু সংস্কৃতে ব্যবহৃত আরো একটি কালের সন্ধান পাওয়া যায় Periphrastic বা লৃঙ্।

প্রাকৃতে তিনটি কাল পাওয়া যাচ্ছে : বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। অপভ্রংশে অতীত লুপ্ত হয়ে যায় 'শতৃ' প্রত্যয়ের প্রয়োগের ফলে— এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত কাল নির্দেশিত হতে থাকলো। অবশিষ্ট রইলো কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রাচীন বাংলায় দুটো কাল পাওয়া যায়—বর্তমান ও অতীত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ভবিষ্যতের পরিবর্তে নতুন করে আবার ভবিষ্যত কালের সৃষ্টি হলো। সংস্কৃতে অতীত কালের যে গঠন বা রূপ ছিলো, বাংলায় তার সব রক্ষিত নয়। কেবল সংস্কৃতের গঠন ও রূপের অবিকল রূপ গঠন পাওয়া যায় বর্তমান কালের। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশেও তার রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে।

উৎপত্তির দিক থেকে বাংলার ক্রিয়ার কালকে দুভাগে ভাগ করা হয়—মৌলিক কাল (Radical Tense) ও কৃদন্ত কাল (Participal Tense)।

প্রয়োগের দিক থেকে কালকে আরো একভাবে ক্রিয়ার কালকে বিভক্ত করা হয় — সরল কাল (SimpleTense) ও যৌগিক কাল (Compound Tense)।

মৌলিক কালের আবার দুটি ভাগ নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান (Present Indicative) ও অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান (Present Imperative) এবং (২) অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ (Future Imperative)।

কৃদন্তকাল তিনভাগে বিভক্ত— (১) অতীত ; (২) –ইব' যোগে গঠিত ভবিষ্যৎ ও (৩) 'ক্ত', 'তব্য' 'অনীয়' এবং 'শতৃ প্রত্যয় যোগে গঠিত নিত্যবৃত্ত কাল।

নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান কাল (Present Indicative)

মৌলিক বর্তমানের বিভক্তি হিসেবে সংস্কৃতে লট্ পাওয়া যায়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচন ভেদ ছিলো। অবহট্‌ঠে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মধ্যম পুরুষে একবচন ও বহুবচনের পদ পারস্পরিকভাবে পরিবর্তিত হলো প্রথম পুরুষে বহুবচনের প্রচলন ছিলো। প্রাচীন বাংলায় বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ অবহট্‌ঠের মতো ছিলো। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় একবচন ও বহুবচন ছিলো, সংস্কৃতের ধাতুরূপের দ্বিবচন বিলুপ্ত হলো বাংলায়।

১. উত্তম পুরুষ (First Person) : সংস্কৃত 'স্মি' থেকে উৎপন্ন (স্মি > প্রা. ম্মহি > অ, মি > প্রা. বাং. মি >) 'মি' এবং কখনো কখনো 'ম' প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিলো। মধ্য বাংলায় এর পরিবর্তন হলো এবং 'মি' বিভক্তির পরিবর্তে সংস্কৃত 'ক্ত' থেকে আগত 'ই'-র ব্যবহার শুরু হলো। আধুনিক বাংলায় তারই অনুসরণে করি, খেলি, বলি, চলি ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টম্ > দেখি, কৃতম্ > করি ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষের বহুবচনেও এই 'ই'-র ব্যবহার হয়। প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃতি 'ধ্বম' থেকে আগত হুঁ, হু-র ব্যবহার হতো. মধ্য বাংলায় এসেই তা 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, অস্মাভিঃ দৃষ্টম্ > আহ্মে দেখি > আমরা দেখি

২. মধ্যম পুরুষ (Second Person) : সংস্কৃত –সি> অপ.–সি > প্রাচীন বাংলায় সি> ম. বাং. সি > আধুনিক বাংলায় –ইস্ এবং কথ্য ভাষা—অস এইভাবে মধ্যম পুরুষের বিভক্তির রূপান্তর হয়েছে। যেমন—পুছসি > পুছিস > পুছিস্ এবং পছস্। এটা একবচনে প্রযোজ্য। বহুবচনে সং. থস্> অপ. হু > প্রা., বাং. হু > মধ্য বাং.–হ > আধুনিক বাংলায় –অ এসেছে। যেমন দেহু > দেহ > দেখ মধ্য বাংলায় বহুবচনের 'হ' একবচনেও প্রচলিত এবং তার অনুসরণে আধুনিক বাংলায় একবচন ও বহুবচনে–'ই'-র ব্যবহার রয়েছে।

৩. প্রথম পুরুষ (Third Person) : সং তি > প্রা.–ই > অপ .– ই > প্রা. বাং. –ই এইভাবে একবচনের বিভক্তি প্রচলিত। যেমন, করোতি > করই > করই > প্রা. বা. করই। এবং সংস্কৃত ভাবকর্ম বাচ্যের য়+তি > অপ. এই, অই >প্রা. বাং. এই, অই।

সংস্কৃতের √অস+তি=অস্তি> পা. প্রা. অপ. অত্থি > প্রা. বাং. থি। সংস্কৃতের বহুবচনের –ন্তি> প্রা. বাং. একবচনে ন্তি হয়। আর প্রা. বাং. ই > ম. বাং.. ই, এ ; আধুনিক বাংলায় ই লুপ্ত এবং এ প্রচলিত। যেমন বোলই > বলে ; জাগই> জাগে ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতের অস্তি > থি মধ্য বাংলায় –ই এবং–এতে পর্যবসিত (বোলথি > বলে, ভণতি > ভণে, ভণই)। আধুনিক বাংলায় কেবল–'এ' রয়েছে (ভেণে, বলে)।

প্রাচীন বাংলার–ন্তি > ম. বাং. (বহুবচনে) –ন্তি (তি) > –এন্ত প্রা. বাং. এন্ (সম্ভ্রমার্থে)। যেমন বোলন্তি > বোলেন্ত > বলেন।

প্রাচীন বাংলার ভাব কর্মবাচ্যের এই, অই মধ্য বাংলায় হয়েছে অএ, ইএ, আধুনিক বাংলায় আরো পরিবর্তিত হয়ে হলো এ। যেমন, মারিঅই > মারিএ > মারে ; করিঅই > করিএ > করে ইত্যাদি।

অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কাল (Present Imperative)

মধ্যম পুরুষ : অনুজ্ঞাভাবে প্রাচীন বাংলায় বর্তমান কালের বহুবচনের রূপ নেই বললেই চলে ; মধ্য ও আধুনিক বাংলায় এসে তা একেবারেই অবলুপ্ত, মধ্যম ও প্রথম এই দুই পুরুষে বর্তমান কালে অনুজ্ঞাভাবে রূপ পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষে এর কোনো রূপ হয় না।

প্রাচীন বাংলায় বর্তমান কালে অনুজ্ঞাভাবে পাঁচটি বিভক্তি রয়েছে মধ্যম পুরুষের।

সংস্কৃত –হি > প্রা.–হি > প্রা. বাং –হ (ভবহি > হোহি হোহ)। মধ্য ও আধুনিক বাংলায় অবলুপ্ত।

শূন্য বিভক্তি সং. বুধ্য > বুজ্ঝ > বুঝ
সং. চালয় > চালঅ > চাল > চাল।
সং. – থ > প্রা.–হ > প্রা. বাং. – হ (জানথ > জানহ > জানহ)।

মধ্য বাংলায়ও এই - হ ব্যবহৃত। আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে হলো –ও। ।

যেমন —

করথ > করহ > করো ;

জানথ > জানহ > জানো ;

দেখথ > দেখহ > দেখো ইত্যাদি।

সং— ত > প্রা. – অ > প্রা. বাং. – অ > মধ্য ও আধুনিক বাংলায় – 'অ' স্থানে হসন্ত। যেমন, করত > অকরঅ > কর্ ; জানত > জানঅ > জান্ ইত্যাদি

সংস্কৃতের –অস প্রাকৃতে –হ হয়ে প্রাচীন বাংলায় হ অক্ষুণ্ণ থেকেছে। মধ্য ও আধুনিক বাংলায় তা একেবারে নিশ্চিহ্ন।

প্রথম পুরুষ : সংস্কৃত. তু থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশে এ, –এউ স্তর পেরিয়ে প্রাচীন বাংলায় অনুজ্ঞায় যে বিভক্তিটি যুক্ত হতো তার নাম –উ'। এর উৎপত্তি এইভাবে : করোতু > করউ> করউ> করউ ; প্রাচীন বাংলার এই – 'উ' পরবর্তীকালে মধ্য বাংলায় এসে হয়েছে –'উক' ; যা বর্তমান বাংলায়ও প্রচলিত। যেমন, জাইউ > যাউক ; দেউ > দেউক। আর অভ্যন্তর সন্ধি হলে তারও পরিবর্তন হয় (যাউক > যাক) দেউক > দিক এবং সম্ভ্রমার্থে > – 'উন' হয়। মধ্যম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে। যেমন,

আপনি যাউন > আপনি যান ; আপনারা দিউন > আপনারা দিন ইত্যাদি

সংস্কৃতের 'মা' প্রাচীন বাংলায় নিষেধাত্মক অনুজ্ঞায় 'না' হয়ে যায় (মা ভুল = না ভুল ; মা হোই = হয়ো না) এবং 'ন' যোগে বসতে অনুজ্ঞায় –'হ' (ণ ভুলহ ; ণ করহ)। আজকের বাংলায় 'মা' সম্পূর্ণ অচল এবং ণ–জাত 'না' ব্যবহার হয় ক্রিয়ার পরের পদ হিসেবে (বলো না, যেয়ো না, যেয়ো না, করো না ইত্যাদি)।

নির্দেশকভাবে মৌলিক ভবিষ্যত কাল (Future Indicative)

মধ্যম ও প্রথম পুরুষে প্রাচীন বাংলায় নির্দেশকভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎকালের একবচনের বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন, সং. ভবিষ্যসি > হোহিসি (মধ্যম পুরুষ) ; সং. মারয়িষ্যসি > মারিহসি (মধ্যম পুরুষ) ; সং. কথয়িষ্যতি > কহিহ (প্রথম পুরুষ) ; সং করিষ্যতি > করিহই > করিহ (প্রথম পুরুষ) ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ভবিষ্যৎ কালের বিকরণ ছিলো 'সেট্'- ধাতুতে –'ইষ্য' এবং অনিট্ ধাতুতে –'স্য' প্রত্যয়। এর সাথে বর্তমান কালের পুরুষ ও বচন বিভক্তি যোগ করার রেওয়াজ ছিলো। যেমন, করিষ্যামি > করিষ্যসি ; খাস্যামি > খাস্যসিঃ মধ্যম পুরুষে এবং প্রথম পুরুষে করিষ্যতি > করিষ্যন্তি খাস্যসি > খাস্যন্তি ইত্যাদি।

মধ্য বাংলায় দুই একটি পদ পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ কাল অর্থে — প্রা. বাং. হোহিসি > ম. বাং. হওসি (মধ্যম পুরুষ) ; প্রা. বাং. করিহই > ম. বাং. করিহে (প্রথম পুরুষ)।

অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কাল (Future Imperative)

প্রাচীন বাংলায় অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যত কালের একটি মাত্র রূপই পাওয়া যায়, যা সংস্কৃতে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি থেকে এসেছে যেমন, সং. করিষ্যথ > প্রা. বাং. করিহ > ম. বাং. করিহ > আধুনিক বাংলায় করিও (করো) ; যাস্যথ > যাইহ > যাইও (যেয়ো বা যেও) ইত্যাদি।

কৃদন্ত কাল (Participal Tense)

বাংলা কৃদন্ত কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় —

১. কৃদন্ত অতীত কাল (–ল, –ইল, –ত, –ইত) ;

২. কৃদন্ত ভবিষ্যত কাল (–ইব) ;

৩. কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত কাল (– ক্ত, –তব্য,– অনীয়,–শতৃ)

১. কৃদন্ত অতীত কাল

অতীত কালের সমাপিকা পদ হিসেবে বাংলায় সংস্কৃতের কোনো চিহ্ন বহন করে না। কেবল একটি রেখা যায় অভাব বাচক অব্যয় হিসেবে (সং. নাসীৎ > প্রা. বাং. নাহি > আধুনিক বাংলায় নাই)

বাংলায় কৃদন্ত অতীত কালের রূপ যে দুইভাবে গঠিত হয়েছে তা হলো —(ক) প্রত্যয়যুক্ত (–ল) এবং (খ) প্রত্যয়হীন (ল) ;

(ক) প্রত্যয়যুক্ত (–ল) : সংস্কৃতের ক্ত > অপ. ইল্ল > অপভ্রংশের শেষ স্তরে এসে হলো –'ল'। এই 'ল' বাংলায় সোজা চলে এসেছে এবং অতীত কালের রূপে বাংলা ভাষায় এই 'ল'–র ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, প্রক্ষেপিত >পক্খেবি+ইল্ল > পক্খেইল্ল> পক্খাইল্ল > পক্খাইল।

প্রাচীন বাংলায় লক্ষণীয় দিক হলো, কর্তা–কর্মের লিঙ্গের (স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে) সাথে ক্রিয়া পদের লিঙ্গ একাত্ম হয়ে যেতো। যেমন, মেলিলি কাছি ; আজি

ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী ইত্যাদি স্থলে লক্ষণীয়ভাবে স্ত্রীলিঙ্গের কর্তার সাথে একাত্ম হয়ে ক্রিয়াপদগুলোও স্ত্রী লিঙ্গের আকার পেয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় –'ল'–এর সাথে - 'এসু' যোগ হয়ে উত্তম পুরুষের অতীত কাল হতো। যেমন মই দেখিলি ; মই ভইলি। আর মধ্য বাংলায় অতীত কাল হতো –'ঔ' (দেখিলোঁ), – 'আহোঁ' (দেখিলাহোঁ) এবং 'অঙ' (দেখিলাঙ) যুক্ত হওয়ায় আধুনিক বাংলায় –ল–এর সাথে –উম, –আম, –অম (ম্), –এম ইত্যাদি যোগ হলে অতীত কাল হয়। যেমন— দেখলাম, দেখলম, দেখলেম ইত্যাদি। এগুলো একবচন ও বহুবচনে একইরূপে ব্যবহৃত হয়

প্রাচীন বাংলায় মধ্যম পুরুষে –'ল' এর সাথে –সি (আছিলেসি) এবং –ই (নিলেছি) ; মধ্য বাংলায় –আ (দেখিলা), –এ (দেখিলে), –ই (দেখিলি) এবং আধুনিক বাংলায় –ই (দিলি), –আ –(দিলা), –এ (দিলে) এবং –এন (সম্ভ্রমার্থে – দিলেন) ইত্যাদি একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বাংলায় প্রথম পুরুষে –'ল' এর সাথে –সি (নিলেসি), – আ (ভইলা) ; –ই (হোইলি) ; মধ্য বাংলায়– এঁ (এ) = কৈলেঁ (কইলে), –অন্ত, –আন্ত (করিলেন্ত, গোলান্ত), –এন (গেলেন – সম্ভ্রমার্থে) এবং আধুনিক বাংলায় –এ (দিলে), –এন (দিলেন– সম্ভ্রমার্থে) ইত্যাদি একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

(খ) প্রত্যয়হীন (– ল) : সংস্কৃত থেকে অনেক শব্দ, বিভক্তি ও প্রত্যয়ের মত –'ত,' ও –'ইত' প্রত্যয়জাত ল–প্রত্যয়হীন কৃদন্ত অতীতকালের রূপ প্রাচীন বাংলায় মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়।

সং. প্র. বিশ্+ক্ত > প্রবিষ্ট > প্রা. পইট্ঠ, প্রা. বাং. পইঠ।

সং. নষ্ট > ণট্ঠা ; সং. দৃষ্ট > দিঠ ;

সং. বিকশিত > প্রা. বাং. বিকসিউ ;

সং. চলিতঃ > চলিঅ > ইত্যাদি।

–ত ও –ইত আমাদের মধ্য বাংলায় শেষের দিকে এসে কখনো কখনো নিত্যবৃত্ত অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে —

আইত, সম্ভ্রমার্থে আইতেন

দেখিত, সম্ভ্রমার্থে দেখিতেন

–ত এবং –ইত আধুনিক বাংলায় এসে উত্তম পুরুষে –ইতাম, মধ্যম পুরুষে –ইতে এবং সম্ভ্রমার্থে এর সাথে –এন যোগ ক'রে নিত্যবৃত্ত (habitual) অতীত বানানো হতো।

২. কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল :--

বাংলায় –'ইব' র ব্যবহারে কৃদন্ত ভবিষ্যৎকাল বোঝানো হয়ে থাকে, যার আগমন হয়েছে সংস্কৃতের 'তব্য' থেকে।

প্রাচীন বাংলায় –'ইব' (করিব নিবাস) এবং –'মি' (মরমি ডোম্বি) ; অবশ্য কখনো কখনো কর্তৃবাচ্যের মধ্যম পুরুষে –'ইবে' (অহেরি জাইবেঁ) বা –বেঁ এবং মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ বোঝাতে –সি (হোহিসি) যুক্ত হতো।

মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষে -ঁও (করিবোঁ) মধ্যম পুরুষে -এঁ (এ) (যাইবেঁ, যাবি) এবং প্রথম পুরুষে -এঁ (-এ) (করিবেঁ) ইত্যাদির ব্যবহার ছিলো।

আর আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষে -বো (যাবো) : মধ্যম পুরুষে -বি (করিবি), বে- (করবে), -বেন্ (করবেন সম্ভ্রমার্থে) এবং প্রথম পুরুষে -বে (করবে) -বেন্ (করবেন সম্ভ্রমার্থে) ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে।

৩. কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত কাল :

সংস্কৃতের শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদ থেকে আধুনিক বাংলায় নিত্যবৃত্ত কালের সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলায় এর ব্যবহার একেবারে ছিলো না — দু' এক জায়গায় থাকলেও সেগুলো অতীত কালের প্রকাশে অক্ষম ছিলো। কিন্তু মধ্য বাংলায় এসে শতৃ-অন্ত পদ আবার পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, জানিতোঁ, চাহিতেঁ ইত্যাদি। অবশ্য অতীত কালের অর্থ এখানেও খুব স্পষ্ট নয়।

নিত্যবৃত্তের বিভক্তি হিসেবে আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষে আমরা পাচ্ছি -ইতাম (-তাম) -জানিতাম ; -তেম (জানতেম) ইত্যাদি। মধ্যম পুরুষে হচ্ছে -ইতে, -তে (জানিতে, জানতে)। এবং প্রথম পুরুষে এসে হচ্ছে -তো (জানিতো, জানতো), -ইতেন, -তেন (জানিতেন, জানতেন) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের (নোয়াখালি, চট্টগ্রাম) আঞ্চলিক ভাষায় কখনো কখনো নিত্যবৃত্ত ভবিষ্যৎ অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন, আমি যাবো না > আই ন যামু ; আমি খাবো না > আই ন খাইয়াম ইত্যাদি।

যৌগিক কাল (Compound Tense)

যৌগিক ক্রিয়াপদে দুটি অংশ থাকে -- প্রথম অংশ কৃদন্ত অতীত কিংবা শতৃ -প্রত্যয়ান্ত বর্তমান এবং পরের অংশ 'আছ' ধাতুর সমাপিকা পদ। এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তারই নাম যৌগিক কাল। এর ক্রিয়ার দুটি অংশ, তাতে পৃথক পৃথক ভাবের সমাবেশ হয় এবং শেষের পদে 'আছ' ধাতুর অর্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন 'বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে'। এখানে দাঁড়+ ইয়ে+আছে, এখানে আছে'র অর্থের প্রাধান্য রয়েছে।

যৌগিক কালের প্রথমাংশ 'ইয়া' অন্ত এবং 'আছ' ধাতুর বর্তমান কালের রূপ মিলে হয় পুরাঘটিত বর্তমান (Present perfect) কাল এবং 'আছ' ধাতুর অতীত কালের রূপ হলে হয় পুরাঘটিত অতীত (Past perfect) কাল।

যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার থাকলেও প্রাচীন বাংলায় যৌগিক কাল ছিলো না। মধ্য বাংলায় প্রথম পাওয়া যায় যৌগিক কালের সন্ধান। যেমন—

পুরাঘটিত বর্তমান কাল— ফুটিছে, শুনিআছ ইত্যাদি।

পুরাঘটিত অতীত কাল— রাখিআছিল, আইছিল ইত্যাদি।

আধুনিক কালের ভাষায় পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ হচ্ছে -:

উত্তম পুরুষে — গিয়াছি (গেছি) ।

মধ্যম পুরুষে -গিয়াছ (গেছ), গিয়াছিস (গেছিস), গিয়াছেন (গেছেন)।

প্রথম পুরুষে — গিয়াছে (গেছে), গিয়াছেন (গেছেন)।

পুরাঘটিত অতীতের রূপ :

উত্তম পুরুষে — করিয়াছিলাম (করেছিলাম)

মধ্যম পুরুষে — করিয়াছিলে (করেছিলে), করিয়াছিলেন (করেছিলেন), করিয়াছিলি (করেছিলি)।

মধ্য বাংলায় প্রথম অংশে –ইল অন্তক ছিলো যৌগিক কাল (বহিলছে, ফুটিলছে). আধুনিক বাংলার ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় –ইল–অন্তক প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল আছে (হলছে = হয়েছে, গেলছে = গিয়েছে)। আর আধুনিক বাংলায় –ই–অন্তক প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল পাওয়া যাচ্ছে (কর্+ই+আছে—করিয়াছে (করছে), যা ঘটমান বর্তমান (Present continuons) অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। ইতে–অন্তক প্রথমাংশযুক্ত এবং আছ্ ধাতুর বর্তমান নিয়ে যৌগিক কালে ঘটমান বর্তমানের অর্থ প্রকাশ পায় (কর্ + ইতে+আছ্ > করিতে –আছ > করিতেছ > করছ) । মধ্যম ও প্রথম পুরুষে – 'এন' যোগে সম্ভ্রম বোঝানো হয়ে থাকে আর বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় করিতেছে > কইরত্যাছে হয়।

–ইতে –অন্তক প্রথমাংশযুক্ত এবং 'আছ্' ধাতুর অতীত রূপ নিয়ে গঠিত হয় যৌগিক কালের ঘটমান অতীত (Past continuous) কাল। কর+ ইতে+ আছিল > করিতেছিল > করছিল, করিতেছিলে > করছিলে, করিতেছিলাম > করছিলাম ইত্যাদি।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় এর পরিবর্তন হয় যথাক্রমে কইরত্যাছিল, কইরত্যাছিলে ও করত্যাছিলাম এইভাবে।

বাংলা বানান

বাংলা ভাষায় আজকের যুগে বানান একটি দারুণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে 'ভুল' বানানটি অনেক স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী যেমন ভুল করে, তেমনি 'মুহূর্ত' 'মধুসূদন' ইত্যাদি শুদ্ধভাবে বলতে পারার সংখ্যা খুবই কম।

ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত না হলেও ব্যাকরণের সূত্রসমূহের অধিকাংশই সংস্কৃতকে অনুকরণ করে বাংলায় ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত মনোনীত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকসমূহে বাংলায় আধুনিক সহজ সরল বানান যদিও অনুসৃত হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বয়সে কিশোর কিশোরী ও তরুণ হলেও বাংলা শব্দের বানানের বেলায় প্রায় সকলেই (ব্যতিক্রম মাধ্যমিক স্তরে শতকরা তিন, উচ্চস্তরে শতকরা দশ জনের বেশি হবে না) প্রাচীন, প্রবীণ এবং অংশত আধুনিক

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার, সেটি হলো, প্রায় সকল ভাষাতেই ধ্বনির পরিবর্তন যতো দ্রুত হয়, বর্ণমালা বা শব্দের বানানের পরিবর্তন সেই অনুপাতে ত্বরান্বিত হয় না। ফলে উচ্চারণ ও বর্ণমালা তথা শব্দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান একটি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে বানান Phonetical রীতি অনুযায়ী হবে, নাকি Phonemical রীতি অনুযায়ী.

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই এই বৈষম্য লক্ষণীয়। ইংরেজি ভাষায় এই বৈষম্য শতকরা নব্বই ভাগ, বাংলাতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। ইংরেজিতে Laugh, Knife, Daughter শব্দগুলোর gh, k, gh এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ এক সময় ঠিকই ছিলো, এখন নাই এবং বিকৃত হয়ে অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত। ফলে এই ধরনের শব্দাবলীর উচ্চারণ এখন ধ্বনিতাত্ত্বিক না হয়ে ঐতিহাসিক রূপ লাভ করেছে। বাংলায় শ্মশান, স্মৃতি, দ্বারা, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্মশ্রু (দাড়ি), স্মিত, সহ্য, সাহায্য, শ্রবণ, কারণ, দর্শন ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ ঠিক বানান (Phonetical) অনুসারে হয় না, অর্থাৎ উচ্চারণ ধ্বনিমূলক নয়। এককালে ণ-এর উচ্চারণ যথাযথ Phonetical হতো, এখন ন ও ণ-র উচ্চারণ একইভাবে হয়ে থাকে। এসব উচ্চারণ ও বানান বিভ্রাটের প্রধান কারণ।

যত্ব ণত্ব বিধানের প্রচলন বানান বিভ্রাটের আরেকটি কারণ। বাংলা শব্দের আধুনিক বানানের প্রবণতা সহজতার দিকে। কিন্তু কতোটা সহজ করা যাবে এ ব্যাপারে কোনো নীতি নির্ধারিত নেই। ধ্বনিতত্ত্বমূলক (Phonetical) বানান প্রচলন করবার একটা প্রয়াস সম্প্রতি লক্ষ্য করা যায়। কেবল ভাষার কথাই বলি কেনো, শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পে এবং উন্নত রুচির জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও সহজতা ও স্বাভাবিকতা প্রকাশের

ব্যাপক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই শব্দের বানানের বেলায় আমাদেরকে বিশেষভাবে সজাগ এবং কতকটা স্বশিক্ষিত (সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্ব-শিক্ষিত) হতে হবে।।

নিচের নিয়মগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো—

১. রেফের বেলায় ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব অপরিহার্য। যেমন, অর্জন, গর্জন, বর্জন, বিসর্জন, মর্ম, কর্ম, ধর্ম, পূর্ব, সূর্য, তূর্য, মূর্তি, স্ফূর্তি, পূর্তি, ভূর্জ, শর্ত, আবর্তন, বিবর্তন, পরিবর্তন, অর্ধ, সর্ব, পর্ব, গর্ব, বর্ম, চর্ম, নির্মল ; কিন্তু হর্ম্য, মর্ত্য, সামর্থ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি ব্যতিক্রম।

২. সন্ধিতে যদি ক, খ, গ, ঘ, ম পরে থাকে তবে পদের অন্তঃস্থিত ম স্থানে ং অথবা ঙ হতে পারে। যেমন, ঝংকার, ঝঙ্কার, ভয়ংকর ; ভয়ঙ্কর, সংগীত, সঙ্গীত ; সংঘাত, সঙ্ঘাত।

৩. শব্দের শেষে হস্ চিহ্নের প্রয়োজন নেই। যেমন, মন, বন, আকাশ, বাতাস, সম্রাট ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চারণের ভুল হবার আশঙ্কা থাকলে হস্-চিহ্ন দেয়া যেতে পারে। যেমন, আল্লাহ্, শাহ্, বাদশাহ্, ঈদগাহ্ (অনেকে আল্লাহর হ অ-র সাথে যোগ ক'রেও উচ্চারণ করেন।

৪. এই শব্দগুলোর বানান ই-উ দুই-ই প্রচলিত — পাখি (পাখী), কুমির (কুমীর), বাড়ি (বাড়ী), নিচু (নীচু), দিঘি (দীঘি), খুশি (বিশেষ্য), খুশী (বিশেষণ), বেশি (বিশেষ্য), বেশী (বিশেষণ), তৈরি (বিশেষ্য), তৈরী (বিশেষণ), ভংগি, ভংগী ; সব্জি (সব্জী) ; শৈলি, শৈলী।

৫. অর্থ গ্রহণের বাধা হতে পারে আশঙ্কায় নিচের বানানগুলো এইভাবে লেখা যেতে পারে —

কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; এতো, যতো, ততো ইত্যাদি। তবে বোধ হয় তো, হয়তো এসব ক্ষেত্রে সহজতা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়।

৬. বাংলা, বাঙালী দুটো বানানে ং যদিও আধুনিকতা বেশি প্রকাশমান, তবু ং এর আগে-পরে আ-কার বা এ-কার যুক্ত করার সুযোগ না থাকায় ঙ ব্যবহার সবিশেষ যুক্তিযুক্ত।

৭. বিদেশী শব্দের s স্থানে স, sh, tion, ch (স্থান ভেদে) স্থানে শ, শ, স্থানে স, স্থানে জ, স্থানে য হবে। যেমন — ইংরেজি কনস্টেবল, স্টিয়ারিং, স্কুল, অগাস্ট, স্টীমার, স্টেশন, শিপইয়ার্ড, কোর্টশিপ, প্রোমোশন, শেয়ার মার্কেট, ডিশ, ক্লাস, সার্কাস, ফোকাস, বাস (bus), বিস্কুট, ব্যারিস্টার, মাস্টার, পোস্ট, খ্রীস্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, রেজিস্টারী, মেশিন, মেস (mess), ব্রাশ (বুরুশ), পুলিশ, পালিশ, নোটিশ, সেট (set), স্টোভ, অফিস, শেরিফ (sherif) আরবি-কিসসা, কিসম, কিসমত, হযরত, জিন, জিহাদ, শহীদ, জিনিস, বশীর, শাহাদত, শুকুর, শানশওকাত, নযর, যিয়ারত, জযীরা, জাহান্নাম, ইসলাম, মুসলিম, সালাম, মুসাম্মাত, মুসাফির, মুরশীদ, মুশকিল, মুসাবিদা, মুস্তফা, শামা (প্রদীপ), শামিল, শায়ের, শিকায়েত, শামলা, শরীফ, শাবান, জওহর, শয়তান, শরাব, শেখ (শয়খ), শিয়া মাসুল, মিসকাল, আযীয, আয়েশ, জান্নাত, আযাযিল, নযীব, নসীব, ফিরিশতা, ফয়সালা,

ফরাশ, মজহাব, সুরত, আযাব, নমাহ বা নমায, তশরীফ, রাযী, যুলমাত, ফরয, মাশরিক, হাসিল, শুরু, নকশা। ফরাসি—আসান, শায়েস্তা, দুশমন, আশকারা, শিক, শের, শিকমি, শিকরা, সানাই, শহর, শরম,শামিয়ানা, সনাক্ত,শবনম, শাগরিদ, শখ, শাহ্, ফরমায়েশ—হুঁশ, হুঁশিয়ার, হিরাকশ, শুমার, দুরস্ত, শিশা, শোর, শোরা, ইশকাপন ইত্যাদি শব্দ। Z স্থানে জ হবে। যেমন — জেব্রা, জিরাফ ইত্যাদি।

৮. সাধু ও চলিত ভাষারীতিতে —'লাম' বিভক্তির ব্যবহার হবে। '—লুম' 'বিভক্তি' বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষায় স্থান পায় না। বিশেষ এক শ্রেণীর পশুর হুংকার ধ্বনির সাথে এর সাদৃশ্য (হালুম) থাকায় বিভক্তি হিসেবে এর ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে বর্জনীয়। উদাহরণ, চলিলাম, চলিলাম, করিলাম, করলাম ইত্যাদি।

—'লেম' বিভক্তি যেমন খেলেম, এলেম, গেলেম প্রভৃতিও আমাদের দেশে খুব প্রচলিত নয়। বাংলাদেশে 'লাম' বিভক্তির প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের 'লুম', 'লেম' অনেক অঞ্চলে বিভক্তি হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

৯. কতোগুলো সাধু শব্দের প্রচলিত রূপ পিছনে, ভিতর, উপর, পিতল ইত্যাদি শব্দের আদ্য অক্ষরে কিছুটা বিকৃতি লক্ষণীয়। যেমন পেছনে, ভেতর, ওপর, পেতল ইত্যাদি, যা গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে 'উঠা'র স্থানে 'ওঠা' চলতে পারে।

১০. প্রতিযোগী, উপযোগী, উপকারী প্রভৃতি ইন—ভাগান্ত শব্দের রূপান্তর লক্ষ্য করা প্রয়োজন — প্রতিযোগিতা, উপযোগিতা, উপকারিতা। একইভাবে স্থায়ী > স্থায়িত্ব, দায়ী > দায়িত্ব ইত্যাদি

উচ্চারণগত (Phonetical) বানান আর ধ্বনিতত্ত্বগত বা ধ্বনিমূলগত (Phonemical) ভাবে বানান লেখন সম্পর্কে বিশদ চিন্তাচেতনার পর বাংলা বানানের রূপরেখা নির্ণয় করা যেতে পারে। শব্দের উচ্চারণ যেভাবে করা হয় ঠিক সেভাবে বানান লেখা হয় না। তবে তা হলে বানান সমস্যা অনেকখানি কমে যেতো। কিন্তু সকল ভাষাতেই শব্দের ধ্বনি ও বানানের সাথে সর্বত্র সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। ফলে বানান শিক্ষা আয়াস-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় কতোগুলো উপসর্গ (আপদ অর্থে) আছে, নণ, অর্থাৎ ন ধ্বনি দুটি, শ ধ্বনি তিনটি (শ, ষ, স), দন্ত্য স যুক্তাক্ষর না হলে সবত্র শ ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হয়।

যেমন, সকল, সকাল, সন্দেশ, সপ্তাহ, সাহায্য, সুফল, সৌন্দর্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি। s-এর মতো উচ্চারণ হয় যুক্তাক্ষরে যেমন, অস্তে, আস্ত, হস্ত, প্রস্ত ইত্যাদি। ই দুটি, ই কারও দুটি, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। কিন্তু উচ্চারণের সময় আমরা কখনো কোনো স্বরই দীর্ঘ করি না। বানান বিভ্রাটের এগুলো বড় কারণ হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিকারের চেষ্টায় আমরা কেউই প্রয়াস পাচ্ছি না। কারণ একটাই, ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন যতো দ্রুত হয়, সেই অনুপাতে বর্ণমালার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কিংবা রূপান্তর কোনোটাই করা হয় না। এ ছাড়া আঞ্চলিক উপভাষাগত অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যও প্রচুর বানান ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষত বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে তালব্য বর্ণ (চ বর্গ), মহাপ্রাণ বর্ণ (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ফ, ভ) এবং র, ড় বর্ণগুলোর উচ্চারণ যথাযথ হয় না। ফলশ্রুতি বানান ভুল। তা ছাড়া অনুনাসিক ধ্বনির (অর্থাৎ নাসিক্য ধ্বনি) উচ্চারণ এই অঞ্চলে নেই বললেই

চলে। এই সকল দৈন্য দূর ক'রে উচ্চারণ এবং বানান সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ও সচেতন হলেই বানান বিভ্রাট দূর করা সম্ভব হতে পারে।

এখানে যে সকল বানান আমাদের প্রায়শঃই ভুল হয়ে থাকে তার একটি তালিকা দেয়া হলো ঃ

ক. অশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণের ফলে যে সকল বানান সচরাচর ভুল হয়ে থাকে দেশ, বেশ, বেলা (দিন), বেলাভূমি, প্রত্যেক, সাহায্য, তিরোধান, ক্ষুধা, ভৃত্য, মন্ত্রী, ইন্ধন, ম্যানেজার, অ্যাডভোকেট, মেঘ, ঘটনা, লুণ্ঠন, বিরুদ্ধ, চোখ, আলোচ্য, আঘাত, আরোগ্য, সমস্ত, স্থান, বংশধর, প্রস্তুত, অভ্যর্থনা, প্রার্থনা, পরাজিত, ভালবাসা, যুদ্ধ, ধৈর্য, অভ্যস্ত, প্রস্তর, ভীষণ, ব্যবস্থা, সম্বন্ধ, অন্য, সন্তুষ্ট, অন্ধ,নারী, বক্তৃতা, কর্তৃত্ব, সিদ্ধান্ত, ব্যাপার, সম্মুখ, ধ্বংস, ধসিয়া পড়া, এখন, অনুমান, তুলনা, গর্ত, শোভা, প্রত্যহ, প্রত্যক্ষ, গভীর, নিবিড়, নীরব, নীলিমা, নীড়, ভিড়, রঙিন, ক্ষোভ, নিপীড়িত, বরুদ, অপেক্ষা, সুন্দর, অগ্রবর্তী, লক্ষ্য, লক্ষ, সৌন্দর্য, অপরাধ, অনুরোধ, কেউ (কেহ), বিভাগ, ঘর, নিরুপায়, হুকুম, বন্দর, রোদন, ব্যক্তি, ব্যথা, ভয়, অতিথি, দূর, ভুল, সুতরাং, পুত্র, পক্ক, প্রকৃতি। স্বামী, দূত, পুরুষ, মোহিনী, হঠাৎ, সংশোধন, ভর্ৎসনা, যত্ন, কোথাও, প্রায়শ্চিত্ত, মানসিক, চৈতন্য, দুর্বা, সূর্য, স্বেচ্ছা, নির্যাতিত, সুস্থ, স্বাস্থ্য, ধূলা, চেষ্টা, মুহূর্ত, অস্তিত্ব, নিচতা, বৃষ্টি, নিবিষ্ট, দুষ্ট, সৃষ্টি, কেন্দ্র, পর্যন্ত, নাটক, দাম্ভিক, ফেরেস্তা বা ফিরিশতা, নিরস্ত, অনুপস্থিত, আলেখ্য, সম্পত্তি, চিন্তা, ক্ষুব্ধ, ব'মড়া, চালু, অবস্থা, দিক, উচ্চ, অত্যন্ত, অভিভাবক, অভিশাপ, অনুশোচনা, রিক্ত, ভারাক্রান্ত, গ্রস্ত, অন্তর্গত, অচিন্তনীয়, উষ্মা, উচিত, অভিভূত, তাড়ানো, তাড়াতাড়ি, শস্য, আবির্ভাব, ব্যতীত, বৃত্তান্ত, হিতৈষী, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দৃশ্য, অত্যাচার, লেখক,পার্থক্য, আহবান, সংগৃহীত, নির্জীব, চরাচর, কৃতকার্য, মৃত্তিকা, সম্বন্ধ, সহ্য, বিদ্বেষ, বেদনা, অবিচ্ছেদ্য, প্রেরণা, সত্যতা ইত্যাদি।

খ. ব্যাকরণগত কারণে যে সব বানানে ভুল হয়ে থাকে তিরস্কার, পুরস্কার, আবিষ্কার, বৃহস্পতি, নিষ্ঠুর, নিষ্পত্তি, নিষ্ফল, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কাম, নিশ্চল, স্বচ্ছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তস্থল, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, সত্তা, দাসত্ব, কৃতিত্ব, দায়ী, দায়িত্ব, স্তর, অস্তিত্ব, মহত্ব, তত্ত্ব, স্বার্থ, সার্থক, স্বচ্ছল, রূপ, স্বরূপ, সচ্চরিত্র, সঙ্গ, সঙ্গীত, সঙ্কট, আকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষা, রবীন্দ্রনাথ, ঔদার্য, দারিদ্র্য, দরিদ্রতা, দৈন্য, মর্ত্য, আধুনিক, ঔদ্ধত্য, অভিসম্পাত, অভিষিক্ত, অভিলাশ, দুর্গম, দুরূহ, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, দুর্লক্ষ, বিশিষ্ট, সামর্থ, মরূদ্যান, স্বপ্ন, সান্ত্বনা, জন্যপায়ী, দিগ্বিজয়ী, দিগন্ত, দিগদর্শন, দিগভ্রম, স্বর্গীয়, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, উপকারিতা, কর্ণ, কান, প্রাণ, পরান, ধারণা, ধরন, পূণ্য,শূন্য, পূর্ণ, পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য, পরিত্যাগ, পরিণতি, পীড়িত, বিনীত, পরিণয়, পর্যুদস্ত, স্ফূর্তি, স্ফুরণ, স্মরণ, দক্ষিণ, নবীন, প্রবীণ, নিতান্ত, শ্বেত, দীপ, দ্বীপ, উৎসর্গ, চিৎ, চিত, কুৎসিত, মুহূর্ত, মুমূর্ষু, মূর্ত, মূর্তি, মূর্খ, বধূ, বঁধু (বন্ধু) ; কর্তব্য, মর্ম, ধর্ম, কর্ম, পর্যন্ত, শর্ত, অর্চন, মূর্ছা, সর্ব, অর্ধ, কর্জ, ঠাঁই [১] নূতন, নতুন, একটি, একটা, শহর, চশমা, পোশাক, বেশী, খুশী, আয়েশ,. আফশোস, অগাস্ট, স্টীমার, ইশারা, দুশমন, নক্শা, বেহুঁশ, মুনশী, ম্যাজিস্ট্রেট.

---

[১] রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব কখনোই হবে না।

শখ, শায়েস্তা, শিরনি, শোরগোল, শামিল, স্টেশন, শুরু, সালিস, স্ট্যাম্প, শহীদ, জিনিস, অসীম, কিংবা, সংবাদ, বারংবার, সংবরণ, স্বয়ংবর, সম্বল, সম্বোধন, ম্রিয়মান, প্রণত, প্রণীত, পরিণীত, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন, কল্যাণ, ঋণ, গণ্য, নিপুণ, লবণ, তৃণ, জিগীষা; দুর্বিষহ, দুঃসহ, ফাল্গুন, গগন, পাষাণ, সুষুপ্ত, সুষমা, বর্ষণ, বিষণ্ণ, দোষ, বিশেষ, উল্লেখ, উচ্ছেদ, উচ্ছ্বাস, প্রশংসা, অধোগতি, মনোভাব, দুরবস্থা, উদ্ধত, ইতস্ততঃ, নীরস, নিরোগ, নিরীক্ষণ, দুস্থ, দুশ্চেষ্টা, ভাস্কর, ভাস্বর, নির্লজ্জ, উচ্ছৃঙ্খল, আভাস, মনঃপ্রাণ, মনপুত, মনোজ্ঞ, মনোবৃত্তি, শস্য, শ্মশ্রু, স্বশ্রু, সূত, স্যাতসেতে, স্বতন্ত্র্য, স্থৈর্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, সম্মান, মৃত্যু, করুন।

গ. বর্ণগত কারণেও বানানে ভুল হতে পারে। বর্ণসমষ্টি যথাযথ ও রেখাগত না হওয়ায় এই ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। যেমন—

শত্রু, চক্র, ক্রীড়া, ত্রুটি, অজ্ঞ, বিজ্ঞান, অঞ্জন, অঞ্জলি, সামঞ্জস্য, উপলব্ধি, উপস্থিত, বাঞ্ছনীয়, সঙ্গ, অতিরিক্ত, ভ্রূক্ষেপ, আরম্ভ, স্বপ্ন, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আস্থা, মুখস্থ, গ্রীষ্ম ইত্যাদি।

ঘ. সাদৃশ্যগত কারণেও বানানে ভুল হতে দেখা যায়। যেমন—

উৎসর্গ, দীপ, সাদা, স্মরণীয়, সমস্যা, ধ্বংস, মিটানো, স্মরণ, শরণ, ধরন, ধারণা, মত্ত, মর্ত্য, সার্থক, পরিস্ফুট, সদ্গতি, আর্তনাদ, নিরুদ্দেশ, শ্মশান, আশ্বাস, রহস্য, আজ্ঞা, তন্ময়, নীরবতা, স্বাতন্ত্র্য, উচিত, আহ্মদ, আহমেদ।

ঙ. বিদেশী শব্দের বানান ভুল। বিদেশী শব্দের বিশেষ করে আরবি, ও ফারসি শব্দের বানান যথাসম্ভব মূলের উচ্চারণ অনুরূপ হবে। নিচের বানানগুলো থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

আল্লাহ, মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ), ইসলাম, নামায বা নমায, কুরআন, খলীফা, হযরত, ফিরিশতা, রমযান, শিরক, নবী, রসূল, কিতাব, হাফিয, আহ্মদ, রমযান, হাসান, নিশান, আযম, আরব, যমীন, কওম, রহীম, মশরিক, মুরশীদ, মুরাদ, সালতানাত, মহফিল, হিলাল, জিনিস, ইসতিকবাল, মদীনা, রহমত, জান্নাত, ফিরদৌস, জুলজালাল, সিতারা, রহবর, তরকারী, তর্জুমান, শরীফ, ফারুকী, ফারসি, শহর, শিরনি, শাদবাদ, আলিশান, ইরান, শিরাজ, নার্গিস, রওশন, অ্যাসিড, স্টেডিয়াম, স্টেটসম্যান, জার্মান, স্ট্রীট, সিনেমা, টিকিট, ক্যাপসিউল, স্পেইস, সার্ভিস, মডুল, কমান্ড মডুল, লুনার মডুল, এয়ার হোসটিস, জেটবিমান, বোয়িং বিমান, মুক্তার উকিল, অ্যাডভোকেট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় জ এবং য-এর উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষণীয় নয়। কিন্তু আরবি এর জ এবং এর য-উচারণে বেশ কিছুটা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জ তালব্য বর্ণের অর্থাৎ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালুর সম্মুখ ভাগ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করে এই ধ্বনির উচ্চারণ করা হয় অনেকটা ইংরেজি Joy, Jealous, january-র মতো। যেমন, জালাল, আনজুমান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় য এর উচ্চারণ দন্ত্য বর্ণের ন্যায়—অর্থাৎ প্রসারিত জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্ত্য স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় অনেকটা ইংরেজি Zerbra, Zeal, Zone, Zeal ইত্যাদির Z র মতো যেমন—যমীন নিযাম —, মনযিল , যিয়ারত , হযরত , হয্যত ইত্যাদি।

ইংরেজি Z ও J–র উচ্চারণেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। Z-র উচ্চারণ দন্ত্য ধ্বনির ন্যায় অর্থাৎ dental (বাংলা ত ধ্বনির মতো) এবং J –এর উচ্চারণ তালব্য ধ্বনির অনুরূপ অর্থাৎ Palatal (বাংলা চ–বর্গীয় উচ্চারণের অনুরূপ। Zoo ও Joy শব্দ দুটির উচ্চারণে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ভাষা বিজ্ঞানে ধ্বনিতত্ত্ব কিংবা ভাষাতত্ত্বের শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভাষা যেখানে শেষ, মহাকাল সেখানে আঁড়ি পেতে আছে। সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় ভাষা, বদলে যায় উচ্চারণ; বদলে যায় শব্দের অর্থ ও ভাষার প্রয়োগ

সে এক নিঝুম রাত্রির কথা (She a nijhum ratrir khtha)

Phonenitical উচ্চারণের ভংগীতে লেখা একটি পূর্ণাংগ গল্পের বই প্রথম আমি ছাপি। বইটির নাম 'আর একটি বৈশাখি ঝড়' ('AR EKTI BAISHAKHI JHAR) বইটির খুব কদর হলো—সবাই খুব ভালো বললো। কিন্তু সবার মুখে একটি কথা—পড়তে গেলেই মনে হয়, প্রচণ্ড বানান বিভ্রাট এবং চোখে খুব লাগে আমার নিজের চোখেও লেগেছে, পড়তে গিয়ে হোঁচটও খেয়েছি। এর কারণ, অনভ্যাস। চোখের অনভ্যাস। চোখে ভীষণ লাগে।

প্রকৃতপক্ষে বানান সংশোধন ক্ষেত্রে চোখটা একটা বিরাট জিনিস। চোখে হোঁচট লাগলে সে বানান কতোখানি গ্রহণ যোগ্য হবে প্রচলিত বানানেই আমরা বেশি অভ্যস্ত। 'লক্ষ্মী' বাংলায় উচ্চারণে বানানের ভূমিকার সাথে হিন্দী উচ্চারণের প্রার্থক্য কি আমরা কখনো অনুভব করেছি। বাংলা ভাষায় বানানের সাথে আমাদের উচ্চারণের সম্পৃক্ততা যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা প্রচলিত বানানের ক্রীতদাস। আর মনে হয় ওটাই বোধ হয় আমাদের মতো জড়িয়ে আছে আমাদের জীবন প্রবাহে। এ থেকে বোধ হয় আমাদের মুক্তি নেই।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিবিজ্ঞান

বিরাট বিশাল সৃষ্টিজগতের একটি রহস্যময় সৃষ্টি ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি, যার অর্থবোধক দিকটি ভাষা বলে চিহ্নিত প্রাণিজগতের কোন্ কোন্ প্রাণীর ভাষা আছে, হয়তো জানা যায় না, কিংবা সবার ভাষা সবাই বুঝতে পারে না এটাও একটা কারণ হতে পারে — কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানবসমাজের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় কারণ ভাষা। আদি মানব কোন্ ভাষায় কথা বলতো যদিও জানা সম্ভব নয়, তবু তাদের ভাষা ছিলো, ভাব বিনিময়ের একটি মাধ্যম হিসেবে যা কাজ করতো, এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। কেননা, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দুটি শিশুকে মানব-সভ্যতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে দিলেও তাদের দুজনের ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধ্বনিই প্রাধান্য পায়, যদিও তার সাথে সাথে আকার-ইঙ্গিত, অঙ্গ সঞ্চালন, ঈশারা ইত্যাদি সামাজিক মানুষের চেয়ে তাদের কাছে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এটা মানবের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত একটি নিয়ামতস্বরূপ, যা হয়তো সব প্রাণীর মধ্যে বিলিয়ে দেয়া স্রষ্টার ইচ্ছা হয় নি। কিন্তু যে দুটি মানবশিশুর কথা বলা হলো, তাদের ধ্বনিগুলো কোন্ ভাষার অন্তর্ভুক্ত হবে, তা বলা যদিও খুবই শক্ত, কিংবা বলা যায়, সেই ভাষা কোনো একটি স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম নিতে পারতো, যদি তাদের থেকেই একটি নতুন সমাজ বা সম্প্রদায় গড়ে উঠবার সম্ভাবনা থাকতো।

আজকের পৃথিবীতে এসে আমরা কতো অগণিত ভাষার সন্ধান পাচ্ছি একেকটি ভাষার জন্ম এইভাবেই সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'Necessity is the mother of invention'— প্রয়োজনের তাগিদেই আবিষ্কার সম্ভব হয় বলে মানবের প্রয়োজনেই ভাষারও জন্ম হয়েছে। অবশ্য ভাষার জন্ম যেভাবেই হোক না কেনো, তা কোনো একটি বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ হয়ে কিংবা একটি বিশেষ পরিধির মধ্যে অবিকৃত রূপ নিয়ে বিরাজ করতে পারে না। তার পরিব্যাপ্তি, বিস্তৃতি এবং বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ নদীর স্রোতের মতোই গতিশীল এবং নদীর বাঁক পরিবর্তনের মতোই ভাষার প্রবাহে বাঁক পরিবর্তনের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। হয় উচ্চারণের দিক দিয়ে, ঝোঁক বা স্বরাঘাতের পরিবর্তনের দিক দিয়ে অথবা ধ্বনির বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে ভাষা সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে এরই ফলে একটি মাত্র ভাষা বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে। ভাষার বংশ পীঠিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে একটি মাত্র ভাষা এদিকে প্রচলিত ছিলো, যার নাম শতম্। তা থেকে কালক্রমে আলবানিক, আর্মানিক, বালটো-স্লাভোনিক এবং আর্য এভাবে বিকৃতির পর্যায়ে এসে স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে বহু শত স্তর পেরিয়ে আজকের বাংলা ভাষার জন্ম। আজকের বাংলার সাধারণ চলতি ভাষাই যে শেষ ভাষা, একথা বলাও সম্ভব নয়—এ থেকেও হাজারো উপভাষার জন্ম হবে, তাদের সমৃদ্ধির সাথে সাথে তারা একেকটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে — এটাই তো স্বাভাবিক। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলাদেশের বাংলা ভাষার

অঞ্চলগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেই এরই মধ্যে একেকটি আঞ্চলিক ভাষাকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী অনেকেই। যেমন, চট্টগ্রামের উপভাষাকে চট্টগ্রামবাসীরা যেমন তাদের স্বতন্ত্র ভাষার দাবিতে একে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট, তেমনি ময়মনসিংহের উপভাষার প্রতি ময়মনসিংহবাসীদের দাবি কম নয়। কিংবা সিলেট অথবা নোয়াখালিবাসীদের চিন্তায় তাদের উপভাষাগুলোর প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে তাদের দাবির অগ্রভাগে। এটাইতো স্বাভাবিক। আমাদের আজকের চলতি ভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভুবনসর কেন্দ্রিক এবং এর প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির ব্যাপারে সবচাইতে যার বেশি অবদান, তিনি প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সাহিত্যিকের সহযোগিতার ফলে তাঁর পথ খানিকটা সহজসাধ্য হয়েছিলো। ধ্বনিবিজ্ঞানে ভাষার এই বিবর্তনকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বলে ধরে নেয়া হয়। একই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরীকে দেখা যেতো, তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলার সময়ে কথ্য আঞ্চলিক বাংলাদেশের ভাষাকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা। ভাষাতাত্ত্বিক মুনীর চৌধুরী বিশ্বাস করতেন, ভাষার বিবর্তনে একদিন বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলো স্বীকৃতি পাবে। সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত প্রয়াস ছিলো তাঁর আঞ্চলিক ভাষার প্রতি অনুরাগ।

তবে একটি ভাষা থেকে উদ্ভূত উপভাষাগুলোর ব্যাপারে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মূল ভাষার অধিকাংশ গুণাবলী (যেমন, বাক্যগঠন রীতি, ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ-রেখা, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি) মোটামুটি একই রকম থাকে। মূল বাংলা থেকে উদ্ভূত বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার উপভাষার কিছু নমুনা দিচ্ছি এখানে —

বাংলা চলতি ভাষা

১. আমি ভাত খাই।
২. আমরা সাত ভাই-বোন পড়াশুনা করি।
৩. আমাদের শিক্ষায়তনে এ ঘটনা ঘটতে পারে না।
৪. রাত জেগে যাত্রা দেখি না আমরা।
৫. রোদ হয়, ঝড় হয়, খেকশিয়ালের বিয়ে হয়।

বরিশালের উপভাষা

১. মুই বাত খাই।
২. মোরা সাত ভাই-বোন লেহাপরা করি।
৩. মোগ ইস্কুলে এই রহম ব্যাপার ঘটতে পারে না।
৪. রাইত জাইগা যাত্রা মোরা দেহি না।
৫. রৌদ অয়, দেওআই অয়, পাতিহালের বিয়া অয়।

নোয়াখালির উপভাষা

১. আঁই ভাত খাই।
২. আমরা সাত ভাই-বোন লেয়া-ওরা করি।
৩. আঁরার ইস্কুলে ইয়া ঘটতি পারে না।

৪. রাইত জাইগ্গা যাত্র আমরা দেই ন।
৫. রইদ অয় ঝইর অয় হিয়ালের বিয় অয়।

রংপুরের উপভাষা

১. মুই ভাত খাই।
২. হামরা সাত ভাই-বোন লেখা-পড়া করি
৩. হামাদের স্কুলত এক্কা কাম হবার পারে না।
৪. আইত জাইগা যাত্রা হামরা দেখি না।
৫. ওদ হয়, ঝড়ি হয়, খেকশিয়ালের বিয়া হয়।

সিলেটের উপভাষা

১. আমি ভাত খ্বই।
২. আমরা সাত ভাই বইন লেখ্যাপড়া করি।
৩. আমরার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঅ এই লাখান ঘটনা ঘইত পারে না।
৪. রাইত জাগিয়া যাত্র আমরা দেখি না।
৫. রইদ অয়, বৃষ্টি অয়, খেক্ শিয়ালর বিয়া অয়।

এই উপমাগুলো থেকে মূল ধ্বনিগুলো উপভাষায় খানিকটা বিকৃত হলেও একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে কখনো সরে যায় নি, যা অন্য একটি পৃথক ভাষার সথে তুলনা করলে অনায়াসে ধরা পড়ে। এগুলোকে যদি ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করা হয় ; তাহলে দেখা যাবে বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর বিন্যাস যেমনি অন্য রূপ পাবে, তেমনি ধ্বনিগত দিক থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখায় আবদ্ধ হয়ে যাবে দুটো ভাষা :

১. I eat rice.
২. We seven brothers and sisters read and write.
৩. This cannot happen in our institute.
৪. We do not witness Jatra (opera) by waking in the night.
৫. Foxes marry while it rains in the sun.

এই বাক্যগুলোকে যদি ছকে ফেলে দেখানো যায়, তাহলে বাক্যগুলোতে পদবিন্যাসের দিক থেকে বাংলার উপভাষাগুলোর মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে। কেবলমাত্র শব্দগুলো বাক্যের অভ্যন্তরে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে যেখানে অধিকাংশ ব্যাপারে অভিন্নতা রয়েছে, তাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা না বলে বরং একটি মূল ভাষার উপভাষা বা (যেমন চট্টগ্রামের বা নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষা) অঞ্চলগত দিক বিচার করে আঞ্চলিক ভাষা বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা বেশি গ্রহণযোগ্য (যদিও প্রতিটি উপভাষাই কোনো না কোনো দিকে স্বতন্ত্র ভাষায় প্রতিষ্ঠা পাবার অঙ্গীকারাবদ্ধ)।

এই বিপুল বিশ্বে প্রতিনিয়ত ধ্বনির সৃষ্টি হয়ে চলেছে। প্রতি অণুমুহূর্তে একেকটি নতুন নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা সব ধ্বনিকে কাজে লাগাই না বা লাগানো সম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে। কিংবা বলা যায়, কাজে লাগালেও একবারের জন্যে লাগাই, কিন্তু তাকে ধরে

রেখে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন, এই মুহূর্তে আবেগের বশবর্তী হয়ে যখন আমি বললাম, 'সেঁজুতি, আমি তোমার প্রেমের প্রত্যাশী — তুমি ভালোবেসে আমাকে পথ দেখাও।' এই কথাগুলোর মাঝখানে যে ধ্বনিসমষ্টির সমন্বয় রয়েছে, তার একটি শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ রয়েছে, যে কারণে আমি যা বলছি, আরেকজনের কানে তা বাজছে, মর্মে গিয়ে প্রবেশ করছে এবং তা থেকে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু এ কথাগুলোর সাথে আবেগ জড়িত হওয়ায় প্রতিটি ধ্বনি কতো যে সূক্ষ্মভাবে বিলম্বিত, প্রকম্পিত বা সংক্ষিপ্তভাবে নতুন রূপ পাচ্ছে, যা পরবর্তী মুহূর্তে উচ্চারণ করলে নিঃসন্দেহে ভিন্নরূপ হবেই হবে। **"একই ধ্বনি মানুষ দুবার উচ্চারণ করতে পারে না"**— যদি ধ্বনিগুলোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয়, তাহলে কথাটা সত্যি বলে প্রমাণিত হবে। টেপ রেকর্ডারে পরীক্ষা ক'রে আমি দেখেছি, একই কবিতা পর পর আবৃত্তি করলেও এক রকম কখনো হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। ধ্বনির বাস কথোপকথনে — অতএব কথোপকথনে ধ্বনি সর্বদাই বিবর্তিত হচ্ছে। একটি মূল ধ্বনিকে বিভিন্ন মুখে উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা তাকে বিকৃত ক'রে ফেলছি। এইভাবেই প্রতিনিয়ত জন্ম হচ্ছে অসংখ্য ধ্বনির। এভাবে ধ্বনি দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সাজাচ্ছি আমরা মনের মতো ক'রে। কিন্তু ধ্বনির একটি অর্থবোধক দিক আছে, যাকে আমরা প্রয়োজনের দিক বলেও ধরে নিতে পারি। ধ্বনির এই অর্থবোধক দিকের অর্থ হলো, ধ্বনিকে আমরা কি করে কাজে লাগাই, সেই দিক। অর্থাৎ আমাদের উচ্চারিত সব ধ্বনিকে আমরা সর্বজনগ্রাহ্য (বা অন্যজনগ্রাহ্য) ভাষার মধ্যে ফেলে তাকে অর্থময় ক'রে তুলি। এভাবে যে ধ্বনিগুলোকে ভাষায় ব্যবহার ক'রে ভাষাকে অর্থময় করা হয় তারই নাম ধ্বনি (sound)। এই ধ্বনিগুলোর উৎপত্তি হয় আমাদের প্রচেষ্টায়। আমাদের ফুসফুস থেকে ঠেলে দেয়া নিশ্বাসবায়ু শ্বাসনালীর (Trachea) মধ্য দিয়ে এসে কণ্ঠনালীতে (Larynx) পড়ে এবং সেখান থেকে গলা ও নাকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। অবশ্য এই নিশ্বাসবায়ুকে গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত পথে নানাভাবে মুখের পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে ইচ্ছা করলে নানাভাবে পরিবর্তিত করতে পারি। এই ইচ্ছাকৃত বাধা সৃষ্টির ফলেই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। আর এই বাধা পাওয়ার জায়গা অনুসারে ধ্বনির প্রকারও পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেকটি ধ্বনির একেকটি রূপ থাকে। এই রূপানুযায়ী তাকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মৌলিক ধ্বনির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, তা অন্য ধ্বনির চেয়ে শ্রুতির দিক দিয়ে আলাদা হবে এবং নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা তাকে রাখতে হবে — তবেই তা মৌলিক ধ্বনি হবে। কেবলমাত্র ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য থাকলেই তা মৌলিক ধ্বনি হিসেবে কখনোই পরিগণিত হবে না।

তবে ভাষায় ব্যবহারের সময় কিংবা কথোপকথনে বিশেষ মৌলিক ধ্বনিও অন্য ধ্বনির মাঝে বা কাছাকাছিভাবে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্নতা, বিকৃতি ও পরিবর্তন লাভ করতে পারে। সেই মূলধ্বনির বিকৃতিতে লক্ষণীয় যে, পরিবর্তিত বা বিকৃত ধ্বনি অন্য কোনো অর্থবোধক ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা, যদি ক'রে থাকে তাহলে তা নতুন মৌলিক ধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হবে ; আর তা না হলে ঐ বিকৃতিজাত ধ্বনির সামান্য সামান্য পরিবর্তনকে সহধ্বনি বা ধ্বনিপূরক (Allophone) নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতে মূল ধ্বনিকে বলা হয় Phoneme. এইভাবে দেখা যায়, প্রতিটি মূলধ্বনির (Phoneme) অনেকগুলো করে সহধ্বনি বা ধ্বনিপূরক থাকতে পারে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

একটি মূল ধ্বনি 'অ' ও 'ক' ; ভাষায় ব্যবহার করলে তা কতোখানি বিভিন্নতা পেতে পারে তা দেখানো হচ্ছে :

১. কতো দিন পর তোমার সাথে দেখা!
২. কখনো আমি যাবো না।
৩. কর্তাই কর্ম সম্পাদন করে।
৪. আজকাল কনে দেখার হিড়িক পড়েছে।
৫. ঘরের কোণে বসে বসে এতো করো কি! ইত্যাদি।

এখানে 'ক' –এর সাথে 'অ' ধ্বনিরও বিকৃতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এভাবে প্রতিটি মৌলিক ধ্বনিকে ভাষায় ফেলে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রতিটি মৌলিক ধ্বনির কয়েকটি করে সহধ্বনি থাকে। এই সহধ্বনিগুলোকে মৌলিক ধ্বনি বললে কি হতো? এ রকম প্রশ্ন ওঠা অবিচিত্র কিছু নয়। মৌলিক ধ্বনি বা মূল ধ্বনির সাথে সহধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জের মূল পার্থক্য অর্থাৎ মূল ধ্বনি নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ বা ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে সহধ্বনিগুলোর এই গুণ নেই, এই পার্থক্যজনিত কারণের জন্যেই সহধ্বনি মৌলিক ধ্বনি নয়। একটি মূলধ্বনির কয়েকটি সহধ্বনি থাকে, আর সহধ্বনিগুলো সব সময়ে মূলধ্বনি থেকে সৃষ্ট ও তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবীর সব ভাষাতেই ধ্বনিগুলোর দুই ভাগ — স্বরধ্বনি (vowel sound) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant sound)। বাংলার ধ্বনিগুলোরও তেমনি দুইভাগ — স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। প্রথমে স্বরধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু আলোচনার আগে আমাদের বাক্-প্রত্যঙ্গের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ধ্বনির শ্রেণী বিভাগে যাবার আগে আমাদের বাক-প্রত্যংগের সাথে পরিচিতি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাক্-প্রত্যঙ্গ পরিচিতি

মানুষের বেঁচে থাকাটা সত্যি রহস্যময়। নানান কিছুর মতোই শ্বাসপ্রশ্বাস বেঁচে থাকার ব্যাপারে যে কি গুরুতর দায়িত্ব বহন করে চলেছে, তা অকল্পনীয়। আমরা বাতাসের অক্সিজেন অহরহ নাক (এবং কখনো মুখ) দিয়ে টেনে নিই ফুসফুসে, আবার সেখান থেকে বাতাসের সাথে নাইট্রোজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিই। কিন্তু ছাড়বার সময় এই বাতাস গলনালী দিয়ে বেরিয়ে এসে কিছু শ্বাসনালী দিয়ে সরাসরি (কখনো মধ্যপথে বাধা পেয়ে) বেরিয়ে আসে, আর কিছু মুখবিবরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবার পথে বিভিন্ন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন রকম ধ্বনির উৎপাদন করে। এই ধ্বনি আমাদের সুস্থভাবে সমাজে বাস করার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে ভাষা গঠন করে। এই ফুসফুস থেকে বাতাস কিভাবে কোথায় স্পর্শিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলে কি কি ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে তা সম্ভব হয়, এ সম্পর্কে জানবার কৌতূহল মানুষ মাত্রেরই হওয়া স্বাভাবিক। তাই ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাসের গতিপথ তথা আমাদের গলনালী, মুখবিবর,

দাঁত, জিহ্বা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে যতোটা সম্ভব এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাগুলো পাওয়ার চেষ্টা করছি :

১. মধ্যচ্ছদা (diaphragm)
২. ডান ফুসফুস (right lung)
৩. বাম ফুসফুস (left lung)
৪. শ্বাসনালী (bronchial tube)
৫. বায়ুনালী (wind-pipe)
৬. স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis)
৭. অধিজিহ্বা (epiglottis)

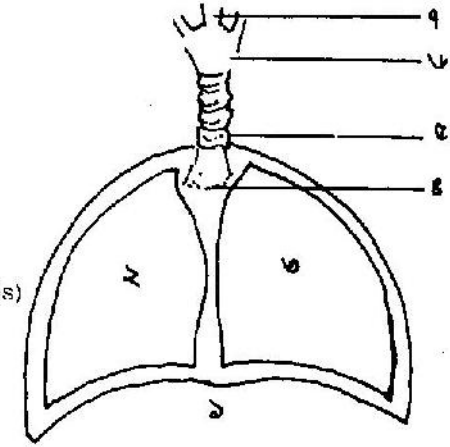

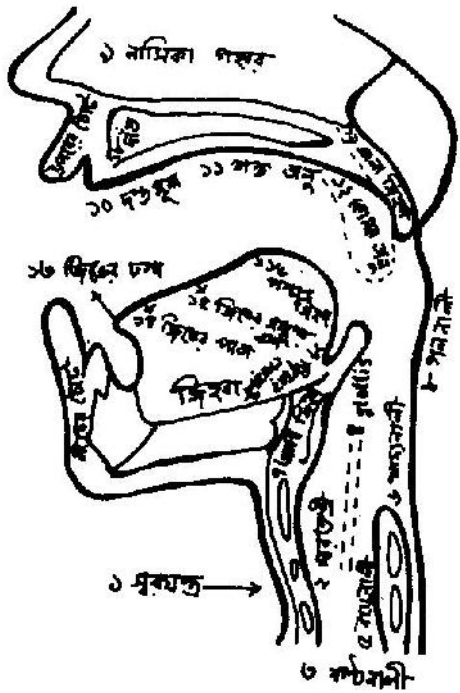

১. স্বরযন্ত্র (larynx)
২. স্বরতন্ত্রী (vocal cords)
৩. কণ্ঠমণি (adanis apple)
৪. স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis)
৫. বায়ুনালী (wind-pipe)
৬. খাদ্যনালী (food-passage)
৭. অধিজিহ্বা (epiglottis)
৮. গলনালী (pharynx)
৯. নাসিকা গহ্বর
১০. দন্তমূল (teeth-ridge)
১১. শক্ত তালু (hard palate)
১২. কোমল তালু (soft palate)
১৩. জিভের ডগা (tongue tip)
১৪. জিভের পাতা (blade)
১৫. জিভের সম্মুখভাগ (front of tongue)
১৬. পশ্চাৎ জিহ্বা (back of tongue)
১৭. জিহ্বামূল (জিভের গোড়ালি) (tongue root)
১৮. দাঁত (tooth)
১৯. আলজিহ্বা

বাক-প্রত্যঙ্গের নাম এবং কোন্ কোন্ বাক-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আমাদের ভাষার কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার একটি মোটামুটি খসড়া তৈরি করলে নিম্নরূপ হবে :

১. স্বরযন্ত্র (larynx) ; ২. স্বরতন্ত্রী (vocal cords) ; ৩. কণ্ঠমণি (adanix apple) ; ৪. স্বরোষ্ঠ (vocal lips) ; ৫. স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis) ; ৬. বায়ুনালী (wind-pipe) ; ৭. খাদ্যনালী (foodpassage) ; ৮. অধিজিহ্বা (epiglottis) ; ৯. জিহ্বার গোড়ালি বা মূল (root) ; ১০. গলনালী (pharynx) ; ১১. আলজিহ্বা বা উপজিহ্বা (uvula) ; ১২. দাঁতের মাড়ি (teeth-ridge) ; ১৩. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বা অগ্রতালব্য (post alveolar or prepalatal) ; ১৪. দন্তমূল (convex) ; ১৫. শক্ত তালু (hard palate) ; ১৬. উপরের তালু (upper palate) ; ১৭. কোমল তালু (soft palate) ; ১৮. জিভের ডগা (tongue tip) ; ১৯. জিভের পাতা (blade) ; ২০. জিহ্বাগ্র (front of tongue) ; ২১. পশ্চাৎ জিহ্বা (back of tongue) ; ২২. জিহ্বামূল (tongue root) ; ২৩. উচ্চারক (articulator) ইত্যাদি।

এবারে কোন্ কোন্ বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং সে-সব ধ্বনির নামগুলো এখানে উধৃত করা হলো :

১. **ওষ্ঠ্য ধ্বনি :** (ক) ঠোঁট বন্ধ করে কিংবা (খ) নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলোর নাম ওষ্ঠ্যধ্বনি (bilabial)। যেমন :

(ক) বাংলার প-বর্গীয় ধ্বনি (প, ফ, ব, ভ, ম) ;
(খ) আরবি (و) ;
(গ) ইংরেজি (w) ইত্যাদি।

২. **দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি :** নিচের ঠোঁট ওপরের পাটি দাঁতের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে-ধ্বনি পাওয়া যায়, তার নাম দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি (labio-dental sound)। যেমন, ইংরেজি (f, v) ইত্যাদি।

৩. **দন্ত্য ধ্বনি :** জিহ্বাগ্রভাগজাত (apical sound) ধ্বনি ওপর পাটি দাঁতের সাথে ডগা লাগিয়ে যে-সব ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তার নাম দন্ত্য ধ্বনি (dental sound)। যেমন, বাংলা ত-বর্গীয় ধ্বনি (ত, থ, দ, ধ)

৪. **অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি :** আর জিভের ডগা দু'পাটি দাঁতের মাঝে স্থাপন করার ফলে যে-সব ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তার নাম অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি (inter-dental sound) যেমন, ইংরেজি th, the ইত্যাদি

৫. **দন্তমূলীয় ধ্বনি :** জিভের ডগা ওপরের পাটি দাঁতের গোড়া বা দন্তমূল স্পর্শ করার ফলে যে-সব ধ্বনির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় দন্তমূলীয় ধ্বনি (alveolar)। যেমন,

(ক) বাংলা—ন, র, ল ধ্বনি ;

(খ) ইংরেজি l, d, n, r, s, z ইত্যাদি ধ্বনি।

৬. **দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য ধ্বনি :** জিভের ডগা সামান্য পাল্টে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ করায় ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি (alveolo-retroflex sound)। যেমন,

ট বর্গীয় ট, ঠ, ড, ঢ এবং ড় ঢ় ধ্বনি।

৭. পশ্চাৎ **দন্তমূলীয় ধ্বনি :** জিভের পাতা দন্তমূল স্পর্শ করলে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তার নাম দন্তমূলীয় ধ্বনি (post alveolar sound)। যেমন, বাংলা শ।

৮. **অগ্রতালব্য ধ্বনি :** জিভের পাতা ও তার সংলগ্ন সম্মুখভাগ পশ্চাৎ দন্তমূল বা অগ্রতালু চেপ্টাভাবে স্পর্শ করলে এক ধরনের ধ্বনি নির্গত হয়। তার নাম অগ্রতালব্য (pre-palatal sound) বা প্রশান্ত দন্ত-মূলীয় (dorse-alveolar sound) ধ্বনি যেমন,

বাংলা চ-বর্গীয়—চ, ছ, জ, ঝ

৯. **জিহ্বামূলীয় ধ্বনি :** পশ্চাৎ জিহ্বা কোমল তালুকে স্পর্শ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তার নাম জিহ্বামূলীয় পশ্চাৎ তালুজাত বা কোমল তালুজাত ধ্বনি (velar sound)। যেমন,

বাংলা ক বর্গীয় ধ্বনি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ

১০. **আলজিহ্বা ধ্বনি :** আলজিহ্বা ও পশ্চাৎ জিহ্বার সংস্পর্শে যে ধ্বনির জন্ম, তার নাম আলজিহ্বা ধ্বনি (uvular)। যেমন,

ফরাসি ও জার্মান (র)

১১. **গলনালীয় ধ্বনি :** জিহ্বার গোড়ালির সংকোচনের ফলে গলকক্ষে বায়ু পথের সংকীর্ণতাজনিত যে সব ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাকে বলে গলনালীয় ধ্বনি (guttural sound)। যেমন,

আরবি (ح، خ، غ، ع) ইত্যাদি।

১২. **কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি :** স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সংস্পর্শজাত ধ্বনির নাম দেয়া হয়েছে কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি guttural sound) বা আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত বা স্বরযন্ত্র-মধ্যবর্তী পথজাত (glottal. laryngeal sound) যেমন,

বাংলা—হ, ঃ ;

আরবি ء ইত্যাদি

কোনো একটি ভাষার ধ্বনি পৃথকভাবে কিংবা বাক্-প্রবাহে ব্যবহারকালে কমপক্ষে দুইটি উচ্চারকের (articulator) প্রয়োজন হয়। ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারণ এবং তার বিশ্লেষণ যতো সহজ, ভাষা প্রবাহে তার উচ্চারণ অনেক বেশি জটিলতাপ্রাপ্ত হয় বলে তার বিশ্লেষণও অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই ধ্বনি ভাষায় ব্যবহারে বিভিন্ন ধ্বনির সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি এবং বিকৃতি লাভ করে। সে ক্ষেত্রেও একাধিক (কমপক্ষে দুটি) উচ্চারকের প্রয়োজন হয়। তাই অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "... বাক্ স্রোতধারায় বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণে মানুষের সংশ্লিষ্ট বাক্-প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত তার শিক্ষা দীক্ষা, জন্মগত রুচি ও পরিবেশ শাসিত সমগ্র ব্যক্তিত্বই জড়িত হয়ে পড়ে। বাক্ সোতের মধ্যস্থিত একটি ধ্বনি উচ্চারণে দুটি বিশেষ উচ্চারক সক্রিয় হলেও বাক্-প্রবাহের ধ্বনি স্রোত উৎসারণে ব্যক্তি-মানুষের সমগ্র সত্তাই এমনিভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।"

বাংলা স্বরধ্বনি

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে এগারোটি স্বরধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায় — অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। এর অতিরিক্ত আরো দুটি স্বরধ্বনির অস্তিত্ব বাংলা ব্যাকরণে ছিলো 'অ্যা' ও 'অ্যা'। যদিও এই ধ্বনি দুটো আজকালকার সাধারণ ব্যাকরণেও অপ্রচলিত হিসেবে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, বাকি এগারোটি স্বরধ্বনি প্রসঙ্গেও আজকের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার করে তা কতোগুলো, কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে মূল স্বরধ্বনি বলে বিবেচিত হবে, তা দেখবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি বলে করি।

মূলধ্বনি নির্ণয় করার জন্যে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা সহজ যে পদ্ধতি খুঁজে বের করেছেন তার নাম পাঠ প্রতিকম্পন বা substitution within a text. এই পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলো শব্দের শুধু স্বরধ্বনি বদলে দিয়ে, অন্যভাবে বলা যায়, এই স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়া গেলে তা একেকটি মূল স্বরধ্বনি হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। এইভাবে বিচার করলে বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা দাঁড়ায় আটটি। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা এবং ঔ এই আটটি স্বরধ্বনির সন্ধান পেয়েছেন। ইতিপূর্বে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় মোট সাতটি মূল স্বরধ্বনির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে অ, আ, ই, উ, এ এবং ও এগুলো প্রচলিত ব্যাকরণে স্বীকৃত এবং যেহেতু উচ্চারণের দিক থেকেও এদের যেমন পৃথক সত্তা রয়েছে নতুন অর্থবোধক শব্দ নির্মাণেও এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে ঠিক ততোখানি। যেমন —

অ – অজ, অমর, অনন, অমানুষ

আ – আম, আমার, আশা, আকাঙ্ক্ষা

ই – ইট, ইতি, ইত্যাদি, ইহাদের

উ – উট, উন্নত, উৎসব, উৎসাহ

এ – এই, এসো, এখানে, এসেছে

ও – ওটা, ওখানে, ওগো, ওঠো

তাহলে এই ছ'টির অতিরিক্ত আমাদের বর্ণমালা অনুযায়ী আরো ছটি স্বরধ্বনি অবশিষ্ট থাকলো ঈ, ঊ, ঋ, ৯, ঐ, ঔ। এখানকার ৯ সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় বলে দেয়া যায়, আমাদের বর্তমান ভাষায় ৯-এর বর্ণগত রূপ থাকলেও ধ্বনি হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ পড়ার সময়ও আমরা এভাবেই পড়ি। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা শুরুও হয়েছিলো এইভাবেই। অর্থাৎ ই-কে এবং উ-কে দীর্ঘ ক'রে পড়লেই এই ধ্বনির আগমন হবে, তার আগে নয়। কিন্তু দেখা যায়, ভাষা যেহেতু ভাবের বাহন অতএব ভাবকে প্রকাশ করাই হয় ভাষার কাজ। ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগ - উচ্ছ্বাস অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের সবটুকু কলাকৌশল ভাষার সাথে মিশে যায়। এ কারণেই যখন আবেগময় কণ্ঠে প্রেমিকার প্রার্থনায় নিবেদন করি 'তুমি অমর (অ-ম-র) হয়ে থাকো ; এখানে অমরের 'অ' যথেষ্ট দীর্ঘ। তেমনি, 'তুমি জানো লক্ষ্মী, তুমি (তু-মি) কতো সুন্দর (সু-ন্দ-র), এখানে তু (তু+উ) এবং সু (স+উ) 'উ'-কার যথেষ্ট দীর্ঘ। 'অ'-কার বা 'আ'-কারকে যথেষ্ট দীর্ঘ ক'রে উচ্চারণ করলেও তার আলাদা কোনো ধ্বনিচিহ্ন বা বর্ণ নাই। কিন্তু ই-কারের রয়েছে ঈ ; উ-কারের দীর্ঘ রূপের বর্ণমালার চিহ্ন ঊ। কিন্তু ভাষা যদি ভাবেরই বাহন হয়ে থাকে, আর ভাবকে যদি ধরে রাখার মাধ্যম হয়ে থাকে বর্ণমালা সেখানে ই-কে হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে উচ্চারণের জন্যে লিপি-চিহ্ন থাক বা না থাক, আবেগের তারতম্যে তা উচ্চারিত হবেই। বরং আবেগকে মুখ্য করাই বাঞ্ছনীয়। সেখানে অযথা দীর্ঘ উচ্চারণের জন্যে পৃথক একটি লিপির যেমন কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনি মৌলিক বা মূলধ্বনি হিসেবে তার পৃথক অস্তিত্ব খুঁজবার চেষ্টা করাটাই নিরর্থক। ধ্বনি হিসেবে তার সংখ্যা একের বেশি নয় — ভাষায় ব্যবহৃত হলে হ্রস্ব হয়ে দীর্ঘায়িত হয়ে প্রতিটি ধ্বনিই উচ্চারিত হতে পারে। এজন্যে তারা স্বতন্ত্র ধ্বনিতে পর্যবসিত হয় না।

যেমন, ইট = (ই+ট) আর ঈদ = (ঈ+দ) — এখানে লিপিতে আলাদাভাবে অংকিত করলেও উচ্চারণে একটি মাত্র মৌলিক ধ্বনিই কোথাও হ্রস্ব হয়ে (ইট) আবার কোথাও দীর্ঘায়িত হয়ে (ঈদ) উচ্চারিত হচ্ছে। অতএব ই এবং ঈ-কে কখনোই স্বতন্ত্র মূলধ্বনির মর্যাদা দেয়া যাবে না। এভাবে বিচার করলে বরং ঈ-কে দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong)[১] বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যেমন,

বাড়ী (বাড়-ই-ই) ; গাড়ী (গাড়+ই+ই), পাখী (পাখ+ই+ই)। অবশ্য এই 'বাড়ী' 'বাড়ি' এভাবে লিখলেও পড়বার সময় আমরা ঠিকই দীর্ঘ 'ঈ' ক'রে উচ্চারণ করি। মূলধ্বনি ই-র দ্বিত্ব না বুঝিয়ে এখানে দীর্ঘ বুঝাচ্ছে। অতএব দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে না বিবেচনা করে একই ধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ হিসেবে 'ই' এবং 'ঈ' কে কেবলমাত্র 'ই' হিসেবে একটি মূল স্বরধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা অধিকতর সঙ্গত। 'ই'-র দ্বিত্ব হওয়ায় যেখানে তা যৌগিক স্বর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তার নমুনা এখানে দিচ্ছি। যেমন,

দিই = (দি+ই) = ওটা কখোনোই আমি তোমাকে দিই নি।
আমিই = (আমি+ই) = ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।
যাবিই = (যাবি+ই) = যাবিই যদি, তাহলে আর দেরী ক'রে কি হবে।

এসব ক্ষেত্রে 'ই' ধ্বনির দ্বিত্ব হওয়ায় যৌগিক স্বরধ্বনি বা diphthong হচ্ছে।

---

১ দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong) সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, উ এবং ঊ এর মধ্যেও যে ব্যবধান তা কেবলমাত্র ধ্বনি হ্রস্ব ও দীর্ঘতার ব্যবধান, অতএব মূলধ্বনি হিসেবে এখানেও আমরা 'উ' ধরে নিতে পারি ; এর দীর্ঘতাসূচক ঊ-র প্রয়োজন উ-র সাহায্যে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া সম্ভব বলে আমরা ভাষার বর্ণমালা থেকে 'ঊ'-র অবলুপ্তি কামনা করছি।

ঋ সম্পর্কে যে বর্ণটির চিহ্ন বর্ণমালায় দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনধ্বনি 'র'-এর পর্যায়ভুক্ত এবং র-এর সংকেতিক চিহ্ন ' ' এবং ' ' ফলার একটি বলে আমরা এর আলোচনা ব্যঞ্জনধ্বনির আলোচনার জায়গায় করতে চাই।

তাহলে অবশিষ্ট ঐ (ঐক্য, ঐরাবত) এবং ঔ (ঔষধ, ঔষধালয়) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মূলধ্বনি হিসেবে বিচার করার আগেই ঐ (ও+ই) এবং ঔ (ও-উ)-কে যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, মূল স্বরধ্বনি ও এবং ই-র সমন্বয়ে গঠিত ঐ (ওই দেখা যায় তালগাছ, ওই আমাদের গাঁ) এবং ও এবং উ র সমন্বয়ে গঠিত ঔ (ওউষধি ফল পাকলে মরে)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটো ক'রে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে একে ভাষায় স্থান দান করেছে বলে এর যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বিস্বরধ্বনি বা diphthong.

এখন প্রশ্ন ওঠে, আমাদের প্রবহমান ভাষায় যেসব ধ্বনি রয়েছে, তার মধ্যে মোট স্বরধ্বনি কটি এবং তাদের ধ্বনি-চিহ্ন বা লিপি বা বর্ণ কি রকম? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এখানে আলোচিত অ, আ, ই, উ, এ, ও — এই ছয়টি স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত এবং বর্ণ-চিহ্নও এদের সংস্কৃতের অনুসরণে প্রচলিত রয়েছে (অবশ্য অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে, যার নমুনা-চার্ট এই গ্রন্থের শেষের দিকে সংযোজিত হলো) ; কিন্তু এ ছাড়াও আমাদের লিপিতে নেই, অথচ আমাদের ভাষায় রয়েছে এমন দুটো স্বরধ্বনির ব্যবহার আমরা অহরহ ক'রে চলেছি ; তা হলো, অ্যা এবং ও।

এ > অ্যা :
এক > অ্যাক : আমি তাকে অ্যাক (এক) হাজার টাকা দিয়েছি।
দেখ > দ্যাখ : দ্যাখ, দ্যাখ, ছেলেটা কি সুন্দর গাড়ি চালায়।
বেলা > ব্যালা : এতো ব্যালা ক'রে তুমি ঘুম থেকে ওঠো।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক এই 'অ্যা' ধ্বনির প্রয়োগ খুব বেশি যেমন ট্যাকা (টাকা), ব্যাকা (বাঁকা) ইত্যাদি।

ধ্বনি হিসেবে 'অ্যা' কোনো মূল ধ্বনির বিকৃত রূপ নয় বরং আমাদের ভাষায় এই ধ্বনিটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত এবং নতুন নতুন অর্থ জ্ঞাপনেও এর ভূমিকা যথেষ্ট। এ কারণে 'অ্যা' বাংলা ভাষার একটি মূল স্বরধ্বনি এ ব্যাপারে রায় দান অযৌক্তিক নয়।

আমাদের ভাষায় আরো একটি ধ্বনির ব্যবহার আমরা ক'রে থাকি। সেটা হলো ও' যেমন,

১. তুমি বিয়ে করবে জানলে আমি ক'নে দেখতাম।
২. কাল সুখে ছিলে, আজ বনে বনে ঘুরে বেড়াও
৩. আমি ব'লে দিতে পারি, তারপর জানি না
৪. রমা চ'লে গেলে আমি বহুক্ষণ কেঁদেছিলাম।

এখানে 'ক'নে', 'বনে', 'বলে', 'চলে' প্রভৃতি শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর সাথে যে স্বরধ্বনির সংযোগে শব্দ তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমাদের বর্ণের অন্তর্গত অ এবং ও ধ্বনির উচ্চারণগত আকারের মাঝামাঝি আরেকটি বিশেষ ধ্বনি আমরা পাচ্ছি ; অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই তাকে অভিশ্রুত ও' বলে অভিহিত করেছেন। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে —

তুমি ঘরের কোণে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? (ও')
তুমি ক'নে দেখেছো যে, বিয়ের কথা বলছো? (ও')
তুমি কথা দিয়ে কথা রাখো না কেনো? (অ)
নীলু তার বোনের সাথে বেড়াতে যাবে। (ও)
শিলু কনক'নে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলো। (ও')
নীলু কত্তো কথা বললো। (অ)

তাহলে অ এবং ও–র অতিরিক্ত এবং এদের মাঝামাঝি আরেকটি ধ্বনির সন্ধান আমরা পাচ্ছি, যার নাম দেয়া হয়েছে অভিশ্রুত ও' অর্থাৎ অভিশ্রুতির ফলে এই ধ্বনিটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বলে হাই সাহেব ধারণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভাষার এই ধ্বনিটির লিপি নেই। অতএব যে কোনো নামেই অভিহিত করলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে এটা স্বাভাবিক। তবু যদি এই নাম সংক্ষিপ্ত এবং অন্যান্য ধ্বনিলিপির কাছাকাছি হয় তাহলেই বোধহয় সুবিধে হয় এবং ভাষাকে সহজ ও গতিশীল করাই যখন আমাদের আধুনিক মানসিকতা, তাহলে আমার মনে হয়, এর আলাদা কোনো লিপি তৈরি করা উচিত অথবা একে আমরা ও' লিখে সাধারণের বুঝবার জন্যেও ও' (ও' দুই বা ও–২) এভাবে বোধগম্য ক'রে তুলতে পারি, যা পরবর্তীকালে প্রকৃত উচ্চারণগত ধ্বনি হিসেবে (যেমন, এ, ও ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় আ এবং ই–র প্রায় মধ্যবর্তী আইজ>আজ, কাইল>কাল ইত্যাদি উচ্চারণে আরেকটি ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকে এই 'আ' কে মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। কিন্তু এই 'আ' কোনো শব্দের অর্থগত দিক থেকে 'অ'–র সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে কোনো নতুন শব্দের সৃষ্টি করতে পারে না। এ কারণে একে মৌলিক স্বরধ্বনি না বলে বলা উচিত সহধ্বনি বা allophone। যেমন, আইজ, এবং আজ এখানে অর্থগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে না। তেমনি,

কাইল এবং কাল
রাইত এবং রাত
কাইত এবং কাত ইত্যাদি

তাহলে আমাদের ভাষায় মোট স্বরধ্বনির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে আট — অ, আ, ই, উ, এ, ও, আ্যা এবং ও'। অবশ্য ঠোঁট ও জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী এগুলো সাজালে এভাবে সাজাতে হয় : ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, ও', উ। এদের প্রথম তিনটি অর্থাৎ ই, এ, অ্যা, সম্মুখ পর্যায়ের (front) এবং শেষ চারটি অ, ও, ও', উ পশ্চাৎ পর্যায়ের (back) মধ্যে ফেলা যাবে। এবং আ–র পর্যায় হবে সম্মুখ ও পশ্চাতের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে।

ভাষার ধ্বনি বিচারের সুবিধের এবং সারা পৃথিবীর ভাষাগুলোর সুষ্ঠু বিশ্লেষণের জন্যে আন্তর্জাতিক যে ধ্বনিলিপির সৃষ্টি করা হয়েছে তার ছকে ফেলে বাংলা ভাষার স্বরধ্বনির

বিচার করলে বোধ হয় এর প্রকৃত অবস্থান এবং উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক এই ধ্বনিলিপি কোনো একটি বিশেষ ভাষাকে কেন্দ্র করে করা হয় নি। কেবলমাত্র বিশ্লেষণের সুবিধের জন্যেই তা মৌলিকভাবে উদ্ভাবন করেছেন ধ্বনিবিজ্ঞানীরা। ছকটি এভাবে আঁকা যেতে পারে :

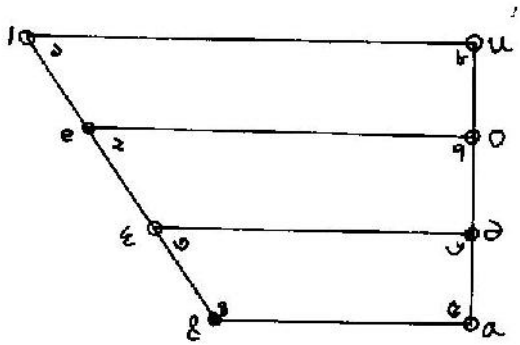

অংকিত ছকে নির্দিষ্ট স্বরধ্বনিগুলোর ধ্বনিবিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন Cardinal vowel বা কার্ডিন্যাল ভাউয়েল বা মৌলিক স্বরধ্বনি। এই ছকে লিপিচিহ্ন স্থাপন করে কিংবা মুখবিবরের যথাযথ ছবি এঁকে বৈজ্ঞানিক সততার যতই চলে ঠিকই, কিন্তু স্বরধ্বনির অবস্থান নির্ণয় সত্যিই দুরূহ। তবে লাভ এইটুকু, বুঝবার সুবিধে এতে অনেকখানি সহজ হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান বিচার করে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণয় করলে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণীত হবে :

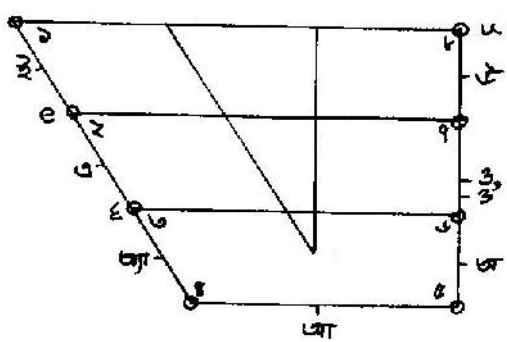

কার্ডিন্যাল বা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর সঙ্গে তুলনায় বাংলার স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান হলো : ই (১ ও ২-এর মাঝখানে) ; এ (২ ও ৩-এর মাঝখানে) ; অ্যা (৩ ও ৪ -এর

মাঝখানে) ; আ (৪ ও ৫–এর মাঝখানে —৫–এর দিকে হেলে থাকার প্রবণতা) ; ও (৬ ও ৭ এর মাঝখানে) ; ও' (৬ ও বাংলা ও–র মাঝখানে) এবং উ (৭ ও ৮ এর মাঝামাঝি)।

মৌলিক সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে জিভের সম্মুখভাগের আকৃতির ক্রমনিম্নগামী রূপটিকে কয়েকটি বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করা হলে যা দাঁড়াবে এবং তার সাথে বাংলা সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণীত হবে তার আকৃতি নিচে দেয়া হলো :

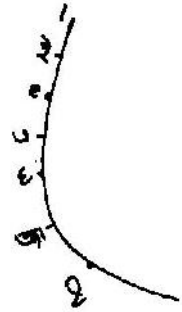

এবং পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান এভাবে নির্ণয় করে বাংলা পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নিম্নভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে :

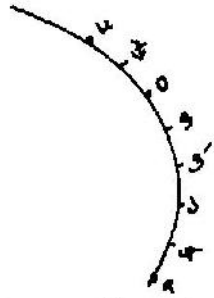

এই দুটো রেখাচিত্র একত্রিত করলে পূর্ণচিত্র যা দাঁড়াবে, তাতে পুরো স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণীত হতে পারে :

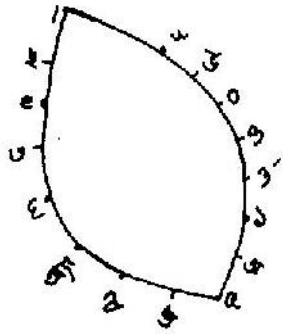

বাংলা স্বরধ্বনি সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে উচ্চারণের সময় ঠোঁটের অবস্থানের উপর ভিত্তি ক'রে স্বরধ্বনি বিচারের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, আমাদের বিচারেও তাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় :

ই] এদিক থেকে ই-র অবস্থান দাঁড়াচ্ছে—ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত (spread) কিংবা নির্লিপ্তও হতে পারে এবং সে অনুপাতে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ (opening between the jaws) সংকীর্ণ থাকবে।

এ] এ-এর উচ্চারণে ঠোঁট নির্লিপ্ত থেকে ঈষৎ প্রসৃত (from neutral to slightly spread) হতে পারে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সংকীর্ণও নয়, খোলাও নয় (opening between the jaws : medium) এমনিভাবে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে।

অ্যা] অ্যা-র উচ্চারণেও ঠোঁটের অবস্থা নির্লিপ্ত থেকে প্রসৃত এবং চোয়ালদ্বয় মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে

আ] আ-র উচ্চারণে ঠোঁট থাকে নির্লিপ্ত এবং দুই চোয়াল মাঝামাঝি অবস্থা থেকে কিছু প্রশস্ত (medium to wide) হয়।

অ] অ-র উচ্চারণে ঠোঁট দুটি থাকে বেশ খোলা অথচ বেশ গোলাকারও হয় ; পারিভাষিক দিক থেকে যাকে 'বিবৃত এবং কুঞ্চিতের মাঝামাঝি (between open and close lip-rounding) বলা যেতে পারে এবং দু' চোয়ালের মাঝের পথও খোলা থাকে তেমনি মাঝামাঝিভাবেই

ও] ও-র উচ্চারণে ঠোঁট হয় গোলাকার, কিন্তু ছুঁচলো হয়ে (rounded with no protrusion) সামনে বেড়ে যায় না ; দু' চোয়ালের মাঝপথের ফাঁকটুকু থাকে সংকীর্ণ।

ও'] ও'-র উচ্চারণে ও-র তুলনায় ঠোঁট দুটো গোলাকার হয় অপেক্ষাকৃত কম ; দু' চোয়ালের মাঝের ফাঁকের বিশেষ তারতম্য হয় না। ও' উচ্চারণে জিভের পশ্চাৎভাগ যতোখানি উঁচু হয়, ও-র বেলায় ততোখানি হয় না ; বরং জিভের পশ্চাৎভাগের যে অংশ থেকে ও' উচ্চারিত হয় তার গতি কিছুটা দ্রুত সম্মুখগামী হয়। এজন্যে ওকে সিকি ($\frac{1}{4}$ ভাগ) সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে চিহ্নিত করেছেন হাই সাহেব। সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিচারে জিভের পশ্চাৎ ভাগের এ রূপকে 'yotized' (oʸ) বলা যেতে পারে এ জন্যে বাংলায় ধ্বনিটির নামকরণ করেছেন অধ্যাপক হাই 'অভিশ্রুত ও' বলে।

উ] উ-উচ্চারণে ঠোঁট যথেষ্ট গোল (fairly close lip-rounding) হয়। এবং চোয়াল দুটোর মাঝপথে ফাঁক সংকীর্ণভাবে (opening between the jaws ; narrow) থাকে।

জিহ্বা উঁচু করার পরিমাণের উপর বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নির্ভরশীল। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে—

ই = সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front close vowel) ;

এ = অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি (front half close vowel) ;

আ = সম্মুখ ও পশ্চাতের মাঝামাঝি বিবৃত (open) স্বরধ্বনি ;

অ = অর্ধ বিবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (half open back vowel) ;

ও' = সিকি ($\frac{১}{৪}$) বিবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ($\frac{1}{4}$ open back vowel) ;

ও = অর্ধ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (half close back vowel) ;

উ = সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (close back vowel).

জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় সেদিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনিগুলো বিচার করলে দেখা যাবে ই, এ, অ্যা এই তিনটি সম্মুখ (front) পর্যায়ের অ, ও, ও', উ পশ্চাৎ (back) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর আ জিভের সম্মুখের শেষ এবং পশ্চাতের যেখানে শুরু এই দুইয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে। এই আ ইংরেজি central or neutral vowel নয়, উর্দুর হ্রস্ব অ বা ə–ও নয়। জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাতের মিলনস্থান থেকে উচ্চারিত হলেও এর ঝোঁক জিভের পিছনের দিকেই বেশি। এ কারণে বাংলার স্বরধ্বনি 'আ' জিহ্বার মধ্যকার ইংরেজি neutral বা উর্দুর ə জাতীয় সংবৃত (close) ধ্বনি নয়, বিবৃত (open) ধ্বনিই। আরো সহজভাবে বললে দাঁড়ায় ই, এ, অ্যা উচ্চারণকালে জিভের সামনের ভাগ তালুর শক্ত অংশ (hard palate)-এর দিকে উঁচু করতে হয়। এ কারণেই বৈয়াকরণগণ ই, এ, অ্যা-কে তালব্য–স্বরধ্বনি আখ্যা দিয়েছিলেন কোনো এক সময়ে। আধুনিক ধ্বনি–বিজ্ঞানীরা সম্মুখ স্বরধ্বনি বা front vowel কিংবা জিভের পশ্চাৎভাগ তালুর নরম অংশের (soft palate) দিকে উঁচু করে যে স্বরধ্বনিগুলো পাওয়া যায় সেই পশ্চাৎ বা back vowels অ, ও, ও', উ—এগুলোর কণ্ঠ্যস্বরধ্বনি নাম মেনে নিতে মোটেই রাজী নন।

তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বরধ্বনি বিচারের তিনটি মাপকাঠির সাহায্য আমরা নিতে পারি :

১. ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থান বিচারের মাধ্যমে ;

২. জিহ্বা উঁচু করার পরিমাণের দিক থেকে ; এবং

৩. জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় সেদিক থেকে

এই বিচারের মাধ্যমে আমাদের স্বরধ্বনিগুলোর কোনটি কোন পর্যায়ে পড়বে তার আলোচনা করা হলো ; কিন্তু উচ্চারণকালে প্রতিটি ধ্বনি কিভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তা শুনবার মতো কান এবং উচ্চারণ করার মতো অভ্যাসের বিশেষ প্রয়োজন।

স্বরধ্বনির এই আলোচনা অনুযায়ী এবারে স্বরধ্বনির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বোধ হয় সহজ হতে পারে

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের বাক্–প্রবাহে প্রতিটি ধ্বনির আলাদা আলাদা অস্তিত্ব এবং উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা একত্রিত বা বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। ফলে ভাষার লিখিত রূপে প্রতিটি ধ্বনির লিপি–চিহ্ন দিয়ে পৃথক করলেও কথা বলার সময় অন্যরূপ ধারণ করে। এ কারণে ধ্বনিগুলোর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খানিকটা হারিয়ে ফেলে। তাই বাক্–প্রবাহ থেকে ধ্বনিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোনো ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

'No other phonetic dichotomy entails so many difficulties as Consonant Vowel division ; articulatory and acoustic criteria are there as thoroughly

entwined with contextual and strictual function and problems of segmentation that only rigid descriptive order will scperate them'.[১]

প্রতিটি ধ্বনিরই দুটো দিক রয়েছে—শ্রব্য (acoustic) এবং উচ্চার্য (articulatory)। একজন লোক যখন তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে কোনো ধ্বনি সৃষ্টি করবে, তখন এ ধ্বনিগুলো তার নিজের এবং তার শ্রোতার কানে গিয়ে সমানভাবে আঘাত সৃষ্টি করবে। এ কথার সাথে একাত্মতা দেখা যায় ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্সের।[২] তাঁর মতে আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোনো জায়গায় যদি বাধা না পেয়ে অথবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপ না খেয়ে ঘোষবৎ কোনো ধ্বনি উদ্‌গত হয় তবে তাই হবে স্বরধ্বনি। Daniel Jones-এর ভাষায়,

'A vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound, in forming which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction.'

ফিসফিসে স্বরধ্বনি : অবশ্য কথাবার্তা স্বাভাবিক না হলে স্বরধ্বনি অঘোষও হতে পারে। পৃথিবীর কোনো কোনো ভাষায় অঘোষ স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। ফিস্‌ফিসে (বা whisper) কথাবার্তায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ যদি অঘোষ হয়ে পড়ে, অবাক হবার কিছুই নেই। 'স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে স্বরযন্ত্রের (larynx) অন্তর্নিহিত স্বরতন্ত্রীতে (vocal cords) স্বাভাবিকভাবে কম্পন লাগে। ফলে, স্বরধ্বনিগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘোষ বা নিনাদিত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কানে কানে তথা ফিসফিসে কথাবার্তায় স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis) উন্মুক্ত থাকার জন্যে কিংবা তেমন পাশাপাশি সন্নিহিত না থাকার জন্যে তাদের ভেতর দিয়ে বাতাস নির্গমন কালে তারা প্রকম্পিত হয় না। এহেন অস্বাভাবিক অবস্থায় উচ্চিত স্বরধ্বনিগুলো অঘোষ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।' কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তায় বাংলা স্বরধ্বনিগুলো সবই ঘোষ। বাগ্‌যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট এবং বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় সব ভাষার স্বরধ্বনিগুলোর মাধুর্য, দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা অনেক বেশি।

উপস্বরধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনি (Semi vowel) : অর্ধস্বরধ্বনি বা উপস্বরধ্বনি ধ্বনিবিজ্ঞানে এর সংজ্ঞা, অস্তিত্ব এবং নামকরণের দিক থেকে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইংরেজ এবং আমেরিকান ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতানৈক্যের সীমা নেই। প্রকৃতপক্ষে অর্ধস্বরধ্বনি এমন ধ্বনি, যা স্বরও নয়, ব্যঞ্জনও নয়—এই দুইয়ের সঠিক মাঝখানে এই ধ্বনিগুলোর অবস্থান বলে যে-অর্থে এগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি নাম দেয়া হয়েছে, একইভাবে এগুলোর নাম অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি, উপব্যঞ্জনধ্বনি (Semi-Consonant) নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

নামকরণের দিক থেকে ইংরেজি শব্দ Semi Vowel–এর বাংলা অর্ধস্বরধ্বনি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ঠিক স্বরের অর্ধেক নয়, বা স্বরধ্বনির গুণাবলীর অর্ধেক এখানে অবশিষ্ট নেই ; বরং স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝামাঝি এগুলো। এ কারণেই 'অ' স্বরধ্বনি

---

১ Phonetics by Kenneth L. Pike.

২ Daniel Jones : An Outline of English Phonetics.

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

হওয়া সত্ত্বেও 'য়'-কে বর্ণমালায় ব্যঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইদিক থেকে ইংরেজি 'Semi-Vowel'-এর বাংলা অর্ধস্বরধ্বনি না হয়ে 'উপস্বরধ্বনি' বোধ হয় বেশি অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত হয় বলে আমার ধারণা।

এই উপস্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিতে ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্স মনে করেন, এই ধ্বনি এক জাতীয় পিচ্ছিল বা শ্রুতিধ্বনি (gliding sound), যার উচ্চারণে জিহ্বার গতি উচ্চ ও সংকীর্ণতর একটি স্বরধ্বনির দিক থেকে প্রশস্ততর আরেকটি স্বরধ্বনির দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। জিহ্বার গতিশীলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমষ্টি উপস্বরধ্বনি, এই হলো তাঁর মত।[১] ইংরেজি থেকে উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে আরো জোরদার ও স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। ইংরেজি উপস্বরধ্বনি j (yard-ja:jd) এবং W (one ; wan) এখানকার মূলস্বরধ্বনি a; এবং a-র পূর্ববর্তী j এবং w-র সামগ্রিক উচ্চারণ প্রক্রিয়াটিই উপস্বরধ্বনির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

অন্যদিকে আমেরিকার ধ্বনিবিজ্ঞানী ব্লক ও ট্রেগার উপস্বরধ্বনির সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

'If we examine a large number of diphthongs, we find that in many typical cases as in high (ha) , how (hau), go (gou), boy (boi) the non-syllabic vowel has a higher tongue position than the syllabic. In view of what we have said about sonority, this is not surprising. It is useful to have a special name for non-syllabic vowel with this kind of relation to the contiguous syllabic ; we call it a semi vowel. The semi-vowel may precede as well as follow a vowel.'[২]

আরো একজন ধ্বনিবিজ্ঞানীর মতে উপস্বরধ্বনি হচ্ছে, 'A semi vowel may be defined as a gliding sound in which the tongue starts in the position of a close or half-close vowel and immediately leaves the position to take up one belonging to more open vowel.'[৩]

স্বরধ্বনির উচ্চারণে তার জিহ্বার অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে বলে যে কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণে তার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি-ব্যঞ্জনা থাকে। উপস্বরের বেলায় তা থাকে না। কারণ উপস্বরধ্বনির উচ্চারণ কোনো অবস্থান (জিহ্বার) নির্দিষ্ট থাকে না আর উচ্চারণ সময়ের দিক থেকেও তার স্থিতিকাল এতো অল্প থাকে যে, মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই উচ্চারিত হয়ে যায়। এ ছাড়াও উপস্বরগুলোর তুলনায় তার অব্যবহিত পূর্ব বা পরের স্বরধ্বনির অনুরণন বেশি হয় বলে যে কোনো একটি স্বরধ্বনির তুলনায় তার উপস্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর এবং বায়ু পথ সংকীর্ণতর হয়।

বাংলা উপস্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থ উপস্বরধ্বনির (তাঁর ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি) নির্ণয় করেছেন এভাবে, 'বাংলা শব্দের মধ্যে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি

---

১ 'Semi Vowel : a voiced gliding sound in which the speech organs start by producing a vowel of comparatively small prominence and immediately change to more prominent vowel. —An Outline of English Phonetics by Daniel Jones.

২ Bernard Bloch, George L. Trager : Outline of Linguistic Analysis.

৩ Phonetics of English by Ida C. Ward.

একই স্বরধ্বনি থাকলে এক সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে বাগ্‌যন্ত্রগুলোর অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যে যে সব অস্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হয় সেই gliding ধ্বনিগুলোই তার পরবর্তী স্বরধ্বনি সহযোগে জাত যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি।[১]

তবে এই উপস্বর দিয়ে বাংলায় অক্ষর এবং শব্দ সূচনার সুযোগ বেশি নেই। ইয়ার, ইউরোপ, এয়ার, ওয়াও ইত্যাদি বিদেশী শব্দের বেলায়ই তা দেখা যায়। অন্যত্র এর সন্ধান খুব একটা মেলে না।

আমাদের ভাষায় উপস্বরধ্বনি তিনভাবে পাওয়া যায় :

(ক) শ্রুতিধ্বনি থেকে ; (খ) নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির (diphthong) শেষ উপাদান থেকে এবং (গ) অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির প্রথম অথবা দ্বিতীয় উপাদান থেকে।

(ক) শ্রুতিধ্বনি থেকে : আমাদের ভাষায় অন্তস্থ–য়–শ্রুতি এবং অন্তস্থ–ব–শ্রুতির যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। আমাদের বর্ণমালার ব্যঞ্জন বিভাগে অন্তস্থ 'য়' বলে একটি লিপি দেখা যায় ; এবং 'ব' বলে দুটো লিপিও (একই আকৃতির) আমাদের বর্ণমালার ব্যঞ্জন বিভাগে রয়েছে (যেমন প, ফ, ব, ভ, ম এবং য র ল ব শ), যদিও এর স্বতন্ত্র কোনো রূপ নেই। আমাদের ভাষায় পাওয়া যায়, অথচ বর্ণমালায় যার কোনো অস্তিত্ব নেই, এমনি 'ই'– শ্রুতির সন্ধানও পাওয়া যায়। এই তিনটি শ্রুতি (gliding) উপস্বরধ্বনিকে রোমান প্রতিলিপিতে লেখা যেতে পারে, y (য়), w (ব) এবং j (ই)।

অন্তস্থ–য় (y) : নেয়ে, খেয়ে, দেয়ে, চেয়ে, মেয়ে, মায়া, পায়া ইত্যাদির উচ্চারণে নে+এ (ে), খে+এ (ে) দে–এ (ে), চে+এ (ে), মে+এ (ে), মা+আ (া), পা+আ (া) দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মুখ বিবর ও জিহ্বার অস্থিতিজনিত একটা পিচ্ছিল gliding ধ্বনি অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্যে উত্থিত হয়। স্বরধ্বনি জাতীয় এই পিচ্ছিলতাটুকুই তার পরবর্তী ধ্বনিটির সহযোগে উপস্বরধ্বনি য় (y)। রোমান হরফে লিখলে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে— neye, kheye, deye, cheye, meye maya, paya ইত্যাদি স্থানে y (য়) স্পষ্ট হয়ে উপস্বরধ্বনির স্বীকৃতি এনে দিচ্ছে। এগুলোর উচ্চারণে সামগ্রিকভাবে অক্ষর (syllable) যেমন মেয়ে (মে+য়ে দু'টি মুক্তাক্ষর) মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জিহ্বার একটি গতিশীলতায় পর্যবসিত হয় বলে এসব ক্ষেত্রে উপস্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়।

পাশাপাশি দু'টি শব্দ থেকেও এ ধরনের শ্রুতিধ্বনি (glide sound) জাতীয় 'য়' উপস্বর খুঁজে বের করাও অসম্ভব নয়। যেমন,

মা আমার (ma^{y} amar) ;

সে এসে (she^{y} ese) ইত্যাদি।

অন্তস্থ 'ব' (w) : মোয়া, পোয়া, নোয়া, হওয়া, খাওয়া, দ্যাওয়া, ন্যাওয়া, কুয়া ইত্যাদি শব্দে ব–শ্রুতি বা উপস্বরধ্বনি ব(w) পাওয়া যায়। রোমানে লিখলে স্পষ্ট হবে — mowa, powa, nowa, howa, khawa, duwa, nuwa, kuwa এসব ক্ষেত্রে অন্তস্থ 'ব' বা উপস্বরধ্বনি ব (w) পাওয়া যাচ্ছে। মোয়া শব্দের মো–এর ে

১ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব : মুহম্মদ আবদুল হাই

শেষদিকের খাদটিকে উপস্বর ধরে অধ্যাপক ফার্গুসন এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলায় উচ্চাবস্থিত বা সংকীর্ণ ই, উ এবং মধ্যস্থিত বা অর্ধসংকীর্ণ এ এবং ও এদেরকেই উপস্বরধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদের তিনটিই (ই, এ (য়) এবং (ও) নতুন নতুন শব্দ ও অর্থ নির্ণয়েও সাহায্য করে।

উ দ্বিস্বরধ্বনি–সৃষ্ট অক্ষরের শেষে খাদ সৃষ্টি করে (দাউ দাউ, ঘেউ ঘেউ, কুউ কুউ)- –পূর্ণ স্বরধ্বনি হিসেবে উ ব্যবহৃত হয়ে এ ধরনের উপস্বর সৃষ্ট কোনো শব্দের সাথে অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না তবু আমাদের ভাষায় উ যে এ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় নিতান্ত সামান্য প্রয়াসে, তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। যেমন, জায়ে (জা–এ জা–এ), গায়ে (গা–এ গা–এ), মায়ে (মা–এ মা–এ) প্রভৃতি শব্দে এ স্বরধ্বনিটি সপ্তমী বিভক্তিপ্রসূত হলেও যা–ই, খা–ই, দা ও, চা–ও প্রভৃতি শব্দে শেষের স্বরধ্বনি ই এবং ও গুরুত্বাচক। মাঝখানে হাইফেন দিলে সহজে অর্থ পরিস্ফুট হয় সত্যি, না দিলেও বাঙালি পাঠকের অর্থ উদ্ধার তেমন কষ্টসাধ্য হবার কথা নয়।

বাংলা ভাষায় অক্ষরের চূড়ে থেকে খাদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে ই, এ (য়) , ও এবং উ এই চারটিই আমাদের উপস্বরধ্বনি, অধ্যাপক ফার্গুসন ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মত। আর অর্ধ বিবৃত বা নিম্নমধ্য অ্যা, অ এবং বিবৃত বা নিম্ন–অবস্থিত আ অক্ষরের চূড়ের পরবর্তী খাদ এবং অক্ষরের শেষে বসে মুক্তাক্ষর এবং বদ্ধাক্ষরে অর্থগত তারতম্য সৃষ্টিতে কোনো সহায়তা করে না বলে এগুলো উপস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের মতে, একটি গতিশীলতা (glide) এবং এক অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমন্বয়কে উপস্বরধ্বনি নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

(গ) অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় উপাদান থেকে : আমাদের বাক প্রবাহের ভাষায় অ এবং অ্যা ধ্বনি বাদ দিলে অন্য সব কটি স্বরধ্বনিই অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হলে উপস্বরধ্বনি উদ্ভূত হতে পারে। অবশ্য এ ধরনের উপস্বরের ব্যবহার কেবলমাত্র সেখানেই হয়ে থাকে, যেখানে দ্রুত উচ্চারণে (কবিতা আবৃত্তিতে) অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি গঠিত হয়। এই দ্বিস্বরের দ্বিতীয় উপাদানটি হবে উপস্বরধ্বনি। আর কয়েকটি বিদেশী শব্দে (ইয়ার, এয়ার, ইউরোপ, ওয়াড়) প্রথম উপাদানটি উপস্বরধ্বনি হয়ে থাকে।

দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি (Diphthong)

সাধারণভাবে বললে দ্বৈতস্বর, দ্বিস্বর বা যুগ্মস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনি হলো পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি একাক্ষর (one syllable) হিসেবে উচ্চারিত ধ্বনি। এক নিশ্বাসের এক স্বতন্ত্র চেষ্টায় তা উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন, যাই (যা+ই=যাই)। কিন্তু নিশ্বাসের দুই স্বতন্ত্র চেষ্টায় উচ্চারিত হলে তা আর দ্বিস্বর হবে না, কেননা দুই স্বরের মাঝখানে সামান্য স্থিতি বা বিরতির ফলে দ্বিস্বরত্ব–গুণ হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন, যা-ই (তুমি যা-ই বলো না কেনো, শরীফ অত্যন্ত ভালো ছেলে)।

দ্বিস্বরধ্বনির অবশ্য এটাই একমাত্র শর্ত নয় : দ্বিস্বর গঠনের আরো কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে, 'প্রথম স্বরধ্বনি' উচ্চারণকালে জিহ্বা একটা নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এবং সাধারণ

স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে এরকম ক্ষেত্রে জিহ্বা যতটুকু সময় অপেক্ষা করতো ততটুকু অপেক্ষা না করেই পরবর্তী স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত এগিয়ে (পিছলে) যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরবর্তী স্বরধ্বনি মুখবিবরে পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করে না। জিহ্বার প্রথম স্বরধ্বনি গঠন এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত পেশী সঞ্চালনের মাঝখানে শোনা না গেলেও একটা পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনি (gliding sound) স্বতঃউৎসারিত হয়। যৌগিক স্বরধ্বনির মাঝখানে একটি স্বয়ম্ভু পিচ্ছিল (an independont glide is expressly made) জিহ্বার পেশী সঞ্চালনের ফলে উদ্ভূত না হয়ে পারে না।

তাহলে 'একটি স্বরধ্বনি, জিহ্বার গতিশীলতা এবং তৎপরবর্তী সামগ্রিক প্রক্রিয়াসৃষ্ট অর্ধস্বরধ্বনি সমন্বয়ে জাত একটি অক্ষর (syllable)-কেই diphthong বলা যেতে পারে।'[১]

আমাদের বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ঐ এবং ঔ অবশ্য এক হিসেবে ই এবং উ কেও দ্বিস্বর হিসেবে গণ্য করার পরিকল্পনা অনেকে করেছেন কিন্তু ঈ (ই+ই) এবং ঊ (উ+উ) যথাক্রমে ই এবং উ-র দীর্ঘতাসূচক ধ্বনি মাত্র। অর্থগত দিক থেকেও এরা যেমন মূল ধ্বনির অতিরিক্ত কোনো অর্থ তৈরি করতে পারে না, তেমনি ধ্বনি হিসেবেও ভাষার আঙ্গিক (উচ্চারণ, ঝোঁক ইত্যাদি) হিসেবেই তার হ্রস্বতা-দীর্ঘতার সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো কারণে নয়।

আমাদের ভাষায় সর্বমোট একত্রিশটি (৩১) দ্বিস্বরধ্বনি রয়েছে (১৯টি নিয়মিত বা regular এবং ১২টি অনিয়মিত বা irregular)।

নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি (Regular Diphthong)

মূলস্বর ই-র সাহায্যে

১. ই-ই (i-i) : দিই—আমি কি তোমাকে সত্যি কোন বই **দিই** নি?
যাবিই—তুই তো **যাবিই**, আমিও যাবো।

২. ইউ (i-u) : পিউ—**পিউ পিউ** পাপিয়া কেনো ডাকে।
মিউ—**মিউ মিউ** ডাকে, না কাঁদে বিড়ালটা

মূলস্বর এ-র সাহায্যে

৩. এই (ei) : সেই—সেই কখন তুমি গিয়েছো, আর এলে এখন।
নেই—বিশ্বাস করো, আমি কিছু **নেই** নি।

৪. এও (eo)[২] : কেও—কেও যা পারে না, রমা পারবে কি করে?
মেও—মেও আর ভালো লাগে না।

৫. এউ (eu) : ঘেউ ঘেউ—সারারাত কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করেছে।
কেউ—কেউ যাবে না, আমি যাবো সাথে

---

১ মুহম্মদ আবদুল হাই : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব।

২ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এও-এর অতিরিক্ত এয়া কেও দ্বিস্বর ধরেছেন। যেমন, পেও—পান করা অর্থে।

মূলস্বর অ্যা-র সাহায্যে

৬. অ্যাও (ye) : ন্যাও—আমি বলছি তুমি বইটি ন্যাও।
দ্যাও—দশটা টাকা দ্যাও।

৭. অ্যায় (aey) : ন্যায়—আর ন্যায় না।
দ্যায়—স্বপ্না আমাকে বইটি দ্যায়

মূলস্বর আ-র সাহায্যে

৮. আই (ai) : খাই—এসো আমরা একসাথে খাই।
নাই—আমার কাছে আর টাকা নাই।

৯. আও (ao) : ফাও—একটা কমলা ফাও নিয়েছি।
যাও—যাও, তোমার সাথে আর কথা নাই।

১০. আউ (au) : দাউ দাউ—দাউ দাউ করে বাড়িটা জ্বলছে।
পাউ—আর কটাকা পাউ?

১১. আয় : আয়—তার মাসিক আয় দুহাজার টাকা।
গায়—নাসিম ভালোই গায়।

মূলস্বর অ--র সাহায্যে

১২. অও (ao) : নও—তুমি নও, আমিই পাপী
হও—রাজী হওতো চলো যাই।

১৩. অয় (ay) : সয়—আর তো সয় না সখী।
নয়—তোমাকে সে নয় টাকা দিয়েছে।

মূলস্বর ও-র সাহায্যে

১৪. ও-ও (o-o)[১] : শোও—তুমি শোও আমি একটু পরে আসছি।
বোও—বোও, আমি আসছি বলে।

১৫. ওউ বা ঔ (ou) : বউ (বৌ)—রাঙা বৌ (বউ) ঘরের লক্ষ্মী।
নউ (নৌ)—নউ (নৌ) বাহিনী যথেষ্ট তৎপর।

১৬. ওই বা ঐ (oi) : ওই—ওই দেশে প্রচুর লোক অনাহারে মরে।
দই (দৈ)—দই (দৈ) কতখানি খেতে পারবে?

১৭. ওয়(oy) : শোয়—মালা তাড়াতাড়ি শোয়
ধোয়—লুনা কাপড় ধোয়।

মূলস্বর উ-র সাহায্যে

১৮. উই (ui) : বুই—রুইটা কতো হলো ভাই।
পুই—পুই লুবনার সবচেয়ে প্রিয় শাক

---

১ ও-ও (o-o)— উচ্চারণ অনেকটা ও-র দীর্ঘতাজ্ঞাপক।

১৯. উউ (u-u)[১] : কুউ কুউ—বাচ্চাটা সারাদিন কুউ কুউ করছে

এই নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির আরো কতোগুলো (১২টি) দ্বিস্বরধ্বনির খোঁজ পাওয়া যায়—কোনো কোনো মুহূর্তে দ্বিস্বরপ্রাপ্ত হয়, কখনো তা হয় না। কারণ দ্বিস্বরধ্বনির প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে একাক্ষরিতা (mono syllabicity)। এই একাক্ষরিতা বজায় থাকলে তারা দ্বিস্বরধ্বনি হবে, অন্যথা হলে হবে না। অবশ্য আমাদের সচেতন স্বাভাবিক উচ্চারণে এগুলোর দ্বিস্বর হবার কথা নয়। তবু দ্রুত বাক-প্রবাহে বা অসাবধানতা কিংবা বিকৃতির ফলে এগুলো দ্বিস্বর বলে গণ্য হয় মাত্র।

মূলস্বর ই-র সাহায্যে

১. ইয়া (ia) : প্রিয়া আমার প্রিয়া, কথাটি রাখো।
মিয়া—কি মিয়া, কেমন আছো?

২. ইয়ে (ie) : পিয়ে—কাল সারা রাত গেছে মদ পিয়ে।
নিয়ে—হেনাকে নিয়ে এ কি খেলা।

৩. ইও (io) : দিও—এটা সাথীকে দিও।
প্রিয় আমার প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত।

মূলস্বর এ-র সাহায্যে

৪. এয়া (ea) : খেয়া—খেয়া পারাপার বন্ধ হবে কি আজ?
কেয়া—কেয়া পছন্দ করে না কে?

৫. এয়ো (eo) : এয়ো—কাল এয়ো কিন্তু।
যেয়ো লক্ষ্মীটি, যেয়ো না গো চলে।

মূলস্বর অ্যা-র সাহায্যে

৬. অ্যায়া (aea) : দ্যায় (দেওয়া)—বইটা আর দ্যায়া হলো না
ন্যায় (নেওয়া)—আজো ওটা ন্যায়া হলো না

মূলস্বর অ-র সাহায্যে

৭. অয়া (oa) : নয়া—নয়া বাড়ি নয়া ঘর তাই গরবিনী।
সয়া (সওয়া)—আর কতো সয়া (সওয়া) যায়।

মূলস্বর ও-র সাহায্যে

৮. ওয়া (oa) : মোয়া—মায়ের হাতের মোয়া নয় যে, চাইলেই পাবে।
খোয়া—কতো টাকা খোয়া গেলো।

---

১ উ-উ (u-u)—ইংরেজি দীর্ঘ উ-র মতো হতে পারে।

৯. ওয়ে (oe) : স'য়ে—স'য়ে স'য়ে শেষ হয়ে গেলাম।
ব'য়ে—তুমি এলে, যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেলো।

মূলস্বর উ-র সাহায্যে

১০. উয়ে (ue) : শুয়ে—শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলো।
থুয়ে—থুয়ে দে তোর গান-বাজনা।

১১. উয়া (ua) : জুয়া—জুয়া খেলেই তো কাল কাটালে
নুয়া—আর একটু নুয়া না, তবেই মাটি ছুঁবি।

১২. উয়ো (uo) : থুয়ো—বইটা ওখানে থুয়ো।
ধুয়ো—কাপড়টা ধুয়ো কিন্তু

এছাড়াও কথা বলার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অত্যন্ত দ্রুত ও বেখেয়াল উচ্চারণে পাশাপাশি তিনটি বা চারটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে। এগুলো দ্বিস্বরধ্বনি বা diphthong নয়, অবস্থাভেদে ত্রিস্বরধ্বনি বা triphthong বা tetraphthong নামে অভিহিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ও সতর্ক উচ্চারণে পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। ত্রিস্বরধ্বনি বা triphthong-এর নমুনা দেয়া হলো।

ইয়েই (iei) ; ইয়ায় (iae) ; এইয়ে (eio) সং. আওয়া (aoa) ; ওয়েও (oeo) ; ওইয়ে (oie) ; উইয়ে (uie) ; উইও (uio) ; উয়ায় (uae) ইত্যাদি

আর চৌস্বরধ্বনি বা tetraphthong-এর উদাহরণ হলো—এওয়াই (eoai) ; আওয়ায় (aoae) ইত্যাদি।

এ ছাড়া আমাদের ভাষায় কোনো কোনো সময় একই স্বরধ্বনিকে পরিবর্তিত ও অমিলিতভাবে পরপর দুবারও উচ্চারিত হতে দেখা যায় :

ই+ই = দিই (দি+ই+ই) ; এ+এ = খেয়ে (খ-এ+এ) ; ও+ও = শো-ও (শ+ও+ও) ; ই র পরপর তিনবার উচ্চারিত হওয়ার নিদর্শনও রয়েছে – দিই+ই (দি+ই+ই+ই) ইত্যাদি।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized Vowels)

ফুসফুস থেকে নাসাপথেই (Naso-pharynx) সাধারণত বাতাস নির্গত হয়। ম, ন এবং ঙ এই কটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অনুনাসিক স্বরধ্বনি ছাড়া অন্য সব ধ্বনিই উচ্চারণে আমাদের তালুর নরম অংশ (soft palate) উঁচু হওয়ায় নাকের ছিদ্রপথ ভেতর থেকে সামান্য মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বলে ফুসফুস থেকে স্বাভাবিক নাসাপথে বাতাস না বেরিয়ে মুখ দিয়ে বেরোয়।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ম, ন, ঙ–এর উচ্চারণ করার সময় তালুর নরম অংশ উঁচু হয় না, বরং নিচে নেমে এসে নাসাপথে বাতাস বেরোনোর সুযোগ করে দেয়। অনুনাসিক নয় এমন স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণকালেও তালুর নরম অংশ নাসাপথ বন্ধ করার জন্যে খানিকটা উঁচু হয় ; এ কারণে ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখ দিয়েই বের হতে হয়। কোনো সময় স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ উঁচুও নয় নিচুও নয়—ঠিক এমনি অবস্থায় থাকে

বলে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস মুখ ও নাসাপথে বেরোতে থাকে। যে সব স্বরধ্বনির উচ্চারণে তালুর নরম অংশের এই না-উঁচু না-নিচু এমন মাঝামাঝি অবস্থানের জন্যে নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা (combined resonance of nose and mouth) লাভ করে, তাকেই বলা হয় অনুনাসিক স্বরধ্বনি বা সানুনাসিক স্বরধ্বনি (nasalized vowels)

ইংরেজিতে অনুনাসিক কোনো স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি নেই। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পূর্বের ও পরের স্বরধ্বনি কিছুটা অনুনাসিকভাবে উচ্চরিত হয় মাত্র এর কারণ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাব। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এমনি স্বতন্ত্র নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানেও নাসিক্য ব্যঞ্জনের প্রভাবে স্বরধ্বনি সানুনাসিকভাবে উচ্চারিত হয়। তাদের লিপিতে তাই অনুনাসিক স্বতন্ত্র স্বরধ্বনির লিপির প্রয়োজনও হয় না। যেমন, ইংরেজিতে name (nem), এখানে n এবং m -এর মধ্যবর্তী a(e) অনুনাসিক হয়েছে n এবং mএর প্রভাবে, কিন্তু অনুনাসিক স্বরধ্বনি চিহ্নের প্রয়োজন হয় নি বাংলায় নাম (nam) ন এবং ম-এর মধ্যবর্তী আ একইভাবে অনুনাসিক রূপপ্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের ভাষার প্রতিটি স্বরধ্বনিই অনুনাসিকভাবে উচ্চারিত হতে পারে। আমরা আমাদের স্বরধ্বনিগুলো অনুনাসিক রূপ চিহ্নে চিহ্নিত করি (চন্দ্রবিন্দু)-র সাহায্যে (moon-dot)। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় অনুনাসিকতা পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার সাথে তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের কথ্য ভাষায় অনুনাসিকতা রীতিমতো একটি মৌলিক স্বরধ্বনির দাবি রাখে। কেননা, ধ্বনি হিসেবে স্বতন্ত্র তো বটেই, অর্থের পরিবর্তনও ঘটায় এই অনুনাসিকতা। যেমন—

ছাদ—ঘরের ছাদ (roof)	কুড়ি—বিশ	কাসা-কাশ দেয়া
ছাঁদ—ধরন	কুঁড়ি মুকুল	কাঁসা—ধাতু বিশেষ

আমাদের ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি নিরপেক্ষ অনুনাসিক স্বরধ্বনি শব্দের প্রথম অক্ষরে (syllable) বিশেষভাবে পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে বা শেষাক্ষরে ক্বচিৎ। গাঁদ বা পাঁচাশি ইত্যাদি অল্প সংখ্যক শব্দ বাদ দিলে 'অ' স্বরধ্বনি সাধারনত অনুনাসিক হয় না। আর অনুনাসিক 'আঁ' বাংলায় সবচাইতে প্রচলিত।

বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant Sounds In Bengali)

ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা

যে কোনো ভাষার অর্থবোধক ধ্বনির দুটো ভাগ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনিগুলোর ঠিক বিপরীত ধ্বনিই হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তায় ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে এসে যদি গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে বা ঠোঁটে বাধা পায় অথবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা লাগে আর এরই ফলে যদি ধ্বনির উৎপত্তি হয়, তাই হবে ব্যঞ্জনধ্বনি

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : "স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুসফুস নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের

বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যে সব ধ্বনি উদ্গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।"[১]

এ থেকে বোঝা যায়,—

(ক) যাবতীয় অঘোষ ধ্বনি (ক, চ, স ইত্যাদি) ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্গত ;

(খ) বায়ুপথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে যে-সব ধ্বনির সৃষ্টি হয় (গ, ট, ব, ল ইত্যাদি) ব্যঞ্জনধ্বনির পর্যায়ভুক্ত ;

(গ) বাতাস মুখবিবর দিয়ে না বেরিয়ে নাসাপথে বেরোবার ফলে যে-সব ধ্বনি নির্গত হয় (ঙ, ন, ম ইত্যাদি) সেগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি ;

(ঘ) যে-সব ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে উৎপন্ন হয় (শ, স ইত্যাদি) তারা সব ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য শ্রুতির দিক থেকে (acoustics) যতোখানি, খামখেয়ালিবশত (arbitrary) ততোখানি নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির এই পার্থক্য তাদের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় বলে তা অনুধাবনের সজাগ ও সচেতন শ্রুতির উপর বেশি নির্ভরশীল।

বাক-প্রবাহের বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণে দেখা যায়, কোনো কোনো ধ্বনি বেশি ব্যঞ্জনা লাভ করে, তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ব্যঞ্জনধ্বনি অপেক্ষা স্বরধ্বনিগুলো অধিক ব্যঞ্জনাময় এবং দ্যোতনা সৃষ্টিকারক। আরো ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যেও এমনি পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। যেমন, ক ও গ কিংবা খ ও ঘ ; এসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে দ্যোতনার দিক দিয়ে ঘোষ ও অঘোষের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তাই ধ্বনির বিচার বিশ্লেষণে যেহেতু বাক-প্রবাহ আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেখানে এই পার্থক্য বেশ খানিকটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তবু "ধ্বনির ব্যাপারে বিশ্লিষ্টভাবে ধ্বনি উচ্চারণে স্বাভাবিকতাই বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত, কেননা একথা সত্য যে, বাক্যের ভেতরের ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে যে কোনো ধ্বনিই যে কোনো ধ্বনির চেয়ে বেশি-অনুরণিত হতে পারে।"

জিভের স্থান, তার উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে, যেভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বরধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়, তেমনি আমাদের ব্যঞ্জনধ্বনির বিচার-বিশ্লেষণেরও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, একটি ধ্বনি থেকে অন্য একটি ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় এবং একেকটি ধ্বনিকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

মোটামুটিভাবে পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

১. উচ্চারণ-স্থান নিরূপণের সাহায্যে ;
২. উচ্চারণ-স্থানে বায়ুপথের রূপ দেখে ;
৩. তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থার মাধ্যমে ;
৪. স্বরযন্ত্রের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ;
৫. স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা বিচার করে।

---

১ মুহম্মদ আবদুল হাই : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব।

১. **উচ্চারণ স্থান নিরূপণের সাহায্যে :** বাংলার চলিত ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোতে তাদের উচ্চারণ-স্থান নিরূপণের সাহায্যে বিন্যস্ত করলে দেখা যাবে—

ক. কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত (glottal) অথবা স্বরযন্ত্রজাত (laryngeal) ব্যঞ্জনধ্বনি—হ।

খ. জিহ্বামূলীয় কোমল তালুজাত বা পশ্চাৎ তালুজাত (velar) ব্যঞ্জনধ্বনি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

গ. দন্ত্য (dental) ব্যঞ্জনধ্বনি—ত, থ, দ, ধ।

ঘ. দন্তমূলীয় (alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি—ব, ল, স, য (z), ন, হ্ন, হ্ল, হ্ম।

১. প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি—ট, ঠ, জ, ঢ

২. পশ্চাৎ দন্ত মূলীয় (post-alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি—শ।

৩. দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (alveolo-retroflex) ব্যঞ্জনধ্বনি—ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়।

ঙ. ঔষ্ঠ্য (labial) ব্যঞ্জনধ্বনি প, ফ (ph) , ব, ভ (bh), ম, ম্ব, অন্তস্থ ব (w)।

চ. দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental) ব্যঞ্জনধ্বনি—ফ (f, o), ভ (v.β)।

এই নামগুলোর ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে :

ক. কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত (glottal) অথবা স্বরযন্ত্রজাত (laryngeal) ব্যঞ্জনধ্বনি—স্বরযন্ত্রের মধ্যকার ঠোঁটের মতো তন্ত্রীদ্বয়ের সংকোচনের ফলে বায়ুপথ সংকীর্ণ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তার নাম কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত অথবা স্বরযন্ত্রজাত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, হ। কিন্তু এই উচ্চারণে একটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, ঠোঁটের মধ্যকার স্বরতন্ত্রী দুটো সংকুচিত হওয়ার সময় বায়ুপথ সংকীর্ণ হবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে বন্ধ হবে না। বন্ধ হলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হবে না

খ. জিহ্বামূলীয় কোমল তালুজাত বা পশ্চাৎ তালুজাত ব্যঞ্জনধ্বনি (velar) ব্যঞ্জনধ্বনি—জিহ্বামূল বা জিভের গোড়ালি উঁচু করলে কোমল তালুর সামনে বা মাঝে লেগে যদি ধ্বনি উদ্গত করে, তার নাম জিহ্বামূলীয় পশ্চাৎ তালুজাত বা কোমল তালুজাত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি।

গ. দন্ত্য (dental) ব্যঞ্জনধ্বনি—জিভের ডগা যদি উপর-পাটি দাঁতের সঙ্গে লাগে, এবং তাতে যদি ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তার নাম দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন ত, থ, দ, ধ ইত্যাদি।

ঘ. দন্তমূলীয় (alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি—জিভের ডগা যদি উপর পাটি দাঁতের গোড়া-সংলগ্ন মাড়ি কিংবা দন্তমূলের সাথে লাগে এবং তাতে যদি ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকে বলে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, র, ল, স, য (z), ন, হ্ন, হ্ল, হ্ম।

ঘ. (১) প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি— জিভের পাতার দু'পাশ চ্যাপটা ও চওড়া করে উপর- পাটি দাঁতের মাড়ি ও শক্ত তালুর অগ্রভাগ এবং দু-

পাশ স্পর্শ করলে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, তাকে বলে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন-ধ্বনি। যেমন, চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদি।

ঘ. (২) পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post-alveolar) ব্যঞ্জনধ্বনি—জিভের পাতা উঁচু ক'রে দাঁতের গোড়ার শেষাংশে ও শক্ত তালুর প্রারম্ভের স্থানে লাগলে যে ধ্বনির উচ্চারণ হয়, তাকে বলে পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, শ।

ঘ (৩). দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (alveolo-retroflex) ব্যঞ্জনধ্বনি : জিভের ডগা একটু উল্টো ক'রে উপর- পাটি দাঁতের গোড়ার সাথে লাগলে একপ্রকার ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় ইত্যাদি।

ঙ. ওষ্ঠ্য (labial) ব্যঞ্জনধ্বনি-দুঠোঁটের সংস্পর্শজাত ধ্বনির নাম ওষ্ঠ্য ধ্বনি। যেমন, প, ফ, (ph), ব, ভ, (bh) ম, ম্ব, অন্তস্থ 'ব' (w)

চ. দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental) ব্যঞ্জনধ্বনি : দাঁতের উপর- পাটির দিকে নিচের ঠোঁটকে উঁচু করলে এক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি উদ্গত হতে পারে, তাকে বলে দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, ফ, (f, o) ভ (v β) ইত্যাদি।

২. **উচ্চারণ-স্থানে বায়ুপথের রূপ দেখে :** উচ্চারণ-স্থানে বায়ুপথের রূপ দেখে অর্থাৎ উচ্চারণের রীতি অনুসারে আমাদের ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাস করা যেতে পারে--

ক. **স্পর্শ বা স্পৃষ্ট (Plosive) ব্যঞ্জনধ্বনি**

১. অঘোষ অল্পপ্রাণ—ক (k), চ (c), ট (t), ত (t), প (p)।
২. অঘোষ মহাপ্রাণ—খ (kh), ছ (ch), ঠ (th), থ (th) ফ (ph)।
৩. ঘোষ অল্পপ্রাণ—গ (g), জ (j), ড (d), দ (d), ব (b)।
৪. ঘোষ মহাপ্রাণ—ঘ (gh), ঝ (jh), ঢ (dh), ধ (dh), ভ (bh)।

খ. **ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট (Affricate) ব্যঞ্জনধ্বনি**

১. অঘোষ স্বল্পপ্রাণ—চ (ts)
২. অঘোষ মহাপ্রাণ—ছ (tsh)
৩. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ—জ (dz)
৪. ঘোষ মহাপ্রাণ—ঝ (dzh)

গ. **নাসিকা (Nasal) ব্যঞ্জনধ্বনি**

১. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ—ঙ, ন, ম।
২. ঘোষ মহাপ্রাণ—হ্ন (হ্ ন), হ্ম (হ্ ম)

ঘ. **তাড়নজাত (Flapped) ব্যঞ্জনধ্বনি**

১. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ—ড়
২. ঘোষ মহাপ্রাণ—ঢ়

ঙ. কম্পনজাত (Trill) ব্যঞ্জনধ্বনি

১. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ বা তরল (Liquid)—র

২. ঘোষ মহাপ্রাণ—হ্র (হ্ র)

চ. পার্শ্বিক (Lateral) ব্যঞ্জনধ্বনি

১. ঘোষ স্বল্পপ্রাণ বা তরল (liquid) —ল

২. ঘোষ মহাপ্রাণ—হ (হ্ ল)

ছ. উষ্ম (শিস্‌ধ্বনি) বা শ্বাসজাত (Fricative) ব্যঞ্জনধ্বনি

১. দন্তমূলীয় ঘোষ —য (z)

২. দন্তমূলীয় অঘোষ মূর্ধন্য—ষ

৩. অগ্রদন্তমূলীয় অঘোষ—স

৪. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ—শ

৫. ওষ্ঠ্য ঘোষ স্বল্পপ্রাণ—ব

৬. দন্তৌষ্ঠ্য অঘোষ স্বল্পপ্রাণ —ফ (f, ϕ)

৭. দন্তৌষ্ঠ্য ঘোষ মহাপ্রাণ—ভ (vβ)

৮. কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত—হ (h)

৯. কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত অঘোষ— ঃ (বিসর্গ-h)

জ. উপস্বর (ব্যঞ্জন বিভাগে (Consonantal Vowel হিসেবে)

ই (যায়—jai) ; এ (যায়—jay) ; য় (শোয়—soy) ; উ (বউ—bou) ।

উচ্চারণ স্থানে বায়ুপথের রূপ দেখে অর্থাৎ উচ্চারণের রীতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির আলোচ্য বিন্যাসের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

ক. স্পর্শ বা স্পৃষ্ট (Plosive) ব্যঞ্জনধ্বনি—ফুসফুস থেকে আগত বাতাস ধ্বনি সংগঠনের জন্যে দুটো উচ্চারণ স্থানের সংস্পর্শে কিছুক্ষণের বিরতি এবং তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ হয়, তারই স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি। এখানে লক্ষ্যণীয় হলো —

১. ধ্বনি সংগঠনের জন্যে দুটি উচ্চারণ স্থানের সংস্পর্শ ;

২. সংস্পৃষ্ট অবস্থায় উচ্চারণ- স্থান দুটোর কিছুক্ষণ অবস্থান ;

৩. উচ্চারণ-স্থান দুটো পৃথক হয়ে বাতাস বার হয়ে যাওয়া। যেমন, ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ইত্যাদি।

খ. ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট (Affricate) ব্যঞ্জনধ্বনি—স্পর্শধ্বনি তিনটি পর্যায়ে অতিরিক্ত উচ্চারক স্থানদ্বয় আলগা হয়ে বাতাস বেরোবার মুহূর্তে জিভ ও দন্তমূলের মধ্যে একটু ঘষা লাগার ফলে উৎপন্ন হয় এই ধ্বনি— যেমন, চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদি।

গ. নাসিক্য (Nasal) ব্যঞ্জনধ্বনি—মুখবিবর অথবা ঠোঁট বন্ধ হয়ে নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারিত হবার সময় উচ্চারকেরা (articulators) পরস্পর স্পর্শিত হয় ; আর

সঙ্গে সঙ্গে কোমল তালু নিচের দিকে নেমে আসে বলে নাসাপথ (Naso-Pharynx) মুক্ত হওয়ায় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে না বেরিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ায় আমরা যে ধ্বনি পাই তার নাম নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি. স্পর্শধ্বনির তিনটি পর্যায়ের দুটো পর্যায় (১. মুখবিবরে কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) ধ্বনি সংগঠন এবং ২. কিছুক্ষণের জন্যে ঐ অবস্থায় উচ্চারকদের অবস্থান) এখানেও রক্ষিত হয়. কেবল তৃতীয় পর্যায়ের পরিবর্তে কোমল তালু ঝুলে পড়ার ফলে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকায় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে বেরোতে পারে। নাসিক্য ধ্বনির বিশিষ্টতা হলো, ইচ্ছেমতো বক্তা একে প্রলম্বিত করতে পারে, সে জন্য এর আরেক নাম প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি। যেমন, ঙ, ন, ম, হ্ন (ন্ হ), হ্ম (ম্ হ)।

ঘ. **তাড়নজাত (Flapped) ব্যঞ্জনধ্বনি**— সামান্য স্পর্শ করে জিভের ডগা যদি মুখবিবরের মধ্যে বায়ুপথকে রোধ করে, তাহলে একধরনের ধ্বনি পাওয়া যায়, তার নাম তাড়নজাত ধ্বনি. এই ধ্বনি উপর-পাটি দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগার উল্টো পিঠের স্বল্পস্থায়ী সংস্পর্শজাত। যেমন, ড়, ঢ়

ঙ. **কম্পনজাত (Trilled) ব্যঞ্জনধ্বনি**— ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস যদি মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় জিভের কোনো অংশের কিংবা আলাজিভের দ্রুত ও ঘন ঘন কঁপন সৃষ্টি করে, তখন একধরনের ধ্বনি উৎপন্ন হয়, যার নাম কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন—র, হ্র (র্ হ)।

চ. **পার্শ্বিক (Lateral) ব্যঞ্জনধ্বনি**— মুখবিবরকে পাশ থেকে ভাগ করলে তার ঠিক মাঝামাঝি স্থানে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাসের গতিপথ ব্যাহত হলে যে ধ্বনির উদ্গম হয় তার নাম পার্শ্বিক ধ্বনি. এখানে ধ্বনিটি মুখের পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত হয় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, ল, হ্ল (ল্ হ)।

ছ. **উষ্ম ধ্বনি (শিসধ্বনি) বা শ্বাসজাত (Fricative) ব্যঞ্জনধ্বনি**—ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখবিবরের নানা স্থানে বায়ুপথ সংকীর্ণ হওয়ার ফলে যদি ঘষা লাগে বা চাপা খায়, তাহলে সাপের শ্বাস ছাড়বার মতো একধরনের শিসধ্বনির সৃষ্টি হয়, তারই নাম উষ্ম[১] (শিসধ্বনি) বা শ্বাসজাত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, য (z) ; য, স, শ, ফ (f, ϕ), ভ, (vβ) ; হ (h) ঃ (বিসর্গ-h) ইত্যাদি।

জ. **উপস্বর** (ব্যঞ্জন বিভাগে যার নাম (Consonantal Vowel) —ফুসফুস নির্গত বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লাগা-লাগা পর্যায়ে এসে পৌঁছাবার মতো কোনো অবস্থায়ও যদি তা যথাযথ ঘষা লাগে না বলে উপস্বরধ্বনি, ঘর্ষণজাত ধ্বনি নয়, তেমনি বায়ুপথের সংকীর্ণতম অবস্থায় উচ্চারিত বলে দ্যোতনার দিক থেকে স্বর বা ব্যঞ্জনের তুলনায় উপস্বর লঘুভার। কথা বলার মুহূর্তে অনর্গল ধ্বনি স্রোতের দুই স্বরের মাঝখানে সাধারণত এর অবস্থান। যেমন —নোয়া (ো ব া) ; পোয়া (ো ব া) ইত্যাদি। দ্বিস্বরধ্বনি পতনশীল অবস্থায় শেষ স্বরটি অসম্পূর্ণ থাকায়ও উপস্বরের উদ্ভব হতে পারে। যেমন, নয়, যায় ই ইত্যাদি।

---

১ উষ্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিশ্বাস।

৩. **তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থার মাধ্যমে :** তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো দু'ভাবে ভাগ করা যায়—

ক. নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি—ঙ, ন, ম।

খ. অনাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি—ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, র, হ, ল, হ্ল (ল্ হ), ড়, ঢ়, হ, শ, স ইত্যাদি।

এদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

ক. নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি —এগুলোর উচ্চারণের সময় কোমল তালু ঝুলে নিচে নেমে আসে অর্থাৎ মুখের বিশ্রামকালীন কথা-না-বলা অবস্থায় থাকে

খ. অনাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি—ঙ, ন, ম ছাড়া অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে কোমল তালু চাড়া খেয়ে উঠে নাসাপথ বন্ধ ক'রে দেয়।

৪. **স্বরযন্ত্রের অবস্থার উপর ভিত্তি ক'রে :** স্বরযন্ত্রের অবস্থার উপর ভিত্তি ক'রে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে বিচার করলে তারা দু'ভাগে বিভক্ত হবে—(ক) ঘোষধ্বনি[১] (Voiced Sound) এবং (খ) অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced sound).[২]

ক. ঘোষ (Voiced) ব্যঞ্জনধ্বনি—যে সব ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের (Larynx) ভেতরের স্বরতন্ত্রী (Vocal cords) রীতিমতো কম্পিত হয়, তার নাম ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি- যেমন, গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, ঙ, ন, ম, র, ল, ড়, ঢ়, হ, রহ, মহ, লহ, নহ ইত্যাদি

খ. অঘোষ (Unvoiced) ব্যঞ্জনধ্বনি—যে সব ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের (Larynx) ভেতরকার স্বরতন্ত্রী (Vocal cords) রীতিমতো প্রকম্পিত হয় না, তার নাম অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি।

যেমন, ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, শ, স ইত্যাদি।

৫. **স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা বিচার করে :** এভাবেও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ভাগ করলে দুভাগই হয়—(ক) স্বল্পপ্রাণতা, (খ) মহাপ্রাণতা

ক. স্বল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি—ফুসফুস থেকে আগত বাতাসের চাপের স্বল্পতা বশত : যে ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ সম্ভব হয়, তার নাম স্বল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রথম (ক, চ, ট, ত, প) ও তৃতীয় (গ, জ, ড, দ, ব) ; এবং র, ল, ড়, ন, ম, ঙ, শ, স ইত্যাদি। বাতাসের চাপের স্বল্পতার নামই স্বল্পপ্রাণ। এইজন্যে ফুসফুস তাড়িত বাতাস স্পর্শধ্বনির উচ্চারক দুটোর পেছনে এসে জমা হয় এবং উচ্চারক দুটো আলগা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো ধ্বনি ক'রে বাতাস বেরিয়ে যায়—এ ব্যাপারটি স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ দুরকম ধ্বনির বেলায়ই

---

১ আগের দিনে যখন ভাষাতত্ত্বের পাঠ শুরু হয় তখন ঘোষ ধ্বনিকে বলা হতো নাদ ধ্বনি, কোমল ধ্বনি (soft or mediac Sound).

২ আর তখনকার দিনে অঘোষ ধ্বনির নাম ছিল শ্বাসধ্বনি (breath or hard sounds).

প্রযোজ্য হলেও মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস- তাড়িত এই বাতাসের বেগ যতো বেশি হয়, স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণকালে তার বেগ ততো প্রবল হয় না-- - মহাপ্রাণ ধ্বনির সাথে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মূল পার্থক্য এটাই।

খ. মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি : ফুসফুস থেকে আগত বাতাসের চাপের আধিক্য হেতু যেসব ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ করা হয়, তাদেরকে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। যেমন, বর্গীয় দ্বিতীয় (খ, ছ, ঠ, থ, ফ) ও চতুর্থ (ঘ, ঝ, ড, ধ, ভ) এবং ঢ়, হ, হ্ন (ন হ), হ্ম (র হ), হ্ম (ম হ), হ্ল (ল হ) ইত্যাদি।

বৈদিক আর্য ভাষা থেকে অগত আধুনিক আর্য ভাষার ধ্বনিগুলোতেও বৈদিক ঐতিহ্য প্রবাহমান গতিতে চলে এসেছে বলে সেই ভাষার স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা বাংলা ভাষায় আজো রক্ষিত। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস স্পর্শধ্বনি উচ্চারণকালে উচ্চারকদ্বয়ের পেছনে এসে জমে এবং তারা (উচ্চারকদ্বয়) আলগা হওয়ার সময় ফটকার মতো ধ্বনির সৃষ্টি করে বাতাস বেরিয়ে যায় --মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে সেই ফুসফুসতাড়িত বাতাসের বেগ হয় বেশি। যার জন্যে ওই উচ্চারকদ্বয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে ফটকার মতো আওয়াজটিও হয় প্রায় দ্বিগুণ জোরে : এ কারণেই স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে তা স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-স্থান সম্পর্কিত নিম্নের চার্টটি লক্ষ্য করলে বাংলার ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ বিশিষ্টতাও খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে।

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

		Bi-labial	Labio-dental	Dental and Alveolar	Retroflex	Palato-alveolar	Alveolo-palatal	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngal	Glottal
CONSONANTS	Plosive	p b		t d	ʈ ɖ			c ɟ	k g	q ɢ		ʔ
	Nasal	m	ɱ	n	ɳ			ɲ	ŋ	ɴ		
	Lateral Fricative			ɬ ɮ								
	Lateral Non-fricative			l	ɭ			ʎ				
	Rolled			r						ʀ		
	Flapped			ɾ	ɽ					ʁ		
	Fricative	ɸ β	f v	θ ð | s z	ʂ ʐ	ʃ ʒ	ɕ ʑ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
	Frictionless Continuants and Semi-voweis	w | ɥ	ʋ	ɹ				j (ɥ)	(w)	ʍ		

								Front	Central	Back			
VOWELS	Close	(ɨ ʉ ɯ)						i y	ɨ ʉ	ɯ u			
	Half-close	(ɘ ɵ)						e ø		ɤ o			
	Half-open	(ɛ œ)						ɛ œ	ɜ	ʌ ɔ			
	Open	(a)							a	ɑ ɒ			

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

১. অর্ধ দৈর্ঘ নির্দেশক চিহ্ন ·

২. পূর্ণ দৈর্ঘ নির্দেশক চিহ্ন :

৩. স্বরধ্বনির অনুনাসিকত্ব সূচক চিহ্ন ~

বর্ণ

i (ই)

i : (ঈ)

e (এ)

e : এ (দীর্ঘ)

æ অ্যা

æ : (দীর্ঘ)

a আ

a : আ (দীর্ঘ)

ɔ অ

ɔ : অ (দীর্ঘ)

v —

o ও

ɔ —

ɔ : —

u উ

u : ঊ

k ক

kh খ

g গ

gh ঘ

Plosive
- c চ
- ch ছ
- j জ
- jh ঝ

Affricate
- tʃ, ts চ (ঢাকার কুটি উপভাষায়)
- tʃh, tsh ছ (,,)
- dz জ (,,)
- dzh ঝ (,,)

Fricative
- c চ (বাংলাদেশের উপভাষায়)
- ch ছ (,,)
- z ঝ (,,)
- zh জ (,,)

ʈ ট

ʈ h ঠ

ɖ ড

ɖ h ঢ

t ত

th থ

θ —

d দ

ð —

dh ধ

P (প)

Ph (ফ)

f —

b (ব)

bh (ভ)

v —

ŋ (ং, ঙ)

ɲ (ঞ)

n (ন')

n (ন)

m (ম)

r (র)

l (ল)

ɽ (ড়)

ɽ h (ঢ়)

ʃ (শ)

s (স)

h (হ)

ɔ —

j (ই)

w (ব-অন্তঃস্থ)

x —

γ —

ɸ (ফ্)

— ( )

॥ বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ ॥

	১	২	৩	৪	৫	৬
অ						
আ						
ই						
ঈ						
উ						
ঊ						
ঋ						
এ						
ঐ						
ও						
ঔ						
ক						
খ						
গ						
ঘ						
ঙ						
চ						
ছ						
জ						
ঝ						
ঞ						

১. এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (৯৮০ খৃঃ)
২. কালচক্রাবতার (১১২ খৃঃ)
৩. গুহ্যাবলী বিবৃতি (১১৯৮ খৃঃ)
৪. পঞ্চরক্ষা (১৩শ শতাব্দী)
৫. বোধিচর্জাবতার (১৪৩৫ খৃঃ)
৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৫শ শতাব্দী)

	১	২	৩	৪	৫	৬
ট	ট	ট		ট	ট ট	ট
ঠ	ঠ				০	ঠ
ড	ড	ড		ড	ড	ড
ঢ		ঢ	ঢ		ঢ	ঢ
ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ
ত	ত	ত	ত	ত	ত	ত
থ	থ	থ	থ থ	থ থ	থ	থ
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন
প	প	প	প . প	প	প প	প
ফ		ফ		ফ	ফ	ফ ফ
ব	ব	ব	ব	ব	ব	ব

	১	২	৩	৪	৫	৬
ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ
ম	ম	ম	ম	ম	ম	ম
য	য	য	য	য	য	য
র	র	র	র	র	র	র
ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল
ব	ব	ব	ব		ব	ব
শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ শ
ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ
স	স	স	স	স	স	স
হ	হ	হ হ	হ	হ	হ	হ

বাংলা ভাষায় স্পর্শধ্বনি

একথা বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিটি ধ্বনিই প্রতিটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্যই প্রতিটি ধ্বনিকে বিশিষ্টতা দান করেছে বলে তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র অর্থ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশিষ্টতা স্বরধ্বনি প্রসঙ্গে যতোটা সত্যি, ব্যঞ্জনধ্বনির বেলায়ও ঠিক ততোখানিই প্রযোজ্য।

তবু কোনো কোনো ধ্বনি নিজের স্বাতন্ত্র্যের মাঝখানেও হয় উচ্চারণস্থানের অদূরত্ব বা উচ্চারণরীতির কারণে কাছাকাছি বলে মনে হতে পারে। এই সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেই ধ্বনিগুলোকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনির প্রতিটি ধ্বনি থেকে প্রতিটি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র — তবু স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যে এমন একটা মিল রয়েছে, যা তাদেরকে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো থেকে আলাদা করেছে; ঠিক তেমনিভাবেই বলা যায়, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রতিটি ধ্বনি বিচ্ছিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও সামগ্রিকভাবে এর আলাদা বৈশিষ্ট্য স্বরধ্বনি থেকে এদেরকে বিভিন্ন করে রেখেছে। আবার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যেও এমনি কতোই না ভাগ — স্পর্শ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, পার্শ্বিক ধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনি, তাড়নজাত ধ্বনি, উষ্ম ধ্বনি ইত্যাদি

বাংলা ভাষার স্পর্শ ধ্বনিগুলো সংখ্যায়ও যেমনি বেশি, আমাদের লিপির শ্রেণি বিজ্ঞানে অন্য ধ্বনিগুলোর তুলনায় এগুলো অনেক বেশি সুবিন্যস্ত। এদের বিশিষ্টতা সত্যি মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করার মতো। এই ধ্বনিগুলোর সবচেয়ে বড় গুণ এদের 'স্পর্শতা' - যা তিন তিনটি পর্যায়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়

(ক) ধ্বনি সংগঠনের জন্যে ঐ ধ্বনির প্রয়োজন মতো উচ্চারণ-স্থানদ্বয়ের সংস্পর্শ;

(খ) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে উচ্চারকদ্বয়ের অবস্থান; এবং

(গ) অতঃপর উচ্চারকদ্বয়ের পৃথক হয়ে যাওয়ার দরুন বাতাস বেরিয়ে যাওয়া।

এই সাধারণ গুণগুলো স্পর্শধ্বনি (ক-বর্গীয়, চ-বর্গীয়, ট-বর্গীয়, ত-বর্গীয় এবং প-বর্গীয়) গুলোর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণের স্থান অনুসারে এরা পাঁচটি ছোট শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আবার উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী এই পাঁচ শাখার প্রত্যেক শাখায় চারটি ধ্বনিই বিশেষ বিশেষ গুণে প্রত্যেকটি থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। তাই এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

ক-বর্গীয় ধ্বনি (ক, খ, গ, ঘ)

আমরা জানি, ধ্বনি পরিবর্তনশীল। তাই আজ থেকে বহু বছর আগে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতকে যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ ব্যাকরণবিদদের সময়ে বাংলা ক-বর্গীয় (ক, খ, গ, ঘ) ধ্বনিগুলো কণ্ঠধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হতো। কিন্তু আজকের যুগে এসে ধ্বনি পরিবর্তনের বিপর্যয়ের ফলে এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থানের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে।

এখন এই ধ্বনিগুলো পশ্চাৎ তালুজাত স্পর্শধ্বনি। এগুলোর উচ্চারণে জিভের পশ্চাৎভাগ কোমল তালুর দিকে উঁচু হয়। কোমল তালুতে চাড় লাগে, আর বিশ্রামকালীন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা উঁচু হয়, আর এদিকে জিভের পশ্চাৎভাগও উঁচু হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটায়। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস ইতাবসরে পশ্চাৎ-জিহ্বা এবং পশ্চাৎ তালুর সংস্পৃষ্ট অবস্থায় পিছনে এসে আটকা পড়ে। ক্ষণমুহূর্ত পরেই এদের সংস্পৃষ্ট অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয় এবং এদের পেছনের অবরুদ্ধ বাতাসও মুখপথে ফট্ ক'রে বেরিয়ে যায়।[১] এতে দেখা যাচ্ছে, একই স্থান থেকে এই চারটি ধ্বনিই উচ্চারিত আর সেই হিসেবেই এগুলোর নামকরণ জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাৎ তালুজাত করা বাঞ্ছনীয়। এই উচ্চারণস্থান এবং স্পর্শতাগুণ সাধারণভাবে চারটি ধ্বনির মধ্যে সমান হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণের রীতি অনুসারে প্রতিটি ধ্বনি অন্য ধ্বনিগুলো থেকে স্বতন্ত্র। যেমন,

ক – স্বল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। কারণ, এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় (১) স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠে না ; এবং (২) সংস্পৃষ্ট উচ্চারক দুটো মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত হয় নি। এই ধ্বনিটি অঘোষ ধ্বনি, তার কারণ এর উচ্চারণের সময়ই স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না বলে ; এটি স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি, কারণ রুদ্ধ বাতাস বেরোনোর সময় সজোরে না বেরিয়ে সাধারণভাবে বেরিয়ে আসে বলে।

তাহলে ক ধ্বনিকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করে নাম দিতে পারি **জিহ্বামূলীয় অঘোষস্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (unvoiced-unaspirated velar plosive sound)** ক-বর্গীয় অন্যান্য ধ্বনি থেকে এর স্বাতন্ত্র্য হয় স্বল্প প্রাণতা কিংবা অঘোষতার জন্যে।

খ = মহাপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। খ-এর উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয়ের পেছনের দিকে ফুসফুস-আগত বাতাস বেরোবার সময় ফটকার মতো সজোরে নিষ্ক্রান্ত হয় বলে তা মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়েছে। ক-এর সঙ্গে খ-এর সম্পূর্ণ সমিলতা থেকে মাত্র এই একটি বৈশিষ্ট্যই ধ্বনি দুটোকে পৃথক ক'রে দিয়েছে। তাই খ-এর বর্ণনা এভাবে দেয়া যেতে পারে, **জিহ্বামূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (unvoiced aspirated velar plosive sound)**।

গ = স্বল্পপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। এর উচ্চারণকালে ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরোবার সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় বলে তা ঘোষতা লাভ করে। আর এটাই ক ও খ থেকে একে আলাদা ক'রে দিয়েছে। এবং গ এর সংস্পৃষ্ট উচ্চারক দুটি মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত না হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে যায় বলে গ-স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি। এখন তাহলে গ-এর বর্ণনা এভাবে করা যায় — **জিহ্বামূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ ধ্বনি (voiced unaspirated velar plosive sound)**

ঘ = মহাপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি হয় বলে ঘ ঘোষ ধ্বনি এবং ঘ-এর সংস্পৃষ্ট উচ্চারকদ্বয় মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে ফটকার মতো নিষ্ক্রান্ত হয় বলে তা মহাপ্রাণ ধ্বনি। তাই ঘ-এর বর্ণনা হবে, **জিহ্বামূলীয় মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি (voiced aspirated velar plosive sound)**।

---

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই ; সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে চারটি ধ্বনির গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে সাজালে আমাদের বুঝবার সুবিধে হতে পারে :

ক –	স্পর্শ +	জিহ্বামূলীয় +	অঘোষ + স্বল্পপ্রাণ
খ –	স্পর্শ +	জিহ্বামূলীয় +	অঘোষ + মহাপ্রাণ
গ –	স্পর্শ +	জিহ্বামূলীয় +	ঘোষ + স্বল্পপ্রাণ
ঘ =	স্পর্শ +	জিহ্বামূলীয় +	ঘোষ + মহাপ্রাণ

ক, খ, গ ও ঘ ধ্বনি চারটির নামকরণ ক–বর্গীয় করেছিলেন পাণিনি। তার কারণ প্রতিটি ধ্বনি স্বতন্ত্র হলেও পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও স্পর্শতা গুণের সমন্বয় রয়েছে। প্রাগ্ স্কুলের সুইজ জার্মান ধ্বনিবিদ ট্রুবেট্‌জকয় এদের মধ্যকার 'bundle of co-relation' এবং 'opposition counter'- এর উল্লেখ করেছেন। Co-relation অর্থাৎ ঐক্য এই চারটি ধ্বনিতে যেমনি দেখা যায়, তেমনি opposition বা বৈপরীত্যও এদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। সেই দিক দিয়ে বিচার করে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই একটি ছকে এদেরকে আবদ্ধ করেছেন —

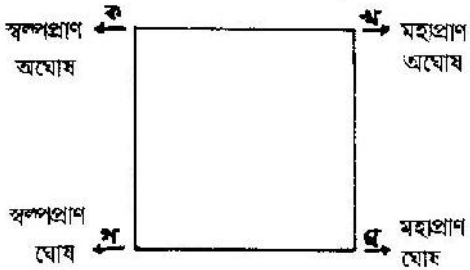

এখানে চারটি ধ্বনি সহযোগে চারটি শব্দ তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের ক–বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পার্থক্যবশত অন্য সবটুকু মিল থাকা সত্ত্বেও শ্রোতার কানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধকতার সৃষ্টি করে :

কোল = ক্ + ওল (ছেলেটা কাঁদছে, কোলে নাও না গো)
খোল – খ্ + ওল (বাদ্যি বাজে, সঙ্গে বাজে খোল)
গোল – গ্ + ওল (পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল)
ঘোল = ঘ্ + ওল (ওর মাথায় ঘোল ঢালো)

উধৃত চারটি শব্দের শেষাংশে 'ওল'–এর সাথে কেবলমাত্র ক্, খ্, গ্, ঘ্ ধ্বনিগুলো পাল্টে দেয়ায় অর্থে এই বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, কেননা এই চারটি ধ্বনির মধ্যে পারস্পরিক মিলের সাথে পারস্পরিক পার্থক্য যা রয়েছে, তা একেবারে কম নয়।

চ–বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ)

উচ্চারণ–স্থান এবং স্পর্শ গুণ এক হওয়া সত্ত্বেও ক–বর্গীয় প্রতিটি ধ্বনিই যেমন স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার, সবকটি বর্গীয় ধ্বনি সম্পর্কেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে প্রাচীন ব্যাকরণে তালব্য-ধ্বনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আধুনিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে এগুলোর উচ্চারণ-স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় এখন এর নাম পাল্টে গেছে ; এর উচ্চারণ স্থান নির্ণীত হয়েছে প্রশস্ত দন্তমূল এবং তার ফলে নামকরণ করা হয়েছে **প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি (dorso alveolar)** কারণ দেখা গেছে, এই ধ্বনিগুলো শক্ত ও নরম তালুর সঙ্গে জিভের প্রয়োজনীয় অংশের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়। চ, ছ, জ, ঝ এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের মুহূর্তে জিভের ডগা এবং তৎসংলগ্ন পেছনের অংশ অর্থাৎ জিভের পাতাকে দন্তমূলের পশ্চাৎ ভাগের এবং অগ্রতালুর অংশবিশেষের সঙ্গে রীতিমতো প্রশস্তভাবে মেলে ধরে — 'জিভের ডগা নিচের পাটি দাঁতের গায়ে লেগে থাকে—ফলে জিভের পাতার সবটুকু চাপই পড়ে পশ্চাৎ দন্তমূলের উপরে।' লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে, উপরের মাড়ির দু'পাশ ঘেঁষে এমন চওড়াভাবে উঁচু হয় যে, জিভের দু'পাশ দু'মাড়ি দু'পাশকেও রীতিমতো ছুঁয়ে যাচ্ছে।

অনেকের মতে চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি, অবার কারো কারো মতে উষ্ম বা শিসধ্বনি ; প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির উচ্চারণে আধুনিক ধ্বনিতাত্ত্বিকদের অবলম্বন **একজন বিশেষ মানুষের উচ্চারণ পদ্ধতি** ; কিন্তু গোটা দেশের বা ভাষাভাষী মানুষের উচ্চারণে যদি এর পার্থক্য হয়, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বাংলার সাধারণ কথ্য রীতির উচ্চারণ পরীক্ষায় তা স্পর্শ ধ্বনি হিসেবেই আধুনিক গবেষণাগারে ধরা পড়ায় একে স্পর্শ ধ্বনি হিসেবেই এখানে গ্রহণ করা হলো।

চ = স্বল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি অর্থাৎ এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টিও যেমন হয় না, তেমনি এর সংস্পৃষ্ট উচ্চারক দু'টো মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে যায়। তাই চ-র বর্ণনা এভাবে দেয়া যেতে পারে, প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ ও স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি **(dorso-alveolar unvoiced unaspirated plosive sound)**

ছ = মহাপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। এর উচ্চারণেও স্বরতন্ত্রীতে কোনো কম্পন হয় না বলে ছ অঘোষ ধ্বনি। আর উচ্চারণে এর উচ্চারক দুটো মুক্ত হবার সময় পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে ফটকার ন্যায় বার হয়ে যায় বলে তা মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই ছ এর বর্ণনা হবে, **প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (dorso alveolar unvoiced aspirated plosive sound)**।

জ = স্বল্প প্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি হয় বলে ঘোষতা গুণ সমন্বিত হচ্ছে। অন্যদিকে এর উচ্চারকদ্বয় মুক্ত হবার সময় বাতাস স্বাভাবিকভাবে বেরোয় বলে স্বল্পপ্রাণ। জ-এর বর্ণনা তাই প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি **(dorso alveolar voiced unaspirated plosive sound)**

ঝ = মহাপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী যেমনি প্রকম্পিত হয়, তেমনি উচ্চারণ কালে বাতাস বেরোবার বেগ হয় বেশি। তাই ঝ এর বর্ণনা হবে **প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (dorso alveolar voiced unaspirated plosive sound)**।

সহজবোধ্য করার জন্য এই চারটি ধ্বনিকে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

চ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + স্পর্শ + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ
ছ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + অঘোষ
জ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + স্পর্শ + স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ
ঝ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + ঘোষ

ক–বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতোই 'bundle of co-relations' এবং 'opposition counters' চ–বর্গীয় ধ্বনিগুলোরও বৈশিষ্ট্য। তাই ক–বর্গীয় ধ্বনির মতো এদের ঐক্য এবং অনৈক্যগত দিক থেকে সাজানো যায়—

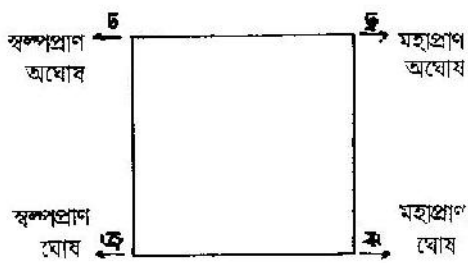

আর অর্থগত পার্থক্যও এর প্রতিটি ধ্বনি সহযোগে দেখানো সম্ভব :

চাল্ = চ্ + আল্ (আজ ঘরে চাল্ বাড়ন্ত।)
ছাল্ = ছ্ + আল্ (জিকার ছাল্ খুবই উপকারী।)
জাল্ = জ্ + আল্ (আজ জালে কতো মাছ পেলে।)
ঝাল্ = ঝ্ + আল্ (তরকারীতে আজ বড় ঝাল হয়েছে।)

'আল্'–এর পূর্বভাগে চ, ছ, জ, ঝ যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

ট–বর্গীয় ধ্বনি (ট, ঠ, ড, ঢ)

ট–বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে প্রাচীনকাল থেকে মূর্ধন্য ধ্বনি বা মূর্ধা থেকে উচ্চারিত ধ্বনি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল এই ধ্বনিগুলো 'দ্রাবিড়– পূর্ব যুগের ধ্বনি' বা 'proto-dravidian ধ্বনি বলে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত তামিল, তেলেগু, মালায়ালম ও কনাড় এবং উত্তর ভারতীয় আর্য গোত্রভুক্ত মারাঠীতে এই মূর্ধা থেকে উচ্চারণের রীতি আজো প্রচলিত রয়েছে। বাংলাতে কিন্তু তার পরিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক গবেষণায় ধরা পড়েছে, ট–বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণে জিভের ডগা সামান্য একটু পাল্টে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দন্তমূলকে স্পর্শ করে তবে একেবারে সেঁটে যায় না বা নিচের পাটি দাঁতকে সটান শায়িত অবস্থায় স্পর্শ করে না, শুধুমাত্র দুমড়ে যায় একটুখানি জিভের ডগার এই সামান্যতম দুমড়ানোর ফলে মুখবিবরে ফুসফুস থেকে আগত বাতাস কিছুটা প্রতিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে। বায়ুপথের এই সামান্যতম প্রতিবেষ্টনের (retroflexion) ফলশ্রুতি হিসেবে এই ধ্বনিগুলোর ব্যঞ্জনা কোমল বা মধুর ততোটা না হয়ে হয় খানিকটা গম্ভীর ধরনের (তবে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত

ভাষার ট–বর্গীয় ধ্বনির মতো গুরুভার নয়)। এজন্যেই এই ধ্বনিগুলো **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত বা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট ধ্বনি (alvealoretroflex plosive sound)**।

ট = স্বল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীর কম্পনহীনতার জন্যে ট অঘোষ ধ্বনি ; এবং উচ্চারণকালে উচ্চারকদ্বয়ের পেছনকার রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে নির্গত হওয়ার জন্যে তা স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি এইজন্যে ট–এর বর্ণনা হলো **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (alvealo-retroflex unvoiced unaspirated plosive sound)**।

ঠ – মহাপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। এর উচ্চারণেও স্বরতন্ত্রী অকম্পিত হয় কিন্তু বাতাস নির্গমনে ফটকার মতো আওয়াজ হয় বাতাসের জোর বেশি থাকার দরুন। অতএব ঠ–কে বর্ণনা করা যায়, **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি (alvealo-retroflex unvoiced aspirated plosive sound)**।

ড = স্বল্পপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। ড–এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উচ্চারণে বাতাস স্বাভাবিকভাবে বেরুবার ফলে ফটকার মতো আওয়াজ করে না বলে তা স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি। তাই ড–এর বর্ণনা হলো, **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (alvealo-retroflex voiced unaspirated plosive sound)**।

ঢ = মহাপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। ঢ–এর উচ্চারণ স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত এবং ফুসফুস নির্গত বাতাস সজোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে সম্ভব হয় বলে এর বর্ণনা হচ্ছে, **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (alvealo-retroflex voicd aspirated plosive sound)**। অর্থাৎ

ট =	দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত +	স্পর্শ – স্বল্পপ্রাণ +	অঘোষ
ঠ =	দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত +	স্পর্শ – মহাপ্রাণ +	অঘোষ
ড =	দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত +	স্পর্শ – স্বল্পপ্রাণ +	ঘোষ
ঢ =	দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত +	স্পর্শ – মহাপ্রাণ +	ঘোষ

'Bundle of co-relation' এবং 'opposition counter'–এর দিক দিয়ে বিন্যাস করলে ক ও চ–বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতোই হবে :

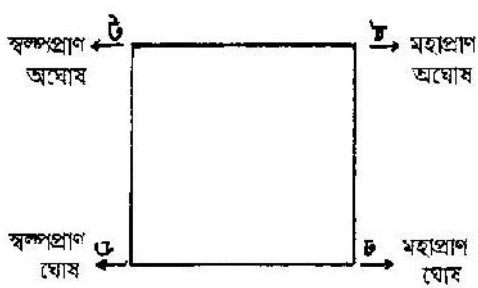

ট-বর্গীয় প্রতিটি ধ্বনি অন্য ধ্বনিগুলোর মতো স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সংগঠনে সক্ষম :
টন = ট + অন (এক টন কাগজ কিনেছি।)
ঠন = ঠ + অন (বুড়োটা ঠন ঠন ক'রে শীতে কাঁপছে।)
ডন = ড + অন (আমি পঞ্চাশটা বুক-ডন দিয়েছি।)
ঢন = ঢ + অন (ঢন ঢন ক'রে ঘণ্টা বাজলো।)

ত-বর্গীয় ধ্বনি (ত, থ, দ, ধ)

আমাদের দাঁতের উপর পাটির সামনের বড় দাঁত দুটোর সাথে জিভের ডগা যদি প্রশস্তভাবে স্পর্শ করে, তাহলে এই ধ্বনিগুলো পাওয়া যায়। জিভের ডগা বড় দাঁত দু'টোর গায়ে চেপে ধরার ফলে একদিকে জিভের উপর-পিঠের লম্বমান পাশ দুটো উঁচু হয়ে উপরের চোয়ালের দু'পাটি দাঁত স্পর্শ করে, অন্যদিকে জিভের ডগার উল্টো পিঠের নিচের ভাগ নিচের পাটি দাঁতের উপরের দিকে স্পর্শিত হওয়ার মতো হয়। দাঁত ও জিভের সক্রিয়তায় উচ্চারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জিভের ডগা ও উপরের দাঁত দু'টোর উপর চাপ প্রবল হওয়ায় এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ সম্ভব হয় বলে এদের নাম দন্ত্যধ্বনি

ত = স্বল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীতে কম্পন না হওয়ায় ত অঘোষ, এবং বাতাস নির্গমনে স্বাভাবিকতার কারণে তা স্বল্পপ্রাণ। ত-এর বর্ণনা তাই **অঘোষ প্রাণ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি (unvoiced unaspirated dental plosive sound)**।

থ = মহাপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রী অকম্পিত হয় বলে অঘোষ, কিন্তু উচ্চারণে বাতাস সজোরে নির্গমনের জন্যে মহাপ্রাণ ধ্বনি থ। যার বর্ণনা হবে, **অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পর্শ ধ্বনি (unvoiced aspirated dental plosive sound)**।

দ = স্বল্পপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীতে কম্পন হয় এবং উচ্চারণে বাতাস স্বাভাবিক ভাবে বের হয় বলে দ-এর বর্ণনা হবে **ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি (voiced unaspirated dental plosive sound)**

ধ = মহাপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। ধ-এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী যেমনি প্রকম্পিত হয়, তেমনি বাতাস নির্গমনে যথেষ্ট চাপ অনুভূত হয় বলে এর বর্ণনা **ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি (voiced aspirated dental plosive sound)**।

ত-বর্গীয় ধ্বনিগুলোও পরস্পর পরস্পরের সাথে ঐক্য ও অনৈক্যগত কারণে নিজেদের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল।

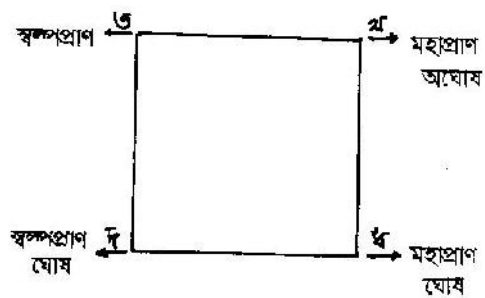

ত = দন্ত্য + স্পর্শ + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ
থ = দন্ত্য + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + অঘোষ
দ = দন্ত্য + স্পর্শ + স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ
ধ = দন্ত্য + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + ঘোষ

প্রতিটি ধ্বনির এই বিশিষ্টতাই নতুন নতুন অর্থ গঠনে সাহায্য করে :

তান্ = ত্ + আন্ (পাখির তানে ঘুম ভাঙলো যখন।)
থান্ = থ্ + আন্ (ডালিয়া আজ থান পরেছে।)
দান = দ্ + আন্ (দানের বদলে দান করে কয়জন।)
ধান্ = ধ্ + আন্ (ধান কাটা হলো সারা।)

প-বর্গীয় ধ্বনি (প, ফ, ব, ভ)

প-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের-স্থান ও রীতি চক্ষুগ্রাহ্য বলে এ সম্পর্কে যে কোনো লোক খুব সহজে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে পারে। মুখের বাইরের প্রত্যঙ্গ দুঠোঁট অবরোধ ও অবরোধ-মুক্তির ফলে যেসব ধ্বনির উদ্ভব হয়, তাই ওষ্ঠ্য ধ্বনি। ঠোঁটে উচ্চারিত এই ধ্বনিগুলোর অনুরণন ও ব্যঞ্জনা মুখবিবর নিঃসৃত ধ্বনিগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

প = স্বল্পপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি না হওয়ায় অঘোষ এবং উচ্চারণে বাতাস নির্গমণে স্বাভাবিকতার দরুন স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি প। এর বর্ণনা **অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (unvoiced unaspirated bilabial plosive sound)**।

ফ – মহাপ্রাণ ও অঘোষ ধ্বনি। ফ–এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি না হলেও বাতাস নির্গমন হয় সজোরে, তাই ফ মহাপ্রাণ যাকে বর্ণনা করলে দাঁড়াবে, **অঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (unvoiced aspirated bilabial plosive sound)**।

ব – স্বল্পপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাতাস বেরোয় স্বাভাবিকভাবে। তাই ব ঘোষ **স্বল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (voiced unaspirated bilabial plosive sound)**।

ভ = মহাপ্রাণ ও ঘোষ ধ্বনি। ভ–এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে যেমনি কাঁপন লাগে, তেমনি বাতাস বেরোয় সজোরে — তাই ভ হচ্ছে **ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি (voiced unaspirated bilabial plosive sound)**।

'Bundle of co-relation' এবং 'opposition counter' এই ধ্বনিগুলোকে নিম্নরূপ ভাবে সাজাতে সাহায্য করেছে :

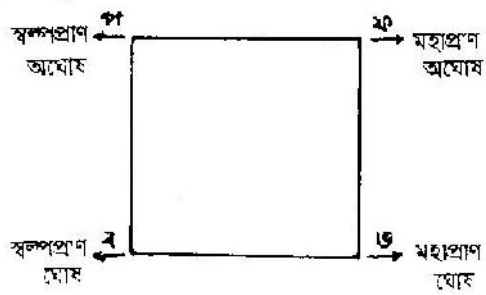

অর্থাৎ,
প = ওষ্ঠ্য + স্পর্শ + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ
ফ = ওষ্ঠ্য + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + অঘোষ
ব = ওষ্ঠ্য + স্পর্শ স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ
ভ = ওষ্ঠ্য + স্পর্শ + মহাপ্রাণ + ঘোষ

অর্থবোধক শব্দ নির্মাণে প্রতিটি ধ্বনির বিশিষ্টতা সহায়ক হয় :

পান = প্ + আন্ (আমাকে এক খিলি পান দাও)

ফান = ফ্ + আন (ফান্ পেতে ঘুঘু শিকার করা যায় রে) ফাঁদ অর্থে (আঞ্চলিক ভাষায়)।

বান্ = ব্ + আন্ (বসন্তের বান ডেকেছে বনে বনে)

ভান্ = ভ + আন্ (ভাল মানুষের ভান করে কতদিন কাটাবে ?)

বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনিগুলোর মোট সংখ্যা ২০টি। এই ধ্বনিগুলোর গুণগত বিশিষ্টতা এভাবে নির্ণয় করা যায় :

ক-বর্গ
ক = জিহ্বামূলীয় + স্বল্পপ্রাণ - অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
খ = জিহ্বামূলীয় + মহাপ্রাণ - অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
গ = জিহ্বামূলীয় - স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি
ঘ = জিহ্বামূলীয় + মহাপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি

চ-বর্গ
চ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ছ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + মহাপ্রাণ + অঘোষ - স্পর্শধ্বনি
জ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় - স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি
ঝ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + মহাপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি

ট-বর্গ
ট = দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ঠ = দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত - মহাপ্রাণ - অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ড = দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত + স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ঢ = দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত + মহাপ্রাণ + ঘোষ + স্পর্শধ্বনি

ত-বর্গ
ত = দন্ত্য + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ - স্পর্শধ্বনি
থ = দন্ত্য + মহাপ্রাণ + অঘোষ - স্পর্শধ্বনি
দ = দন্ত্য + স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি
ধ = দন্ত্য + মহাপ্রাণ + ঘোষ + স্পর্শধ্বনি

প-বর্গ
প = ওষ্ঠ্য + স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ফ = ওষ্ঠ্য + মহাপ্রাণ + অঘোষ + স্পর্শধ্বনি
ব = ওষ্ঠ্য + স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ - স্পর্শধ্বনি
ভ = ওষ্ঠ্য + মহাপ্রাণ - ঘোষ - স্পর্শধ্বনি

বাংলাভাষায় ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্টধ্বনি

স্পর্শধ্বনির সাথে ঘৃষ্ট (affricates) ধ্বনির পার্থক্য খুবই সামান্য। বলা যেতে পারে এগুলো স্পর্শ ধ্বনিরই অন্য এক রূপবিশেষ। কেননা যেখানে স্পর্শধ্বনিতে দেখা যায় উচ্চারকদ্বয় পৃথক হয়ে যাবার সময় বাতাসের গতির তীব্রতার জন্যে ফটকার মতো এক ধরনের আওয়াজ হয় ; ঘৃষ্ট ধ্বনির উচ্চারণে তা হয় না ; বরং উচ্চারক অংশ দুটো স্পর্শ– ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে পৃথক হওয়ার ফলে ওই স্থানে কিছুটা ঘষা লাগে, যে অবস্থাকে ইংরেজিতে বর্ণনা করা হয়, 'Plosive followed by corresponding friction' । ফুসফুস নির্গত বাতাস যখন উচ্চারকদের ধাক্কা দিয়ে বেরুতে গিয়ে ঐ স্থান দুটোকে আলগা করার পরপরই তাদের কাছে চাপা খেয়ে বেরুবার ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় ; তা স্পর্শধ্বনির মতো অতো সুস্পষ্ট হবার কথা নয়। স্পর্শধ্বনির তিনটি পর্যায় এতে রয়েছে বলে স্পর্শধ্বনির সাথে এর এতো মিল ; এর পার্থক্য কেবল স্পর্শধ্বনির তিনটি পর্যায়ের অতিরিক্ত আরেকটি পর্যায়ে — তা হলো, উচ্চারক দুটো আলগা হয়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ঐ স্থানে বাতাসের একটু ঘষা লাগে। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

ঢাকার কুট্টিদের ভাষায় এই ধ্বনির বিপুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

চাচায় হালায় ছাগল কিনবার গেছে।
জ্যাঠা মিয়ার লগে ঝগড়া বাঁধছে।

এখানকার —

চ (ts) ; ছ (tsh) ; জ (dz) এবং ঝ (dzh) ঘৃষ্টধ্বনি

তাহলে বোঝা যায় চ–বর্গীয় ধ্বনিগুলো প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পর্শধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষ বা অঞ্চলগত উচ্চারণে যদি উচ্চারণ স্থানের পরিবর্তন ঘটে, তা হলে ঘৃষ্টতার পর্যায়ভুক্তও হতে পারে। চ–বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে দেখা যায়, এগুলো অনেকের উচ্চারণে উষ্ম বা শিস–ধ্বনির মতো হয়ে উচ্চারিত হয়।

ইংরেজি ভাষায় দুটো ঘৃষ্টধ্বনি রয়েছে ts (চ) এবং dz(জ) যেমন, Church, jail ইত্যাদি। কিন্তু ছ ও ঝ ধ্বনি দুটো কেবল বাংলাতেই পাওয়া যায়।

বাংলার এই ধ্বনিগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ হতে পারে :–

১. চ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolar unvoiced unaspirated affricate sound).

২. ছ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolar unvoiced aspirated affricate sound).

৩. জ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolar voiced unaspirated affricate sound).

৪. ঝ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolor voiced aspirated affricate sound).

অর্থাৎ

চ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + ঘৃষ্ট - অঘোষ + স্বল্পপ্রাণ
ছ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় - ঘৃষ্ট + অঘোষ + মহাপ্রাণ
জ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + ঘৃষ্ট + ঘোষ + স্বল্পপ্রাণ
ঝ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় + ঘৃষ্ট + ঘোষ - মহাপ্রাণ

ঢাকা শহরের কুট্টিদের ভাষায়

চাকর (tsaksr) ; চাচা (tsatsa) ; জাইলা (dzalla) ; ঝাল (dzhall) ; ছাতা (tshatu) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় কম্পনজাত ধ্বনি

বাংলা ভাষার 'র' ধ্বনিটিকে অনেকে তরল ধ্বনি (liquid sound) বলে অভিহিত করেছেন কারণ, জিভের ডগা কিংবা ডগাসংলগ্ন পাতা দাঁতের গোড়ায় লাগতে না লাগতেই উচ্চারকদ্বয়ের মাংসপেশীর সবল সঞ্চালন ব্যতিরেকেই উচ্চারিত হতে পারে এই ধ্বনি। জিভের ডগা উপর-পাটি দাঁতের গোড়ায় স্পর্শিত করার ফলশ্রুতি এই 'র' ধ্বনি। তাই ইংরেজিতে এর নাম 'tap' 'trill' বা 'rolled sound' কিন্তু জিভের ডগা দিয়ে দাঁতের গোড়ায় এভাবে বারবার আঘাত করলে যখন কাঁপুনির সৃষ্টি হয়, তখন তা আর 'tap' থাকে না, তখন হয় কম্পনজাত ধ্বনি বা trill বা rolled sound. বাংলার 'র' ধ্বনিটি এই কম্পনের ফলে সৃষ্ট হয়, যা ইংরেজি r থেকে বাংলা র-কে আলাদা করেছে। বাংলার র-র কম্পন একে ধ্বনি হিসেবে মাধুর্যে ভরে দিয়েছে। 'র' স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি — দন্তমূল থেকে উচ্চারিত হয় এবং কম্পনের ফলে সৃষ্ট। কিন্তু বাংলার ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হলে ত-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণগত প্রভাবের ফলে এ ধ্বনিটিও দন্ত থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন গর্ত, শর্ত, স্বার্থ ইত্যাদি স্থানে র-র উচ্চারণ স্থান দন্ত।

র স্বল্পপ্রাণ হলেও কখনো কখনো মহাপ্রাণ হয়ে উচ্চারিত হতে পারে। যেমন, হ্রদ, হৃদয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে র রহ্ (rh) এর মতো মহাপ্রাণভাবে উচ্চারিত হয়।

এই বিভিন্নতা কেবলমাত্র অন্য ধ্বনির প্রভাবজাত প্রকৃতপক্ষে র-এর ধ্বনিগত রূপ বর্ণনা এভাবে হওয়া উচিত, **স্বল্পপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় কম্পনজাত ধ্বনি** (unaspirated voiced alveolo trill sound)।

অর্থাৎ র – স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ + দন্তমূলীয় + কম্পনজাত

এই ধ্বনিটি বাংলা ভাষায় কবিতা গানে ব্যবহার হয়ে ধ্বনি-মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে গুণে, তা কম্পনজাত ধ্বনি।

বাংলা ভাষায় তাড়নজাত ধ্বনি

তাড়নজাত ধ্বনি বাংলা ভাষায় মোট দুটি – ড় ও ঢ়। এদের উচ্চারণে 'জিভের ডগার উল্টো পিঠ উপর- পাটি-দাঁতের গোড়াকে স্পর্শ করতে না করতেই দ্রুত নেমে এসে নিচের পাটি দাঁতের উপর উছলে পড়ে।' উচ্চারণকালে সমস্ত প্রক্রিয়াটির দ্রুততার জন্যেই অধ্যাপক

মুহম্মদ আবদুল হাই এদেরকে 'তাড়নজাত ধ্বনি' বলে অভিহিত করার পক্ষপাতি। ইতিপূর্বে অনেকে এই ধ্বনি দুটোকে 'অর্ধ বর্ণীয়' ধ্বনি হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। তার কারণ, এই ধ্বনি দুটো বর্ণীয় স্পর্শধ্বনি ড ও ঢ-এর মতো উপর পাটি দাঁতের গোড়া থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে। পার্থক্য হলো, ড আর ঢ-এর উচ্চারণে জিভের ডগা খানিকটা মোচড় খেয়ে ঐ অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত অবস্থান করে উচ্চারিত হওয়ায় তার ব্যঞ্জনায় স্পর্শ ও প্রতিবেষ্টিত গুণের সমন্বয় দেখা যায় ; অন্যদিকে ড় ও ঢ় এর উচ্চারণে জিভের ডগা মোচড় খেলেও তা খুবই ক্ষণিকের জন্যে অবস্থিত হয়ে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। এই পার্থক্যটুকুই ড, ঢ থেকে ড় ও ঢ়-কে স্বাতন্ত্র দান করেছে

এখন ড় ও ঢ় এর মধ্যে উচ্চারণ স্থান ও রীতির দিক দিয়ে শত মিল থাকা সত্ত্বেও ধ্বনি দুটো এক নয়। দুটোই ঘোষধ্বনি। তবু ধ্বনি দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে ; তা হচ্ছে এদের বাতাস নির্গমনের পদ্ধতি বিভিন্ন—ড় স্বল্পপ্রাণ কিন্তু ঢ় মহাপ্রাণ। তাই ধ্বনি দুটোর বর্ণনায় দেখা যায়—

ড় = স্বল্পপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (unaspirated voiced alveolo flapped sound)

ঢ় = মহাপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (aspirated voiced alveolo flapped sound)

স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ গঠনে ধ্বনি দুটোর পার্থক্য সুনিশ্চিত—

গাড়= গা + ড় (গাড়ে অর্থে - খুঁটিটা এখানেই গাড়।)

গাঢ়= গা + ঢ় (ঘন অর্থে- আমি গাঢ় নীল রং ভালবাসি।)

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় ধ্বনি দুটোর ব্যবহার খানিকটা বিকৃত হয়ে ড়>র-তে এবং ঢ়>ড় তে পর্যবসিত

বাংলা ভাষায় পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল'

আমাদের ভাষায় একমাত্র 'ল'-কেই পার্শ্বিক ধ্বনি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এর উচ্চারক হচ্ছে জিভের ডগা এবং দাঁতের গোড়া। জিভের ডগাসংলগ্ন পাতাকে উপর-পাটি বড় দুটি দাঁতের মাঝখানে চেপে ধরবার ফলে উপরের দু'পাশের চোয়াল ও জিভের মাঝে খানিকটা ফাঁক হয়ে যায়। এর ফলে উচ্চারকদ্বয় পৃথক হবার আগেই বাতাস জিভ আর চোয়ালের পাশের একদিকের, কখনো দু'দিকের ফাঁকের দিক দিয়ে নির্গত হয়। এই উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়, লক্ষ্য করা যায় এতে খানিকটা স্পর্শতা গুণও। বক্তার ইচ্ছানুসারে প্রলম্বিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে 'ল'। প্রাচীন ভাষাবিদদের বর্ণনায় 'ল' অন্তঃস্থ ধ্বনি, যা আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকে ল-কে তরল ধ্বনি বলেও অভিহিত করেছেন। কারণ এর উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয়ের স্বল্পতম প্রয়াসেই এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে। অতএব 'ল'-এর বর্ণনা হবে এ রকম-**স্বল্পপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ধ্বনি** (unaspirated voiced alveolo lateral sound)।

অর্থাৎ

ল = স্বল্পপ্রাণ + ঘোষ + দন্তমূলীয় + পার্শ্বিক এবং তরল্য ল-এর একটি বিশেষ গুণ।

'ল' স্বল্পপ্রাণ হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধ্বনি মহাপ্রাণতা পেতে পারে, এতে অবাক হবার কিছুই নেই, বলেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। হ (হল্) উচ্চারণে ল মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন— আহ্লাদ, হ্লাদিনী ইত্যাদি। তবে এই উচ্চারণ অতি সীমিত।

আমাদের ভাষায় অন্য ধ্বনির সাথে উচ্চারিত হলে 'ল' আরো দু'ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে, একটি দন্ত থেকে (দন্ত ল) এবং অপরটি মূর্ধা থেকে (মূর্ধন্য ল)।

ত-বর্গীয় ধ্বনি 'ত' এবং 'দ' এর আগে 'ল' দন্তমূলীয় হয়ে উচ্চারিত হয় — আলতা, গলদা ইত্যাদি। আর ট বর্গীয় ধ্বনির আগে বসলে হয় মূর্ধা থেকে উচ্চারিত উল্টা, পাল্টা ইত্যাদি এই দু'ভাবে উচ্চারণের ফলে ল-এর যে আলাদা রূপ নির্মিত হয়, তাকে ল-এর সহধ্বনি নাম দেয়াই যুক্তিসংগত। কারণ ব্যবহারের দিক থেকে এগুলো খুবই সীমিত।

বাংলা ভাষায় নাসিক্য ধ্বনি

আমাদের ভাষায় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা তিন — ন, ম এবং ঙ। অবশ্য আমাদের বর্ণমালায় এর অতিরিক্ত আরো তিনটি ধ্বনিলিপির চিহ্ন রয়েছে — ণ, ং এবং ঞ। বাক-প্রবাহের ভাষায় আরো দুটো নাসিক্য ধ্বনির মহাপ্রাণ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়, যার লিপি অবশ্য আমাদের ভাষায় নেই, তাহলো ন এবং ম-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি যা প্রকাশ করা হয় হ্ন বা হ্ন এবং হ্ম এইভাবে

আলোচনার সুবিধের জন্য প্রতিটি মূলধ্বনি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করছি

প্রথমেই মূলধ্বনি 'ন'। এর ধ্বনিগত নাম দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (unaspirated voiced alveolo-nasal consonant sound) অর্থাৎ উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে একদিকে যেমনি কম্পনের সৃষ্টি হয়, তেমনি উচ্চারকদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফুসফুসতাড়িত বাতাসের নির্গমন হয় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, অতএব এ ধ্বনিটি স্বল্পপ্রাণ। প্রশ্ন থেকে যায়, ন-ধ্বনিটির উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে। কেননা ইতিপূর্বে যুগ যুগ ধরে 'ন' সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দন্ত ন এবং ণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মূর্ধন্য ণ। অর্থাৎ দুটো ন-ধ্বনি আমাদের ভাষায় রয়েছে, একটির উচ্চারণ স্থান দন্ত্য থেকে এবং অন্যটির উচ্চারণ মূর্ধা থেকে কিন্তু এখানে প্রথমেই ন-এর ধ্বনিগত বর্ণনায় দন্তমূলীয় বলে অভিহিত করার প্রয়াস পেয়েছি। অতএব, বিষয়টি খানিকটা জটিলতা সৃষ্টি করবে বলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

ন-এর উচ্চারণে জিভের ডগা উভয় পাটি দাঁতের গোড়াতে উত্তোলিত হতে দেখা যায়। দন্ত থেকে উচ্চারিত ধ্বনি ত, থ, দ, ধ-এর উচ্চারণকালে উপর-পাটি দাঁতের সামনের বড় দাঁত দুটোর গায়ে জিভের ডগাকে যেমনভাবে চেপে ধরবার প্রয়োজন হয়, ন উচ্চারণে তার পরিবর্তে উপরকার বড় দাঁত দুটোর পেছনের মাড়ির উত্তল (convex) অংশের সাথে চেপে ধরবার প্রয়াস লক্ষ্য করা স্বাভাবিক। তাই দন্ত্য নয়, বরং দন্তমূলই হচ্ছে ন-এর যথার্থ উচ্চারণ স্থান। আধুনিক গবেষণাগারে ন-কে অন্য কোনো ধ্বনির সাথে না মিশিয়ে (বিশেষ করে দন্ত ধ্বনি ত, থ, দ, ধ -এর থেকে পৃথকভাবে উচ্চারিত করে) দেখা গেছে, ন এর

'হ্ন' লিপিটিকে মহাপ্রাণ ধ্বনিলিপি ব্যবহার করলেই অবশ্য এর মীমাংসা হতে পারে এবং সে সব ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের 'হ্ন'-র উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হবে nh–এর মতো। আমাদের লিপিতে ক, খ কিংবা চ, ছ যেভাবে সাজানো হয় সেখানে সাজাতে হবে ন হ্ন এইভাবে। তাহলে চিহ্ন ; আহ্নিক, অপরাহ্ণ ইত্যাদির উচ্চারণ হবে যথাক্রমে cinh ; a nhik ; p ra:nh এইভাবে। আমাদের ভাষায় প্রচলিত হ্ন-এর বিকৃত উচ্চারণ চিন্নহ বা চিহ্ন ; আন্হিক বা আহ্নিক কিংবা অপরান্হ বা অপরাহ্ন ; অথবা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের চিন্ন ; আন্নিক বা অপরান্ন উচ্চারণ তবেই বিদূরিত হবে। তাই হ্ন-এর ধ্বনিগত বর্ণনা করা যেতে পারে **মহাপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি** (aspirated voiced alveolo-nasal consonant sound)।

এবারে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ম: ম-কে বর্ণনা করা হয় **স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য-নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি** (unaspirated voiced bilabial nasal consonant sound)। কেননা ম-এর উচ্চারণে দু'ঠোঁট একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে নিচের চোয়াল খানিকটা নিম্নগামী হওয়ায় মুখের ভেতরে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়, আর সাথে সাথে নাসাপথও সম্পূর্ণ খুলে যাওয়ায় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস নাক দিয়ে বেরোবার সময় মুখের ভেতরে এই ম-ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ধ্বনিটি গঠিত হবার সময় মুখবিবর প্রশস্ত হয়ে সারা মুখ জুড়ে অনুরণিত হয়ে এক অপরূপ ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করে—'মা' ডাক তাই এতো মধুর।

উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগে বলে 'ম' ঘোষ, এবং ফুসফুস আগত বাতাস সহজভাবে বেরোয় বলে স্বল্পপ্রাণ।

এই স্বল্পপ্রাণ ম-এরও একটি মহাপ্রাণ রূপ রয়েছে ম্ম (mh) তবে বর্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতো স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা এর নেই।

সাধারণত দুই স্বরধ্বনির মাঝে (intervocalic) এই মহাপ্রাণ ধ্বনি পাওয়া যায় (তবে এর প্রয়োগ খুবই সীমিত)। যেমন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ইত্যাদি ন-এর মহাপ্রাণ হ্ন-এর মতো ম এর মহাপ্রাণ ম্ম-এর উচ্চারণেও নানা রকম বিকৃতি দেখা যায়। যেমন ব্রহ্ম হয় ব্রম্হ অথবা ব্রম্ম এভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ হচ্ছে ব্রহ্ম (br...mh), ব্রাহ্মা (bramha:) কাজেই ম্ম-এর ধ্বনিগত বর্ণনা দাঁড়াচ্ছে **মহাপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি** (aspirated voiced bilabial nasal consonant sound)

এবারে আসে ঙ : ঙ্ অর্থাৎ অঙ-যেমন, রঙ, ঢঙ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণে ধ্বনিটির প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়ে। উচ্চারণকালে দেখা যায়, জিভের পশ্চাৎ ভাগ নরম তালুর পশ্চাৎ দিকের সাথে উঁচু হয়ে ওঠায় নরম তালু স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা নেমে আসে, আর ঠিক সাথে সাথে নাসাপথ একেবারে খুলে যায়। এই পরিবেশে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাসের পিছন দিকে আবদ্ধ অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে একরকম ধ্বনি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তাই ঙ। এর ধ্বনিগত বর্ণনা হচ্ছে, **স্বল্পপ্রাণ ঘোষ পশ্চাৎ তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি** (unaspirated voiced velar nasal consonant sound)। ঙ-এর ব্যবহার খুবই সীমিত। ন ও ম যেমন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে অবাধে ব্যবহৃত হয়, ঙ তেমনভাবে পারে না। কেবলমাত্র শব্দের মধ্য এবং শেষে এর ব্যবহার হয়। যেমন,

শব্দের মধ্যে — বাঙ্‌লা, বাঙালি, রাঙা, ভাঙা ইত্যাদি।
শব্দের অন্তে — রঙ্‌, ঢঙ্‌, জঙ্‌, মঙ্‌ ইত্যাদি।

আমাদের ভাষায় 'ঙ'-এর একটি প্রতিচিহ্ন রয়েছে ং। কিন্তু ধ্বনিগত দিক থেকে ঙ-এর অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র ধ্বনিব্যঞ্জনা বা অর্থ গঠনের ক্ষমতা নেই বলে সবদিক থেকেই ঙ-র অভিন্ন ং। অতএব, একই ধ্বনির দুটো প্রতিলিপি প্রয়োজন না থাকবারই কথা। তাই রং = রঙ্‌, বাংলা – বাঙ্‌লা, ঢং = ঢঙ্‌ ইত্যাদি উপমার ঙ-ব্যবহারই যথেষ্ট।

বাংলা ভাষায় উষ্মধ্বনি বা শিসধ্বনি

শ এবং হ বাংলা ভাষার যথার্থ শিসধ্বনি

আলোচনার প্রথমে শ।

ছেলেবেলা থেকে আমরা শিখেছি এবং আমরাও যাদেরকে শিখিয়েছি তা হলো 'তালব্য শ'। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ 'তালব্য শ' অনুযায়ী বাংলায় এ জাতীয় ভাবেই এর নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু শ-এর উচ্চারণে লক্ষ্য করা যায় দাঁতের উপর-পাটির গোড়ার শেষ দিকে অর্থাৎ পশ্চাৎ দন্তমূলে জিভের সামনের ভাগ উঁচু করে বায়ুপথ সংকীর্ণ করা হয় খানিকটা। আর ঠিক সাথে সাথেই লম্বালম্বিভাবে জিভের দু'পাশ উপরের দু'চোয়ালের দাঁতের গায়ে ঘেঁসে যায় এবং জিভে সামনের ও পেছনের ঠিক মাঝামাঝি অংশটি সংকুচিত হয়ে একটি খাদের সৃষ্টি হয়। ফুসফুস থেকে এগিয়ে আসা বাতাস সেই ফাঁক থেকে বেরুতে গেলে পশ্চাৎ দন্তমূলে বায়ুপথ সংকীর্ণ হওয়া স্থানে চাপ লাগায় এই শিসজাত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। সাপের নিশ্বাস ছাড়ার মতো এই শিসজাত ধ্বনিটি বাংলায় শ। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পন লাগে না বলে অঘোষ, আর বাতাস নির্গমনে স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় বলে স্বল্পপ্রাণ। তাহলে এই ধ্বনিটির বর্ণনা হবে এভাবে **স্বল্পপ্রাণ অঘোষ পশ্চাৎ দন্তমূলীয় উষ্ম বা শিসজাত ধ্বনি** (unaspirated unvoiced post dental fricative sibilant or spirant sound)।

আমাদের ভাষায় এই ধ্বনিকেই ধরে রাখবার জন্যে আরো দুটি লিপি রয়েছে। সংস্কৃত নামানুসারে যাদের নাম 'দন্ত্য স' এবং 'মূর্ধন্য – ষ'। সংস্কৃতে এদের এ নামকরণ যথার্থ, কেননা উচ্চারণে নামকরণের যথাযথ রূপটি ধরা পড়েছে। বাংলায় তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

আশ্‌ (আশা অর্থে — a:]

আস্‌ (তুচ্ছার্থে আসা অর্থে — a:]

আঁষ (মাছের আঁষ অর্থে — a:]

শিসধ্বনি শ এখানে অপরিবর্তিত বর্ণমালায় যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেনো, এরকম ভাবে দেখা যায়, শব্দের শুরু (শ্বাস, শাপ, শাঁখ), মধ্যে (আসন, আশাহত) এবং শেষে (আস, শ্বাস পাশ) শ-ধ্বনিটি একইভাবে উচ্চারিত। অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে অনায়াসে আসতে পারি, বাংলা ভাষায় এই তিনটি লিপির (স, শ, ষ) একটিই ধ্বনি শ, যা স্বল্পপ্রাণ অঘোষ পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শিসধ্বনি নামে পরিচিত। তাহলে স এবং ষ-এর সত্যিই কি কোনো স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই?

প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি পরিবেশে শ ই দন্ত্য স এবং মূর্ধন্য ষ হয়ে উচ্চারিত হয়, অন্যত্র নয়। যেমন বস্তি, আস্তে ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'শ' দন্ত্য থেকে উচ্চারিত হয়, তেমনি শ ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হলে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ষ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন খিষ্ট, কাষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ-এর উচ্চারণ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ষ।

অতএব, দেখা যাচ্ছে মূলধ্বনি (phoneme) শ তার দুটো সহধ্বনি (allophone) দন্ত স এবং দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ষ। শ-ধ্বনিটির আরো একটি সহধ্বনি আমাদের ভাষায় বিদ্যমান যার কোনো লিপি-রূপ নেই। তা হলো শ-এর অগ্রদন্তমূলীয় উচ্চারণ। র, ল এবং ন-এর আগে শ ও স এর সংযোগজাত একটি ধ্বনি পাওয়া যায়, যা উপরের বড় দুদাঁতের শেষ এবং দাঁতের মাড়ির উত্তল (convex) অংশের মাঝামাঝি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন শ্রী, বিশ্রী, ম্লান, স্নেহ ইত্যাদি শব্দের উষ্ম ধ্বনি শ দন্ত্য নয়, দন্তমূলীয়ও নয় ; বরং অগ্র-দন্তমূলীয় (pre-alveolar)। এই অগ্রদন্তমূলীয় শ ধ্বনিটি মূলধ্বনি শ এর আরেকটি সহধ্বনি।

এবারে শিসধ্বনি হ। কেবল বাংলা ভাষায় নয়, পৃথিবীর যে যে ভাষায় হ ধ্বনিটির সন্ধান পাওয়া যায়, ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এই হ সম্পর্কে দারুণ বিভ্রান্ত এবং এর আলোচনায় প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন। হ-কে নিয়ে যেসব সমস্যা তা হলো :

১. এটা কি স্বরধ্বনি, না ব্যঞ্জনধ্বনি?
২. এটা কি উষ্মধ্বনি?
৩. এটা কি ঘোষধ্বনি?
৪. নাকি এটা মহাপ্রাণ ধ্বনি?

সব সমস্যা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সমাধান নিশ্চয়ই আশা করতে পারে।

হ কে যারা মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলে অভিহিত করতে চান, তাঁদের যুক্তি হলো হ-র উচ্চারণ হয় গলনালীর স্বরযন্ত্র থেকে এবং এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে রীতিমতো কাঁপন লাগে। এই ধ্বনিটি নির্গমনকালে বাতাসের চাপ খানিকটা বেশি হলেও এতো বেশি হয় না, যাতে স্বরধ্বনির গুণ নষ্ট হতে পারে। তাঁদের মতে, যেহেতু সাধারণ স্বরধ্বনির সাথে তুলনায় 'হ' স্বরধ্বনিই, তবে তা মহাপ্রাণ।

কিন্তু স্বরধ্বনির সংজ্ঞা হলো, 'ফুসফুসতাড়িত বাতাস গলনালী, কি মুখবিবর দিয়ে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও রুদ্ধপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, শ্রুতিগ্রাহ্য চাপাও না খেয়ে যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় তাই স্বরধ্বনি'। উচ্চারকদ্বয় খুব কাছাকাছি আসার ফলে যদি বহিরোন্মুখ বাতাসের শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণ অনুভূত হয় তবে তা আর স্বরধ্বনি বলে গণ্য হবে না, তা হয়ে যাবে উষ্ম বা শিসধ্বনি। হ-ধ্বনি নির্মাণে ফুসফুস-নির্গত বাতাসের চাপ প্রবলতর হওয়ায় স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লেগেই তা শেষ হয় না ; বাতাসের চাপ বাড়বার ফলে উভয় স্বরতন্ত্রীর মাঝপথ ধরে বেরোতে গিয়ে তা নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে উৎপন্ন ধ্বনিটি স্বরধ্বনির পর্যায় পেরিয়ে উষ্মধ্বনিতে পর্যবসিত হয়। এ কারণে 'হ' মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি নয়, হ-র গঠন (production) এবং শ্রুতির (acoustics) দিক থেকে মহাপ্রাণ ঘোষ উষ্মধ্বনি, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো ভাষায় হ-কে ঘোষ ও অঘোষ দু-ভাবেই দেখা যায় এবং এর পার্থক্যে অর্থেরও পার্থক্য ঘটায় ; ইংরেজিতে হ-অঘোষ, তবে সীমিতভাবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘোষও হতে পারে ; বাংলায় প্রায় সর্বত্রই 'হ' ঘোষ। কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে যেখানে হ-এর সাথে ঃ (বিসর্গ) যুক্ত ক'রে বিস্ময় বা হতাশা প্রকাশ করা হয় সেখানে 'হ' অঘোষ। যেমন- হ'ঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'হ' অঘোষ। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এই অঘোষ হকে আলাদা কোনো মূলধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত না ক'রে বরং হ-এর স্বরধ্বনি হিসেবে অভিহিত করার পক্ষপাতি। আর হ-এর এই সীমিত ব্যবহারের অঘোষ রূপের জন্যে অঘোষ হ-কে আলাদা মূলধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত না ক'রে ঘোষ হ-এর সহধ্বনি (allophone) বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে আমিও মনে করি।[১]

হ-এর মহাপ্রাণতাকে দেশী-বিদেশী ধ্বনিবিদরা চিহ্নিত করেন আমাদের খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ইত্যাদি বর্গীয় ধ্বনিগুলোর শেষাংশ বা Second Component হিসেবে। যেমন, ক + হ=খ ; চ + হ=ছ ; ট + হ=ঠ ইত্যাদি ভাবে (স্বল্পপ্রাণ + হ = মহাপ্রাণ); অর্থাৎ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির সাথে নিছক হ যোগ করলেই তারা মহাপ্রাণ হবে, এটা আমাদের অনেক ব্যাকরণবিদের ধারণা। উর্দুতে (گھ=g) এবং রোমানেও (খ=kh, ছ = ch) এই স্বল্পপ্রাণের সাথে হ যোগ করার রীতি লিপিতে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে লেখন-পদ্ধতির এই রীতি আমাদের ব্যাকরণবিদ তথা অনেক আধুনিক ধ্বনিবিদদের মনেও এ রকম ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। লেখন-পদ্ধতি অনুসারে নয়, বরং বাক প্রবাহে ধ্বনির ব্যবহার যেভাবে হয়, ধ্বনির বিশ্লেষণের মাপকাঠি তাই। এ সম্পর্কে "An Experimental Study of Bengali Occlusives" গ্রন্থে এ. সি. সেন ধ্বনিবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে (Phonetic Laboratory) প্রমাণ করেছেন, "এদের উচ্চারণ কোনো সময়ই সংযুক্ত নয়, তারা নিশ্বাসের এক প্রচাপনে এবং একই বক্ষ স্পন্দনের (Single Chest impulse) ফলে একইভাবে উত্থিত অবিভক্ত অবিভাজ্য ধ্বনি।"[২] অতএব, হ-র সংযোগ কোনোমতেই স্বল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণ রূপায়ণ যথার্থ নয়, বরং তা অনর্থক, ভুল, অযৌক্তিক। একারণে হ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মৌলিক ধ্বনি।

হ সম্পর্কে স্পর্শহীন গলনালীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced aspirated without stop) বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের কথায় অনেকখানি সত্যতা নিহিত আছে। তাঁরা হ-কে সম্পূর্ণ উষ্মধ্বনি বলতে নারাজ। তাঁরা এর ঘর্ষণজাত প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন নি সত্য, তাঁদের মন্তব্য হ-এর স্পর্শধ্বনিগুলোর বিপরীত স্পর্শহীন এবং তা মহাপ্রাণ ধ্বনি। ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের চাপে এই ধ্বনিটিতে ভাল রকম অনুরণন দেখা যায়। এই সবকিছু বিচার ক'রে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই একটি মাঝপথ বা দু'পক্ষ একসঙ্গে গ্রহণ করেছেন হ-কে বিশ্লেষণ করে, তা হলো, **ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বা শিস ধ্বনি** (voiced aspirated glottal fricative) এবং **স্পর্শহীন আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি** (voiced glottal sound without stop)। আমার মনে হয়, হ এর উষ্মরূপ অন্তত

১. Vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound, in forming which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction. — An Outline of English Phonetics by Daniel Jones.

২. অনুবাদ : মুহম্মদ আবদুল হাই।

আমাদের বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের কথায় বেশি প্রাধান্য পায় বলে হ কে **ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বা শিসধ্বনি** নামে অভিহিত করা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। ভাষায় ধ্বনির ব্যবহারই আজকের ধ্বনিবিজ্ঞানীদের গবেষণার মূল বিষয়, তাই হ-কে **শিসধ্বনির** পর্যায়ভুক্ত করা হলো।

আঞ্চলিক ভাষায় ফ ও ভ কি শিসধ্বনি?

চলিত বাংলায় বাক্যের ধ্বনিস্রোতে কখনো অন্তক উচ্চারণে ফ ও ভ দন্তৌষ্ঠ্য শিসধ্বনি হয়ে উচ্চারিত হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের (চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালি ইত্যাদি) আঞ্চলিক ভাষায় ফ ও ভ (ফুল, ফল, ভালো, ভালোবাসা) শিসধ্বনি হয়ে উচ্চারিত হয়। ফ (f)-এর উচ্চারণ সেখানে **মহাপ্রাণ অঘোষ দন্তৌষ্ঠ উষ্মধ্বনি** (aspirated unvoiced labic-dental fricative sound) এবং ভ-(v) তার বিপরীত অর্থাৎ **মহাপ্রাণ ঘোষ দন্তৌষ্ঠ উষ্মধ্বনি** (aspirated voiced labic-dental fricative sound)

বাংলা ভাষায় অন্তস্থ-ব কি শিসধ্বনি?

স্পর্শধ্বনিতে ব-এর বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বর্ণমালায় আরেকটি ব-এর সন্ধান পাওয়া যায়, কোনো নাম না থাকলেও ধ্বনি হিসেবে এর একটি অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় বলে তার নাম অন্তস্থ-ব (একে উপস্বরধ্বনি - semi vowel sound বলা হয়)। এই অন্তস্থ ব্ এর উচ্চারণে যদি কখনো বাতাস দুঠোঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে ঘষা লাগে বা দুঠোঁটের মাঝে বাতাসের ভাবটুকু স্পষ্ট অনুভূত হয় তাহলে একে শিসধ্বনির পর্যায়ভুক্ত করা চলে। তা না হলে ব্ হবে উপস্বরধ্বনি। উচ্চারণে ঠোঁট দুটো যতো বেশি গোলাকার আর নিকটতর হবে ব্ ততোখানি শিসজাত হয়ে উঠবে। আমাদের ভাষায় তখন শিসধ্বনি হিসেবে অন্তস্থ ব্ ততো প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলা ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

যদি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে এবং উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশী সঞ্চালনের ফলে উচ্চারিত হয়, তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেতে পারে। যেমন, প্ল-উচ্চারণে এর উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। প্ল-ধ্বনি সংগঠনে দেখা যায়, প এর জন্যে দুঠোঁট এবং ল-এর জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হচ্ছে। এ কারণে প্ল সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি প্লাবন, আপ্লুত ইত্যাদি শব্দে প্ল-এর সংযুক্ত রূপ দেখা যায়।

যুক্তবর্ণের সমাবেশ হলেই তা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নাও হতে পারে, যদি নিশ্বাসের একই প্রয়াসজাত উচ্চারণ না হয়। এজন্য যুক্ত বর্ণের সাহায্যে লিখিত হলেও যদি ঐসব ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে এবং উচ্চারকদের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তবে তা সংযুক্ত ধ্বনি পর্যায়ভুক্ত হবে না। যেমন, ক্ত (ক্‌ত) এখানে সংযুক্তভাবে 'ক্ত' বা স্বতন্ত্রভাবে 'ক্‌ত' এভাবে যে কোনো পদ্ধতিতেই লেখা হোক না কেন, এর উচ্চারণে উচ্চারকদের একবারের প্রয়াস নয়, বরং দুবারের স্বতন্ত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বলে তা সংযুক্ত ধ্বনির পর্যায়ে পড়বে না।

তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, 'বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তা হলেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি (consonant cluster) নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।'

আমাদের ভাষায় এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে মোট ছত্রিশটি। কিন্তু বর্ণের (letter) দিক থেকে যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষরের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত।

এই ছত্রিশটি সংযুক্ত ধ্বনি শব্দের শুরুতে সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। শব্দের শেষে কেবলমাত্র কয়েকটি বিদেশী শব্দে (ব্যাংক, কার্ড, দোস্ত) এই সংযুক্ততা লক্ষণীয়। শব্দের মাঝে এই সংযুক্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংযুক্ততা হারাবার ফলে নিছক সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলা যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ছত্রিশটি থেকে শব্দের মাঝখানে ব্যবহারের ফলে যারা সংযুক্ততা হারিয়ে ফেলে তাদেরকে (স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্থ, স্ন, স্প ও স্ফ এই আটটিকে) বাদ দিয়ে মোট আটাশটিকে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে গণ্য করা হবে।

সংযুক্ত ধ্বনির ন্যূনতম একক

আমাদের বর্ণমালায় ভাষাকে ধরে রাখবার প্রয়াসে অনেক সময় দেখা যায় দুইয়ের অধিক তিন বা চারটি বর্ণসহযোগে যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে, প্রথম লিপিটির ধ্বনি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তা হলেও তা স্বতন্ত্রভাবে আগেই উচ্চারিত হয়ে যায় এবং তার পরের ধ্বনি দুটো মিলিতভাবে সংযুক্ততা রক্ষা করে। নিষ্ক্রমণ (nishkr m n) বক্তৃতা (boktrita) ইত্যাদি শব্দের ষ-ক-র ( ) এবং ক্-ত-র (ক্ত্র) ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে তা ধরা পড়ে। এইভাবে দেখা যায় যে, তিন বর্ণ সম্বলিত সান্ত্বনা ( ), অমর্ত্য (র্ত্য) কিংবা চার বর্ণসম্বলিত উর্ধ্ব (র্ধ্ব) প্রভৃতি যুক্তাক্ষরগুলোর বেলায়ও ধ্বনিগুলোর সংযুক্ততা মোটেই রক্ষিত নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংযুক্তাক্ষরে, যতোগুলো বর্ণের সম্মিলনই ঘটুক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তাতে দুটো ধ্বনিই রক্ষিত হয় এবং তারা একটার পর একটা উচ্চারিত হয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে।

সংযুক্তধ্বনি গঠনের মূল উপাদান

সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের মূল উপাদান তিনটি মূলধ্বনি ল, র এবং শ (এর সহধ্বনি স এবং ষ)। স্বতন্ত্র পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছুটা হেরফের হতে পারে, তবু মূলধ্বনি হিসেবে খুঁজতে গেলে এই তিনটিকেই পাওয়া যাবে। দন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি শ, তরল বা পার্শ্বিকধ্বনি ল এবং কম্পনজাত র, বাংলা ভাষার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সংগঠনের মূল উপাদান। ল এবং র সংযুক্ত ধ্বনির উপাদান হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন দেখা যায় স্পর্শ, ঘৃষ্ট বা নাসিক্যধ্বনির পরে এদের ব্যবহার হয়। যেমন, ক্ল (ক্লাস, ক্লাব); শ্ল (শ্লথ, শ্লীল); ম্ল (ম্লান); ক্র (ক্রমশ); শ্র (শ্রবণ); ন্র (নৃত্য) ইত্যাদি। তবে ঘৃষ্ট ধ্বনি শ যদি এর উপাদান হয় তাহলে দেখা যাবে, তা স্পর্শ, তরল কিংবা নাসিক্যধ্বনির আগে বসবে। যেমন স্ক (স্কন্ধ); স্খ (স্খলন); স্প (স্পন্দন); শ্র (শ্রবণ); শ্ল (শ্লথ); স্ন (স্নিগ্ধ) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উপাদানগুলোর উচ্চারণস্থান বিভিন্ন একথা সত্যি, কিন্তু নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত উচ্চারণের ফলে উচ্চারকগুলোর পেশী সঞ্চালন বলিষ্ঠতর হয় এবং তারা একাত্মতাও লাভ ক'রে। যেমন প্র (প্রেম); ম্ল (ম্লান); ক্ল (ক্লাস); ত্র (ত্রাণ) প্রভৃতির উচ্চারণ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত এইসব সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর উচ্চারণকালে একদিকে উচ্চারকদের পেশী সঞ্চালন যেমনি বলিষ্ঠতা লাভ ক'রে, তেমনি ধ্বনিগুলো একাত্মতাও পাচ্ছে। এসব উচ্চারণে আরো দেখা যাবে, ত্ন (যত্ন) কিংবা স্থ (আস্থা) ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানজাত ধ্বনিগুলোর মতো পারম্পর্যগত নয়, কিংবা ক্ক (হক্কা); চ্চ (উচ্চ) ইত্যাদি দ্বিত্বধ্বনির মতোও কখনো নয়। বাংলার শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ হয় বেশ জোরালো। শুধু তাই নয়, উচ্চারকদের পেশী সঞ্চালনের বলিষ্ঠতার ফলেই তা সম্ভব হয়। দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যতোই গুরুগম্ভীর বা দৃঢ়তার আধার হোক না কেনো, বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর (ম্ল, প্র, ক্ল, ত্র) মতো একাত্মতা কখনো লাভ ক'রে না, কেননা এদের প্রথম অংশের সংস্কৃত হলন্ত ধ্বনির মতোই অসম্পূর্ণ উচ্চারণ করার ফলে পারম্পর্যগত উচ্চারণই রূপায়িত হয়ে ওঠে। সমস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মাঝখানে দ্বিত্ব পেলে তাদের অসংযুক্তধ্বনিগুলোর চেয়ে আলাদা শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা পায়–বাচ্চা বাচ্চা ; সমান>সম্মান ; মাল> মাল্লা ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

যখন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন দেখা যাবে দুটো ধ্বনির সমান প্রচেষ্টায় যেহেতু তাদের উচ্চারণ হচ্ছে, ফলে তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্যে মুখবিবরের ভেতর অপেক্ষা করতে হয় ; তারপর সে অবস্থায় শক্তিস্পৃষ্ট হওয়ায় প্রথমাংশ গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনা লাভ করে। এরপর তাদের উচ্চারকেরা দ্বিতীয়াংশের দিকে ধাবিত হতে থাকে, আর তখনি ফটকার মতো আওয়াজ ক'রে উচ্চারকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে দ্বিত্বপ্রাপ্ত সংযুক্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে যেমন দৃঢ়তা, তেমনি গাম্ভীর্য সংমিশ্রিত হয়ে ওঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে দু'অক্ষরে (Syllable) বিভক্ত হলেও উচ্চারকদের পেশী সঞ্চালনের বলিষ্ঠতা লাভ ক'রে, অন্যদিকে বর্গীয় স্পর্শধ্বনির বেলায়ও লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের বর্গীয় নাসিক্যধ্বনির পরে বসলেও দু'অক্ষরে তো বিভক্ত হয়ই, বরং উচ্চারণে একাত্মতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যেমন, অঙ্ক (ঙ+ক); পঞ্চ (ঞ+চ); দন্ত (ন+ত) ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয়, নাসিক্য এবং এর পরের ব্যঞ্জনধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণে নাসিক্যধ্বনিটি বেশ বলিষ্ঠতর হয়, প্রলম্বিতও হয় সাথে সাথে।

মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর দ্বিমাত্রিক হয় কেনো?

উপরে আলোচিত দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এদের গঠন এবং ধ্বনিপ্রকৃতি যেমনি হোক না কেনো, এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করে বলে সময়ের দিক থেকে দীর্ঘায়িত হয় স্বাভাবিকভাবেই। এ কারণেই আমাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংযুক্ত ধ্বনির পূর্বস্বর দ্বিমাত্রিকতাপ্রাপ্ত হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বেলায়ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংযুক্ত ধ্বনির

পূর্বস্বরের দ্বিমাত্রিকতা দেখা যায়। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এরকম ক্ষেত্রে সময়ের এই দীর্ঘতা স্বরধ্বনিতে যতোখানি হয়, তার চেয়ে তুলনামূলকভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটিতেই বেশি ক'রে ধরা পড়ে। এসব স্থানে উচ্চারকেরা কতো যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের ধ্বনি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে জলদ-গম্ভীর নির্ঘোষে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে তোলে!

ভাষায় অক্ষর ও বাংলা শব্দের প্রতিকৃতি

অক্ষর

নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বা Syllable বলা হয়। আমাদের বাক-প্রবাহে লক্ষ্য করা যায়, আমরা যখন অন্যজনের সাথে কথা বলি তখন নিঃসন্দেহে আমাদের মনোভাবের উপযোগী ধ্বনিসমন্বিত ভাষার ব্যবহার ক'রে আবেগ, উচ্ছ্বাস, ব্যাকুলতা, বেদনা প্রকাশ করি। একে অন্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করি। এই ধ্বনিগুলো কতো যে শৃংখলিত বা তার ব্যবহারে আমরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেকেই কতো যে সিদ্ধহস্ত তা স্বাভাবিকভাবে আমাদের বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই ধ্বনি ব্যবহার ক'রে আমরা বেঁচে রয়েছি, সুখে-দুখে, ভালো-মন্দে মিশে জীবন অতিবাহিত ক'রে চলেছি। কিন্তু এই ধ্বনিগুলোর ব্যবহার আমরা করছি কিভাবে সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

'লক্ষ্মীটি, চলো না আজ ব্রহ্মপুত্রের ভরা যৌবন থেকে বেড়িয়ে আসি।
—চলো।
—তাহলে আমার সেই প্রিয় শাড়িটা পরে নাও ডালিয়া।
—ঠিক আছে পাঁচ মিনিট সময়তো দেবে।
—নিশ্চয়ই!'

এখানে লিখবার সময় প্রতিটি ধ্বনিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। তবু কি তা সবটুকু সম্ভব হয়েছে? কেননা প্রতিটি ধ্বনি এখানে অন্য ধ্বনিগুলোর সংস্পর্শে এসে খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ফলে ভাষার লেখ্যরূপেও ধ্বনির হুবহু চেহারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি, কিংবা বলা যায় তারো চেয়ে বেশি ক'রে ভাষার মৌখিক বা ব্যবহারিকরূপে ধ্বনির বিবর্তন লক্ষণীয়। কেননা, এখানে বক্তার ও শ্রোতার আবেগ, মানসিক অবস্থা, বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর নির্ভর ক'রে এই ধ্বনিগুলোর পরিবর্তন হয় বেশি ক'রে। উপরের উদ্ধৃতিতে দেখা যাবে, আবেগের এবং কথোপকথনের মুডের উপর নির্ভর ক'রে বাক্য কখনো দীর্ঘ, কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো সরল, কখনো জটিলতা পাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে ধ্বনির রূপেরও। এ দিক থেকে বলা যেতে পারে ভাষার বৃহত্তর ইউনিট হচ্ছে বাক্য এবং ক্ষুদ্রতম ইউনিট ধ্বনি। কিন্তু ধ্বনির রূপ ভাষায় পরিবর্তিত হয়, একটু আগের আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হওয়ায় ধ্বনি ভাষায় কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। ধ্বনি যখন ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তখন দেখা যায়, আমরা যখন কথা বলি এখন সার্থ এবং শ্বাস পর্বের বিরাম ছাড়া দুইশব্দের মাঝখানে কোথাও ফাঁক দেখা যায় না। তাই আমাদের ধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে একটি ধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিই নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় বলে একটি স্বরধ্বনি বা স্বরধ্বনিযুক্ত

ব্যঞ্জনধ্বনিই ভাষার ক্ষুদ্রতম ইউনিট হিসেবে পরিগণিত হয়। ভাষার ক্ষুদ্রতম এই ইউনিট নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে ভাষার মাঝখান থেকে যেটুকু উচ্চারিত করা হয় তার নাম অক্ষর বা Syllable. ফুসফুসতাড়িত বাতাস নির্গমনকালে গলনালী, মুখবিবর ইত্যাদি স্থানে স্পর্শ করে বিভিন্ন ধ্বনির সৃষ্টি হওয়ার সময় ছোট ছোট তরংগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ছোট ছোট তরংগ যা একটি বা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয়ে ধ্বনিপ্রবাহে বিরাট ভূমিকা পালন করে, তারই নাম অক্ষর। যেমন অ', ক, থাক, আঁক ইত্যাদি।

ধ্বনি এবং অক্ষরের মধ্যে আসল পার্থক্য হলো ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য (indivsible) ছোট ইউনিট আর অক্ষর হচ্ছে এক অথবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত বিভাজ্য (divisible) ইউনিট।

অক্ষর দু'রকম — মুক্তাক্ষর (open syllable) এবং বদ্ধাক্ষর (closed syllable)। একটিমাত্র স্বরধ্বনি বা স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি যখন নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা রেখেও আরো একটিধ্বনি ধারণ করতে পারে, তখন তাকে বলা হবে মুক্তাক্ষর (open syllable)। যেমন ব,লা (বলা), ক,রা (করা) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব এবং লা কিংবা ক এবং রা এদের প্রত্যেকের সাথে আরেকটি করে ধ্বনি সংযোগ করলেও (যথাক্রমে বল্, লাল, কর্, রাত্) তারা নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না। এজন্যে এরা মুক্তাক্ষর। আবার একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত অক্ষর নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হবার সময় অন্য ধ্বনি ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাই হবে বদ্ধাক্ষর বা closed syllable. যেমন, যাক, থাক, চল্, গান ইত্যাদি শব্দে অন্য ধ্বনির সংযোগ হলে নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারণ বিঘ্নিত হবে বলে এরা বদ্ধাক্ষর। বদ্ধাক্ষর একাধিকধ্বনির সমন্বয়ের ফলশ্রুতি মাত্র।

অক্ষরের মূলাধার

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় syllable, সংস্কৃততে তাকেই বলে অক্ষর অর্থাৎ গুণগত, ধর্মগত বা অবয়বগত যার কোনো ক্ষয় নেই। বলা যেতে পারে, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল, তাই হলো অক্ষর। আর এই অক্ষরের প্রাণ হচ্ছে স্বরধ্বনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেবল স্বরধ্বনিই অক্ষর নির্মাতা হচ্ছে (অ, ও, ই, এ ইত্যাদি) সেখানে স্বরধ্বনিই পরম এবং চরম সত্য। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে এসে স্বরধ্বনি যখন অক্ষর গঠন করে লাজে (লা+জে) কিংবা হেসে (হে+সে) তখনো স্বরধ্বনিই অক্ষরের প্রাণ। এ রকম অক্ষর গঠনে ব্যঞ্জনধ্বনিকে একটি মালার ফুল আর স্বরধ্বনিকে সেই মালার সুতোর সাথে তুলনা করাটা সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক।[১]

প্রাচীনকালে ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা দেয়া হতো এভাবে ; স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়াই যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাই ব্যঞ্জনধ্বনি। আজকের যুগে এ সংজ্ঞা সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। তবে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হলেও স্বরশোধন ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত, এমন কি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হতে পারে। তার সমর্থন মেলে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, তরল ধ্বনি র, ল, কিংবা উষ্মধ্বনির বেলায়। এগুলো স্বরধ্বনি ছাড়াই গঠিত এবং এদের উচ্চারণও সম্ভব। কারণ

১. The Phonetic Observation of Indian Grammarians by Varma.

এগুলোর ধ্বনিব্যঞ্জনা ও অনুরণন অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এতোই বেশি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অক্ষরের গুণ নিয়ামক (nucleus) হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর কোনো কোনো ভাষায় ম, ন, ল, স্ ইত্যাদি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোই তাই স্বরধ্বনি হিসেবে ভাষায় কাজ করে থাকে। ইংরেজিতে mutton (mutn), button (butn) ইত্যাদি উদাহরণ লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হবে। তবু যে কোনো ভাষার শ্রুতিব্যঞ্জনা, অনুরণন এবং বহমান ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে স্বরধ্বনিই সর্বাগ্রে স্থান পাবে, এ কথা সবাই স্বীকার করবেন (The vowel belong entirely the syllable of which it is the centre—Says Meillet)। তাই অক্ষরের মূলাধার স্বরধ্বনিই।

বাংলা অক্ষরের গঠন-প্রকৃতি

এই অক্ষর কখনো একটিমাত্র হলেও শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে দাঁড়িয়ে বাক্যকে পূর্ণতা দান করতে পারে। যেমন, 'এই, তুই কোথায় যাস্'—এখানে একাক্ষর বিশিষ্ট তিনটি শব্দ বাক্য গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই, তুই এবং যাস্ ; এবং তিনটিই বদ্ধাক্ষর। বহু অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের বাক্যে যে ভূমিকা, একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের ভূমিকা তা থেকে ভিন্ন নয়।

বাংলা শব্দ একাক্ষর বিশিষ্ট হোক বা বহু অক্ষর বিশিষ্ট হোক শব্দের অভ্যন্তরীণ এই অক্ষরগুলোর গঠন-প্রকৃতি সাধারণভাবে যে কয়েকমভাবে হতে পারে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এখানে তাঁর অনুসরণে তালিকাটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

১. v—অর্থাৎ এ, ও, উ এবং ই তি, উ নি প্রভৃতি শব্দে ই, উ ইত্যাদি। v বাংলায় স্বতন্ত্র অক্ষর ও শব্দ দুই-ই গঠন করতে পারে। v কাঠামো বিশিষ্ট অক্ষরে ব্যাপকভাবে শব্দ গঠন না করলেও ই, এ, ও প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত।

২. vc— যেমন আজ্, আম্, অ্যাক্, আর্, উট্ আঁজ্। লা, ওড়্। না ইত্যাদি। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাবে vc কাঠামোর অক্ষর শুধু শব্দাংশই গঠন করে না, যথেষ্ট পূর্ণ শব্দও গঠন করে থাকে।

৩. cv যেমন পা, মা, না, চা, বা বা,। বা, রা,-জি, রী। তি ইত্যাদি। cv কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

৪. cvc যেমন কাজ, কান, বর, মাছ, ভক্। তো (ভণ্ড), পন্। থা(পন্থা), পুন্/নো (পুণ্য), কীর। তি (কীর্তি), প। বন্ ইত্যাদি।

cvc কাঠামোর অক্ষরই বাংলায় ব্যাপকভাবে পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. ccv যেমন গ্রা/নি, প্রী/তি, কৃ/ ষি, ঘৃ/ণা ইত্যাদি। ccv কাঠামোর অক্ষরটি বাংলায় পূর্ণ শব্দ গঠন করে না।

৬. cccv— যেমন স্ত্রী। পূর্ণ শব্দ গঠন করার ক্ষমতা এতে থাকে

৭. ccvc—যেমন ত্রাণ, ম্লান, ঘ্রাণ, প্রাণ, কৃন/তি, শ্রান/তি ইত্যাদি। এতেও পূর্ণ শব্দ গঠন সম্ভব।

৮. vj— যেমন এই, ওই, অই, উই ইত্যাদি। এতেও পূর্ণ শব্দ গঠন করার ক্ষমতা রয়েছে।

৯. cvj— যেমন দিই, নিই, পিউ/লি, শিউ/লি ইত্যাদি। শব্দের পূর্ণতা এখানে বিশিষ্টতার দাবিদার।

১০. vy— যেমন অয়, । পূর্ণ শব্দ গঠন করার ক্ষমতা এতে থাকে।

১১. cvy— গায়, খায়, যায়, ন্যায় অ/ন্যায় ইত্যাদি। cvy কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠনে সক্ষম।

১২. ccvy—যেমন, প্রায়, প্রায়/শঃ ইত্যাদি। পূর্ণ শব্দ গঠিত হতে পারে এই অক্ষরে।

১৩. vw—যেমন, ঔ /ষধ, ঔ/ রস ইত্যাদি। পূর্ণ শব্দ গঠনে অক্ষম

১৪. vwc— যেমন, ঔৎ/সুক্য। পূর্ণ শব্দ গঠনে অক্ষম।

১৫. cvw—যেমন, দাও, খাও, গাও, যাও, দাউ/দাউ ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে শব্দ গঠনে সক্ষম।

১৬. cvyv—নুয়ে

cvwv— থোয়া, রুয়া ইত্যাদি,

১৭. wv—যেমন ওয়া/সিল, ওয়া/রেন্ট, ওয়া/লা, ওয়া/দা, খা/ওয়া, পা/ওয়া, থ্রি/য়ো, প্র/য়ো/জন ইত্যাদি।

১৮. yv—যেমন মে/য়ে, গে/য়ে, গি/য়ে, যে/য়ে ইত্যাদি স্বতন্ত্র শব্দ এতে গঠিত হয় না এবং এর ব্যবহার কখনো শব্দের শুরুতে দেখা যায় না।

১৯. wvw— যেমন, খা/ওয়াও, নে/ওয়াও, যা/ওয়াও ইত্যাদি এ কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতে এর ব্যবহার নেই।

২০. wvy—যেমন দে/ওয়ায়, যা/ওয়ায়, নে/ওয়ায় ইত্যাদি এ কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠনে অক্ষম এবং এর ব্যবহারও শব্দের শুরুতে হয় না

২১. yvc—যেমন নি/য়োগ, বি/য়োগ, প্র/য়োগ ইত্যাদি। স্বতন্ত্র শব্দ গঠন ক্ষমতা এর নেই এবং শব্দের শুরুতেও এর ব্যবহার দেখা যায় না।

পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির সমন্বয়ে দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong) সৃষ্টি হলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনির ব্যবহার হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুরূপ হয়। এজন্য vj (এই, ওই) ; vy (অয়, আয়) এবং VW (আও, আউ) অক্ষর ভাগের প্রকৃতিগত দিক থেকে vC (আজ, আম, আক্) কাঠামোর সগোত্র ; তেমনি CVj (দিই, নিই), cvy (যায়, গায়) CVW (দাও, দাউ) এবং ccvy (প্রায়) যথাক্রমে cvc এবং ccvc কাঠামোর গোত্রভুক্ত। কেবলমাত্র wV এবং yV–র অক্ষর ভাগ বাংলায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কারণ অন্য কিছু নয়, তা হলো ব (w), ও (উ) এবং য় (y) জাতীয় উপস্বরধ্বনির উচ্চারণ ; তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে এমনকি দ্রুত উচ্চারণেও দ্বিস্বর সৃষ্টি না করলে শব্দ শেষে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করে থাকে।

আলোচিত কাঠামোগুলোর v, vc, cv, cvc, cj, cvy এবং cvw কাঠামোর অক্ষরগুলোই আমাদের ভাষায় বহুল ব্যবহৃত।

অক্ষর ও মাত্রা

ইংরেজিতে যাকে 'mora' বলা হয়, বাংলায় তারই নাম মাত্রা, যার অর্থ 'কাল পরিমাণ'। অক্ষরের মতো মাত্রার বেলাতেও দেখা যাবে, স্বরধ্বনিই তার নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এই স্বরধ্বনি অক্ষর কিংবা মাত্রায় একটা স্থিতিকাল বা duration রক্ষা করে চলে, তারই নাম 'কাল পরিমাণ'। এদিক থেকে বিচার করলে মাত্রার সাথে অক্ষরের অভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু আবেগের উপর পড়ার ঢং নির্ভর করে বলে একই অক্ষর কখনো দীর্ঘায়িত হয়ে, কখনো দ্রুতভাবে পঠন বা উচ্চারণ করা হয়ে থাকে ভাষায়। তাতে অক্ষরের কোনো হেরফের হয় না সত্যি, স্বরধ্বনিটিকে উচ্চারণকালে মুখের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে রাখবার ফলে দীর্ঘায়িত বা হ্রস্বভাবে উচ্চারণের রীতি ভাষায় লক্ষণীয়। এই হ্রস্ব বা দৈর্ঘ্যটিই ছন্দের তথা ধ্বনির মাপের ইউনিট অর্থাৎ তার মাত্রা। অক্ষর উচ্চারণে অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু মাত্রা উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা বিচারে মাত্রার পরিবর্তন হয়। যেমন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুমাত্রা গণনা কিংবা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দশেষের বদ্ধাক্ষর গণনায় দুমাত্রা ধরবার কারণ এই দীর্ঘায়িত হয়ে উচ্চারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অক্ষরের হিসেবে এক থাকলেও পড়বার সময় কাল পরিমাণের দীর্ঘতার দরুন তা দুমাত্রায় পরিণত হয়ে যায়। যেমন, 'আমাদের গ্রামখানি ছবির মতোন' — এখানকার সবকটি বদ্ধাক্ষরই মাত্রাবৃত্তে এদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণগত দীর্ঘতার ফলে দ্বিমাত্রিকভাবে উচ্চারিত হবে, অন্যদিকে অক্ষরবৃত্তে কেবল শব্দশেষের বদ্ধাক্ষরগুলোর বেলায় স্বরধ্বনির দীর্ঘায়িত উচ্চারণবশত দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে, শব্দের শুরুতে বা মাঝে নয়।

শব্দ ভাগ

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন কথা বলার ভঙ্গি এবং ভাবের সাথে সাথে একাত্ম হয়ে তার উচ্চারণ হয় বলে প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক রূপের সম্মিলিত বা সমন্বিত বা কয়েকটি শব্দের সন্ধিজাত উচ্চারণ শ্রুত হয়, কিন্তু লিখবার সময় শব্দগুলোর চেহারা অনেকটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লিখিত ভাষার এই অন্তঃশাব্দিক ফাঁকটুকুই (inter word space) প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে চিনে নেবার সুযোগ করে দেয়। বাক-প্রবাহের শব্দগুলোর পৃথকীকরণের কোনো পন্থা কি নেই? পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজিকে পৃথক করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে পদ্ধতির সাহায্যে তা হয়ে থাকে, তা হলো, (ক) ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে, এবং (খ) বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর সম্পর্কগত বা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে।

শব্দভাগের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় phonotic basis of word delimination', বাংলায় তাকে বলা হয় 'শব্দভাগের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া'। এই প্রক্রিয়া অনুসারে বাক্যের অভ্যন্তরের প্রতিটি শব্দকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এখানে শব্দের ধ্বনিগুলোকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ :

১. কোনো শব্দ যদি স্বরধ্বনিতে শেষ হয়, সেই শব্দটিতে যে কটা অক্ষর থাক না কেনো, শেষের অক্ষরটি সময়ের দিক থেকে দীর্ঘতা লাভ করে বেশি। যেমন,

ওহে-র, ও র তুলনায় হে-র এ দীর্ঘতর ; আরেকটি শব্দ ঘুমালো-র ও (লা+ও) এই শব্দের দীর্ঘতম স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনির শব্দশেষের এই দীর্ঘতাই বলে দেবে সে একটি স্বতন্ত্র শব্দ।

২. দেশী, তদ্ভব বা সংস্কৃত যেখান থেকেই শব্দটির সৃষ্টি হোক না কেনো, শব্দের প্রকৃতি অনুসারে দেখা যায়, বাংলায় শব্দকোষের ব্যঞ্জনধ্বনি সাধারণত হলন্ত উচ্চারণ হয় যেমন, তাঁত্, ভাত্, রাত্, অবাক্, আকাশ্, মাস্ ইত্যাদি। অবশ্য ব্যঞ্জনধ্বনির এই হলন্ত উচ্চারণ নির্দেশ করতে পারে না যে, শব্দটি এখানেই শেষ (মুক্ত, রিক্ত, সিক্ত) বরং শব্দ শেষে যদি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তা হলন্ত উচ্চারণ পাবে, এটাই সত্যি।

৩. বাক্যের মধ্যবর্তী (বিস্ময় বা প্রশ্নবোধক বাক্য ছাড়া) শব্দের শেষ অক্ষর (syllable) পূর্বের অক্ষরের তুলনায় নিম্নগামী হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন, 'চলো আমরা বেড়াতে যাই'— বাক্যের চলো-র 'লো' আমরা-র 'রা' বেড়াতে র 'তে' এবং একাক্ষরিক যাই-এর উপর শ্বাস ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে।

৪. আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো ঙ-দিয়ে কোনো শব্দ আরম্ভ হয় না। যেমন, রঙ, সাতরঙ, সঙ ইত্যাদি। ঙ-এর হসন্তান্তিক রূপ শব্দ শেষের একটি লক্ষণ। ঙ যখন শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হয় (বাঙালি, রঙিন, রাঙা) তখন ধ্বনিটি অন্তঃস্বরীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

৫. মহাপ্রাণ ধ্বনির পূর্ণ মহাপ্রাণতা অক্ষর আরম্ভের বড় বৈশিষ্ট্য। তাই বলা চলে, শব্দের আরম্ভেও অক্ষরের মহাপ্রাণতা পূর্ণতা পেয়ে থাকে।

৬. আহ্, উহ্, ওঃ প্রভৃতি অব্যয়গুলোতে শেষের ধ্বনিটির উচ্চারণ হয় অঘোষ হ-এর মতো (বিসর্গের মতো) ; হ-এর এই অঘোষ উচ্চারণ এ জাতীয় অব্যয়ে শব্দশেষের নিদর্শন।

৭. বাংলায় শব্দের শেষে পাহাড়, আষাঢ় প্রভৃতি শব্দে ড়, ঢ় ব্যবহৃত হয়, ড, ঢ হয় না। অতএব বলা যায়, ড ঢ ধ্বনি দুটো শব্দের সূচনায় এবং ড় ঢ় শব্দ শেষের ইঙ্গিত বহন করে যেমন, সোডা, সডাক ইত্যাদি বিদেশী কিংবা সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্যত্র ড এবং ঢ শব্দের মধ্যে অবশ্য ব্যবহৃত হয় না।

৮. মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঘ, ফ, ধ এবং ভ তাড়নজাত মহাপ্রাণধ্বনি ঢ়-এর মহাপ্রাণতার সম্পূর্ণ লোপ কিংবা চারভাগের তিন ভাগ লোপ শব্দ শেষ হওয়ার লক্ষণ। যেমন, মাছ >মচ্ ; মাঠ >মাট ; সাঁঝ >সাঁজ্ ; আষাঢ় > আষাড় ; লাফ >লাপ ; সাধ >সাদ ইত্যাদি।

৯. বাক্যের ধারাস্রোতের মধ্যবর্তী যতি বা বিরাম (pause) শব্দের সীমা ভাগ করে থাকে। কোনোভাবে বাধা না পেলে কিংবা কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত না করলে বাংলা শব্দের মধ্যে কোথাও যতি পড়ার কথা নয়, কিন্তু যেখানেই যতি পড়ুক না কেনো সেখানেই নির্ধারিত হবে শব্দের সীমানা।

১০. বাক্যে যে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য পায় ধ্বনিতরঙ্গের দিক থেকে তার অক্ষরগুলোও পার্শ্ববর্তী শব্দের অক্ষরগুলোর তুলনায় গুরুত্ব পায় বেশি। যেমন,
তুমি কি করো?
তুমি কি করো।
তুমি কী করো?

এখানে অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী শব্দের অক্ষরের গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে।

১১. বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনি অসংযুক্ত ও হলন্ত হয়ে থাকে। কেবল বিদেশী ভাষা থেকে আগত (ইংরেজি থেকে আগত ব্যাংক, ল্যাম্প, গ্রান্ড ইত্যাদি এবং ফারসি থেকে আগত গঞ্জ, গোস্ত, দোস্ত ইত্যাদি) কয়েকটি ঋণশব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দেখা যায়। বাংলা ভাষায় অন্য কোথাও নয়।

ধ্বনি গুণ

যে কোনো ভাষাকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, তার মূল ধ্বনিতে অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু জলের সাহায্যে সৃষ্ট মহাসাগরের মতোই রাশি রাশি ধ্বনিবিন্দুর সম্মিলনে গঠিত সিন্ধুরূপ ভাষা মানবের প্রয়োজনে নেমে এসে হাজারো ভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তবে সেই ধ্বনিগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা থাকলেও ভাষায় ব্যবহার করলে তারা পারস্পরিকভাবে সমন্বিত হয়ে একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে হয় প্রকাশিত। তাই জীবন্ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া তাকে করে তোলে আরো প্রাণবন্ত, আরো উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তার অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি। এই ভাষাকেই আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে নানাভাবে ব্যবহার করে বেঁচে রয়েছি আমরা, এগিয়ে চলেছি মহাপ্রস্থানের পথ ধরে অচেনা অজানার অন্বেষণে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই ভাষাকেই আমরা কতোভাবে যে প্রকাশ করছি তার হিসেব নেই। ঘুম থেকে উঠেই সুইপারের সাথে একরকম ভাষায় কথা বলি, নাস্তার টেবিলে বসে ঘরের গৃহিণী, ছেলেপুলেদের সাথে আবার যে ভাষায় কথা বলি তা কিন্তু একরকম নয়; তেমনি কর্মস্থানে সহকর্মীদের সাথে, ঊর্ধ্বতন বা অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে, বিকেলে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায়, চায়ের রেস্তোরায়, আবার শিক্ষক, প্রেমিক, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলায় ভাষার বিভিন্নতা সত্যি প্রমাণ করিয়ে দেয় যে, আমরা প্রত্যেকের জীবনপথে কেবল পথিক মাত্র নই, আমরা সুদক্ষ অভিনেতা একেকজন —জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলেছি সারাক্ষণ। ব্যবসাকেন্দ্রের ব্যবসায়ীদের ভাষা, কাগজ-পত্রে ব্যবসা সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের ভাষা, গণিতের ভাষা, ভূগোলের ভাষা, বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্যের ভাষা বিচার করলে এই পার্থক্য সুনিশ্চিত হবে।

তবে এখানে সবটুকু বিচার করলে ভাষাকে মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত হতে দেখা যাবে — প্রথমত ভাষার ধ্বনিগত স্বতন্ত্র রূপ এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জীবন্ত অনুভূতির স্বাক্ষরমণ্ডিত রূপ। ভাষার এই দুটো রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে ধ্বনিগুলোর ব্যবহারের তারতম্য সামান্য পরিমাণে ঘটলেও সেগুলো ধ্বনির স্থায়ী রূপ নয়। কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া, উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণে ঘোষতা-অঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা-মহাপ্রাণতা, উষ্মতা, স্পৃষ্টঘর্ষতা, পার্শ্বত্ব, অনুনাসিকত্ব, তাড়নত্ব, কম্পন ইত্যাদি বিচার করে

তার বিশিষ্টতা নির্ণয় করা হয়। একটি ধ্বনিকে এই বিশিষ্টতা এনে দেবার জন্যে সে ধ্বনিটির যেসব গুণবাচকতা নির্ণয় করতে হয়, তাকে সেই ধ্বনির গুণ বলে ধরে নেয়া হয়। স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, উপস্বরধ্বনি ইত্যাদি প্রত্যেকটি ধ্বনিরই গুণবাচকতা লক্ষণীয়। যে কোনো ধ্বনিকে ভাষা থেকে পৃথক করার ব্যাপারেও এই ধ্বনিগুণ বিশেষভাবে সাহায্য ক'রে থাকে।

ধ্বনি উচ্চারণের স্থান ও প্রক্রিয়াবাচক গুণ

প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও তার প্রক্রিয়া তার স্বতন্ত্র রঙ (colour) ও রূপ (tamber)–কে অন্যান্য ধ্বনিগুলো থেকে পৃথক ক'রে দেয়। এতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, উচ্চারণস্থানের পার্থক্যে একটি ধ্বনি অন্য একটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। আবার উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ব্যবধানবশত সমস্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনি নির্দিষ্ট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এভাবে দেখা যাবে দন্ত্য থেকে উচ্চারিত ধ্বনির নামকরণ হয়েছে দন্ত্যধ্বনি, তেমনি ঠোঁট থেকে উচ্চারিত ধ্বনির নাম ওষ্ঠ্যধ্বনি। দন্তমূল থেকে দন্তমূলীয় পশ্চাৎ তালু থেকে পশ্চাৎ তালব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে এ জাতীয় উচ্চারণস্থানগুলোর ফলে ধ্বনিগুলোর বিশিষ্টতা হয়েছে যথাক্রমে দন্তত্ব, ওষ্ঠতা, দন্তমূলীয়তা, পশ্চাৎ তালব্যত্ব ইত্যাদি। স্থানবাচকতা ধ্বনির পৃথকীকরণজনিত গুণ নির্ণয়ে সহায়ক হলেও তা ধ্বনিগুণের স্থূলতর দিক উদ্‌ঘাটন করে। বরং উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত গুণ এর চেয়ে সূক্ষ্মতর। কেননা উচ্চারণ স্থানের ঐক্য থাকলেও এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে আলাদা হতে পারে। বর্গীয় ধ্বনিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, একবর্গীয় হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি ধ্বনি ঘোষতা, অঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার কারণে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। যেমন ক–বর্গের ক, খ, গ, ঘ চারটি ধ্বনিই স্পর্শধ্বনি এবং এদের উচ্চারণস্থান হলো জিহ্বামূল। তবু ক থেকে খ আলাদা, তার কারণ ক স্বল্পপ্রাণ এবং অঘোষ ধ্বনি, খ–তে অঘোষতা গুণ থাকলেও স্বল্পপ্রাণতার পরিবর্তে মহাপ্রাণতা তাকে ক থেকে পৃথক ক'রে দিয়েছে; তেমনি গ–এর বেলায় দেখা যাবে গ স্বল্পপ্রাণ, কেবল ক–এর অঘোষতার পরিবর্তে সেখানে ঘোষতা গুণের সমন্বয় ক–থেকে তাকে পৃথক করেছে। ঘ–এর বেলায় এই পার্থক্য আরো বেশি, ক এর স্বল্পপ্রাণতা ও অঘোষতার পরিবর্তে ঘ মহাপ্রাণ এবং ঘোষ। ক থেকে যেখানে খ, গ এবং ঘ স্বতন্ত্র, একইভাবে খ, গ ও ঘ কেও বিশ্লেষণ ক'রে একই রকম ধ্বনিগুণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

এই রকম ঘোষতা, অঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা যেমনি বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক, তেমনি স্পর্শতা (উষ্মতা, পার্শ্বত্ব, তাড়নত্ব, স্পৃষ্ট ঘৃষ্টতা, আনুনাসিকত্ব ইত্যাদি গুণগুলোও প্রতিটি ধ্বনিকে প্রতিটি ধ্বনি থেকে পৃথক করার ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ একটি ধ্বনির গুণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্য একটি ধ্বনির গুণগত বৈশিষ্ট্যের অন্ততপক্ষে একটির অভাবে তা পৃথক ধ্বনি বলে গণ্য হবে। ধ্বনির পার্থক্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে এই পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্যি হলেও এর আরো একটি দিক রয়েছে তা হলো, এই ধ্বনিই জীবন্ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে যখন অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে, তখন এই গুণগুলোর অতিরিক্ত অনুভূতিময় রূপ সুষমামণ্ডিত আরেক রকম আত্মিক অভ্যন্তরীণ গুণ। বিশেষ পরিবেশে বিশেষ পরিমণ্ডলে তা বিশেষ থেকে নির্বিশেষ এবং অতীন্দ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়ে আরেক রাজ্য রচনা করে বলে ভাষা হয়ে ওঠে ভাষাতীত যাদুময় অপরূপ সৌন্দর্যের আধার। তাই কখনো তা সহজ, কখনো

জোরালো, কখনো খণ্ডিত, কখনো অখণ্ড, কখনো দোলায়িত তরংগিত, কখনো ক্রোধোদ্দীপক, কখনো স্বপ্নিলতা প্রাপ্ত। এদিক থেকে ভাষার ধ্বনি প্রবাহে দৈর্ঘ্য (length), ঝোঁক (stress), জোর (emphasis), ধ্বনিতরঙ্গ (intonation) কিংবা শ্রুতিদ্যোতকতা (prominence) ইত্যাদি গুণগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

ধ্বনির দৈর্ঘ্য (Length of Sound)

ভাষায় ব্যবহার কালে বক্তার অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যে কোনো ধ্বনি কখনো দীর্ঘতা, কখনো হ্রস্বতা পেতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনিগুলোই সাধারণত ধ্বনির দীর্ঘতার ব্যাপারে বেশি সহায়ক। এটা কেবল বাংলায় নয়, পৃথিবীর সব ভাষাতেই স্বরধ্বনির উচ্চারণগত এই স্থিতিকালের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা লক্ষ্য করা যায় বলে আন্তর্জাতিক বর্ণমালায় প্রতিটি স্বরধ্বনির দীর্ঘরূপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন অ = ; বাংলায় অ-ধ্বনির কোনো দীর্ঘতাসূচক বর্ণ নেই, কিন্তু আন্তর্জাতিক লিপিতে তার সন্নিবেশ আমরা দেখি ১ : দীর্ঘ অ-এর লিপি। তেমনি আ = a এর দীর্ঘ বর্ণ a: এ – e—এর দীর্ঘ বর্ণ e:, ই=i–এর i :, অ্যা = — এর দীর্ঘ বর্ণ æ: ইত্যাদি। স্বতন্ত্র ধ্বনি বা মূলধ্বনি হিসেবে এই দীর্ঘতাজ্ঞাপক ধ্বনিকে স্বীকার না করলেও ভাষায় এই দীর্ঘতা প্রকাশ অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে কারণে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে প্রতিটি স্বরধ্বনির এমনি দীর্ঘতাসূচক বর্ণমালার সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমাদের ভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ভাষায় ব্যবহৃত বা লিখিত ভাষার প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে শেষের অক্ষরে (syllable) চাপ বেশি পড়ায় শব্দের অন্তর্গত শেষাক্ষরটি সবচেয়ে বেশি সময় নেয় তার উচ্চারণে : ফলে সেই শব্দের অন্তর্গত পূর্ববর্তী অক্ষরগুলো হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই, বিচার করে দেখা গেছে। শব্দ মধ্যবর্তী অক্ষরের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে উচ্চারণকালে সময়ের দিক দিয়ে শেষের অক্ষরটি দীর্ঘতম হয় এবং প্রথমটি হয় হ্রস্বতম। অবশ্য স্বরধ্বনির এই দীর্ঘত্ব কখনোই মূলধ্বনিগতভাবে হয় না। অর্থাৎ স্বরধ্বনি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হলেও শব্দের অর্থগত কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। যেমন 'বাড়ি' এই শব্দটিতে ই-কার যুক্ত হওয়ায় যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, ঈ কার যুক্ত করলেও অর্থগতভাবে ঐ একই শব্দের একই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষায়ই তা হয় না। যেমন ইংরেজিতে i (fill-fil), কিন্তু এর দীর্ঘ ধ্বনি অবশ্য বর্ণ হিসেবে ইংরেজিতে নেই i: (feel-fi:l) অর্থগতভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম বলে। এবং i: দুটো পৃথক মূলধ্বনি বলে স্বীকৃত। তবে বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা ইংরেজির এই i এবং i:-র পার্থক্যের মতো না হলেও বাক্যে বক্তার হৃদয়াবেগের অথবা ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনানুগ হয়েই প্রতিটি স্বরধ্বনি ত ধ্বনিমূলগত (phonetic) স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার পরও অসংখ্য পরিমাণের (infinite shades of lenght) দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করে চলেছে।

স্বরধ্বনির সাথে তুলনামূলকভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘতা কম হলেও দেখা যায়, স্পর্শ (plosive) ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে অস্পৃষ্ট (non-plosive) ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘত্ব নানা মাপে ছোট বড় করা যায়। তবে তা কখনোই স্বরধ্বনির মতো নয়। আর ভাষায় ব্যবহারকালে স্বরধ্বনিগুলো শব্দে অনুপ্রবেশ করে যে অপরূপ ধ্বনিতরঙ্গের লীলা সৃষ্টি করে কবিতা, গানে, বক্তৃতায় সেই স্বরধ্বনির দীর্ঘতা হ্রস্বতা আবেগকে ইচ্ছামতো টেনে নিয়ে যে

ভাবরাজ্যের সৃষ্টি করে, আমরা তাতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গভীর অন্তরঙ্গ কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করি বলে স্বরধ্বনির মাধুর্য উপলব্ধিই কেবল করে চলি, বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ কখনো করি না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্তঃস্বরীয় (intervocalic) অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম, শব্দের গোড়াতে তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে দীর্ঘতর, আর শব্দশেষে আসলে হয় দীর্ঘতম। যেমন, বসুক (bosuk) শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি ব, অন্তঃস্বরীয় স এবং শব্দান্তবর্তী হলন্ত ক্ এখানে ব-এর দৈর্ঘ্যের তুলনায় অন্তঃস্বরীয় স-এর দৈর্ঘ্য এই শব্দে স্বল্পতম, এই শব্দের গোড়ার ব-ধ্বনির দৈর্ঘ্য স-এর তুলনায় বেশি এবং শব্দান্তের ক-এর দীর্ঘতা সবচেয়ে বেশি প্রতিভাত হয়। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অমুক্ত থাকায় উচ্চারকের এই অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে মাঝের অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে শব্দান্তের হলন্ত ব্যঞ্জন সবসময়েই দীর্ঘতর হয়ে থাকে। যেমন, সত্পাচ (satpa:c) ; শাক্ভাত (sakbha:t) ; তচ্নচ (tochno:ch) ইত্যাদি শব্দগুলোর অভিনিধানপ্রাপ্ত ত্, ক্, চ্-এর তুলনায় শব্দান্তবর্তী চ, ত ও চ ধ্বনির উচ্চারণে দীর্ঘতার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

এভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

স্বরধ্বনির গুণবাচকতা

স্বরধ্বনির গুণবাচকতার লক্ষণীয় বিষয় হলো, একটি সার্থপর্বে এক বা দুইটি প্রস্বনযুক্ত (stressed) অক্ষর পাওয়া যায়। অর্থের গুরুত্ব কিংবা তারতম্যের বিচারে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং তৎসংযুক্ত স্বরধ্বনিটির উপর প্রস্বন যে পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়, তার বিচারকালে পরিমাপক গুণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা চলে :

(১) জোরালো প্রস্বন (Over loud) : বাক্যের বিশেষ একটি ধ্বনির উপর প্রস্বন পড়লে তা হবে জোরালো প্রস্বন। যেমন —

এ কলম আপনার (e k l m apna:r) — এখানে 'না'-র উপর প্রস্বন পড়েছে।

(২) স্বরধ্বনির অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য (Over long) : দূরত্ব বোঝানোর জন্যে গল্প প্রসঙ্গে আমরা স্বরধ্বনিকে অতিরিক্ত টেনে পড়ি। একে স্বরধ্বনির অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য বলা হয়। যেমন-

রাজকুমার যে-তে যে-তে যে-তে একেবারে দৈত্যপুরে গিয়ে হাজির হলো (razkumar ze:te: ze: te ekeba:re dottopure gi:e: hazir holo) এখানে যে, তে, বা গি, যে-র স্বরধ্বনিগুলোর উপর প্রস্বন পড়েছে।

(৩) তড়িৎ ছাটাই (Over clipped) : ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশ করার জন্যে শব্দান্তের অক্ষরকে যদি 'হ' ধ্বনির সাহায্যে বন্ধ করতে গিয়ে অতিরিক্ত ছাটাই ভাব লক্ষ্য করা যায়, তাকে বলা হবে তড়িৎ ছাটাই। যেমন — নাহ্, আমার যাওয়া হবে না (na h, a:mar zaua h be na:) ।

(৪) সুউচ্চ (Over hight) ; সাধারণ মিড় বা নিচে থেকে কোনো একটি অক্ষরকে উপরের দিকে টেনে তুলবার রীতির নাম সুউচ্চ। যেমন —

মালা তখন অনেক ছোট (mala t khon : nek choto) ।

(৫) সুদৃঢ় (Overtense) : কণ্ঠ্যাগুণপ্রাপ্ত স্বরধ্বনি এবং বিরতির পরবর্তী প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিতে একরকম দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়, ধ্বনিবিজ্ঞানে যার নাম সুদৃঢ় যেমন —

অ-চ্ছা, তবে আসি (a:ccha: tobe a: i)।

(৬) সুবর্তুল (Over round) : আদর এবং স্নেহ প্রকাশের জন্যে যে-কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের বর্তুলাকৃতি লক্ষ্য করা যায়, একে বলে সুবর্তুল। যেমন —

না-না, কাঁদে না (na-na:. kado na:)।

(৭) সুপ্রসৃত (Over front) : মুখ-ভ্যাংচানো বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্যে ঠোঁট বর্তুলাকৃতির মতো হয়ে খানিকটা প্রসৃত হয়, এর নাম সুপ্রসৃত। এতে ধ্বনির পরিবর্তন ও বিকৃত উচ্চারণ লক্ষণীয়। যেমন —

বড্ড লেগেছে (b ddo Legeche) : স্বাভাবিক ভাবে
ব্যড্ড ল্যাগেছে (b :ddo le:geche) ব্যাংগার্থে।

(৮) প্রবল শ্বাস (Over breathed) : এ জাতীয় উচ্চারণ কোনো ধ্বনিতে ঘোষণ ও মহাপ্রাণতার সমন্বয় থাকলে হয়ে থাকে। সাধারণত আকুল আবেদন, কান্নাভরা মিনতি প্রকাশে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন — আল্লাহ্-অ বাচাহ্-অ (a:lla:h baca:h) ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনির দৈর্ঘ্য

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য নির্ণীত হতে পারে, ভাবতে অবাক লাগে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ধ্বনির দৈর্ঘ্য নিরূপণ এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শব্দের শুরুতে যদি স্ক, স্খ, ষ্ঠ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ, স্প্, স্ট, ক্র (ক্), খ্র (খ্), গ্র (গ্), ঘ্র (ঘ্), জ্, ট্ ড্র, ত্র (ত্), থ্, দ্র, ধ্র (ধ্), প্র (প্), ফ্, ব্র, (ব্), ভ্র (ভ্), ম্র, (ম্), শ (শ্), ন্, ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল এবং ম্ল সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে এবং তা যদি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়, তাহলে এই একপ্রাণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো এ পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় দীর্ঘতর হয়ে উচ্চারিত হয়। তবে শব্দের মাঝখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য সাধারণ কথাবার্তায় কিংবা ভাষার আলঙ্কারিক ব্যবহারেও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক (prominent). তাই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এ দৈর্ঘ্য শব্দের শুরুতে যতোখানি পরিলক্ষিত হয়, শব্দের মাঝখানে পরিলক্ষিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. তরল ধ্বনিজাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (র, হ এবং ল-ফলার সাহায্যে সংযুক্তধ্বনি) যেমন— ক্র (অবক্র) ; ক্ল (অকৃত্রিম) ; গ্র (আগ্রহ) ; গ্ল (জাগৃতি) ; ঘ্র (আঘ্রাণ) ; ছ্ব (উচ্ছ্বয়) ; ঙ্খ্ব (উচ্ছৃঙ্খল) ; জ্র (বজ্রাহত) ; ত্র (পুত্রক) ; ত্ব (পিতৃব্য) ; ত্ল (ভদ্রতা) ; দ্র (আদৃত) ; ধ্র (বিধৃত) ; ন্ব (অনৃত) ; প্র (আপ্রাণ) ; ব্র (অব্রাহ্মণ) ; ব্ব (আবৃত) ; ভ্র (পরভৃত) ; ম্র (আম্রকুঞ্জ) ; ম্ব (অমৃত) ; শ্র (আশ্রয়) ; ক্ল (শুক্লপক্ষ) ; প্ল (আপ্লুত) ; ম্ল (অম্লান)

খ. দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন ক্ক (পক্ককেশ) ; ক্খ (সখ্যতা > সক্খতা) ; গ্গ (ভাগ্য > ভাগ্গ) ; চ্চ (উচ্চতা) ; চ্ছ (আচ্ছা) ; জ্জ (লজ্জিত) ;

জ্ঝ (সহ্য > সজ্ঝ) ; টট (অট্টালিকা) ; ড্ড (বড্ড) ; ড্ঢ (বুড্ঢা) ; ত্ত (উত্তাল) ; থ (উত্থান) ; দ্দ (উদ্যান > উদ্দান) ; দ্ধ (উদ্ধার > উদ্দ্ধার) ; প্প (গাল্পিক > গাপ্পিক) ; ব্ব (সব্বাই > সব্বাই) ; ব্ভ (গব্ভ) ; শ্শ (আশ্বাস > আশ্শাস) ; ল্ল (বল্লাম) ; ল্লহ (আহলাদ > আল্লাহ্দ) ; র্র (ছর্রা) ; র্রহ (বর্হ–বর্রহ্বহ) ; ন্ন (কান্নাই) ; ন্নহ (বহ্নি > বন্নিহ) ; ম্ম (সম্মান > সম্মান) ; ম্মহ (ব্রাহ্মণ > ব্রাম্মহণ)।

গ. শব্দ মধ্যবর্তী সমস্থানজাত (homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন — ঙ্ক (ঝঙ্কার) ; ঙ্খ (সংখ্যায় > সঙ্খায় ; ঙ্গ (সঙ্গম) ; ঙ্ঘ (সঙ্ঘ) ; ঞ্চ (বঞ্চনা) ; ঞ্ছ (বাঞ্ছনীয়) ; ঞ্জ (সঞ্জাত) ; ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝাটে) ; ণ্ট (কণ্টক) ; ণ্ঠ (লুণ্ঠন) ; ণ্ড (ব্যয়ুমণ্ডল) ; ন্ত (অন্তিম) ; ন্থ (পান্থশালা) ; ন্দ (চন্দন) ; ন্ধ (বন্ধন) ; ম্প (কম্পন) ; ম্ফ (লম্ফন) ; ম্ব (অবলম্বন) ; ম্ভ (গম্ভীর)।

এবং ল–ফলাজাত তরল ধ্বনি নিঃসৃত এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আপ্রাণ > আপ্/প্রাণ) ; শুক্ল > শুক্/ক্ল ; আশ্বাস > আশ্/শ্বাস ইত্যাদি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে (syllable) পৃথক হয়ে যায় আর এর প্রথম অংশ পূর্ববর্তী অক্ষর এবং দ্বিতীয় অংশ পরবর্তী ধ্বনির সাথে মিশে গিয়ে একপ্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনিটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে উচ্চারিত হয়। এ কারণে এর প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয়গুলো (organs of speech) কিছুক্ষণের জন্যে অর্গলবদ্ধ হয়ে যায় বলে সময়ের দিক থেকে এগুলোর উচ্চারণের কাল পরিমাণই বিশেষভাবে দীর্ঘ, অন্তত তার দ্বিতীয় অংশের তুলনায় দ্বিগুণ। শ্রুতির দিক দিয়েও যেমন তা স্পষ্ট এবং kymograph tracing যন্ত্রেও তা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। পুত্র, পত্র ইত্যাদি শব্দের সংস্কৃত পদ্ধতির বানানে আগের দিনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রক্ষা করা হতো। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমটি দুই অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। স্বাভাবিকভাবে তাই এর প্রথম অংশ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য লাভ করায় দ্বিতীয় অংশ স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘতর হয়ে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় অংশের তুলনায় প্রথম অংশ তাই দ্বিগুণ হয়ে উচ্চারিত হয়।

শব্দের মাঝখানে সমস্থানবর্তী নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অনুনাসিক ধ্বনিটির যেমন, বঞ্চনা > বন্/চনা ; ঝঙ্কার > ঝঙ্/কার ইত্যাদি উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতো অবস্থা হওয়ায় তার কাল পরিমাণও রীতিমতো দীর্ঘ। Kymograph tracing–এর সাহায্যে শব্দ মধ্যবর্তী তিন শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কোন্ প্রথম ধ্বনিটির কাল পরিমাণ দীর্ঘতম তার আংকিক হিসেবও আজকের দিনে করা সম্ভব। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই–এর গবেষণায় বজ্জ, সজ্জ, গদ্য, মিথ্যা প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটির কাল পরিমাণই দীর্ঘতম হয়ে ধরা পড়েছে।

বাংলা কবিতায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনির দৈর্ঘ্য

মুখের কথাই যখন কবিতা, গল্পে, নাটকে অলংকারমণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠে তখন তা মনকে আলোড়িত করে ছন্দময় হয়ে ফুটে ওঠে ধ্বনি তরঙ্গের অভিঘাতে, সেখানে ধ্বনির

দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা সত্যি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কবিতায় তাই ছন্দকে বিশ্লেষণের জন্যে মাত্রার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এই মাত্রার গণনার উপর ভিত্তি ক'রে নামকরণ করা হলো স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। আর এই মাত্রা গণনার পদ্ধতি হলো :

মাত্রবৃত্ত — সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর, হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং দ্বি-স্বরধ্বনির প্রথম স্বর দু'মাত্রা।

স্বরবৃত্ত — সংযুক্ত ও হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং দ্বি স্বরধ্বনির প্রথম স্বর এক মাত্রা, ব্যতিক্রমে দু'মাত্রা।

অক্ষর বৃত্ত — সংযুক্ত ও হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং দ্বিস্বর ধ্বনির প্রথম স্বর শব্দের শেষে সর্বদাই দু'মাত্রা এবং শব্দমধ্যে কিংবা শব্দের শুরুতে সাধারণত একমাত্রা, তবে ব্যতিক্রমে দু'মাত্রাও হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলা ছন্দের বিভিন্ন নামকরণ এবং তার বৈচিত্র্য সবটাই হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সংযুক্ত, ব্যঞ্জনধ্বনি বা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর কিংবা দ্বিস্বরধ্বনির শেষ স্বরধ্বনিটির ব্যঞ্জনান্তিক ব্যবহার সবটার বেলায়ই এই একই প্রক্রিয়ার লীলাখেলা দেখা যায়। এ রকম হলন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বরে পাঠের স্টাইল অনুযায়ী টেনে পড়ার সুযোগ থাকে। তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ রকম হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিজনিত বদ্ধাক্ষরকে মুক্তাক্ষরের তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া যায়, তাই বদ্ধাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে দু'মাত্রা গণনার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তাক্ষর হয় একমাত্রা। কিন্তু ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্তে সর্বদাই একমাত্রা—মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরে কোনো পার্থক্য রক্ষিত হয় না। অক্ষরবৃত্তে দেখা যাবে, পড়ার ভঙ্গির জন্য এসব ক্ষেত্রে শব্দের শেষে দু'মাত্রা এবং শব্দের আদিতে ও মধ্যে একমাত্রায় পর্যবসিত হয়। এভাবে বিচার করলে অবশ্য দেখা যাবে, স্বরধ্বনিকে কেন্দ্র ক'রেই মাত্রার হিসেব রক্ষা করা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সত্যিই কোনো ভূমিকা নেই। বাংলায় মুক্তাক্ষরে স্বরধ্বনিই মাত্রার ধারক, আর বদ্ধাক্ষরে শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনান্তিক হয় বলে তার পূর্বস্বরই হয় মাত্রার বাহক। সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির স্থায়িকাল থাকলেও মুক্তাক্ষরে ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির এবং বদ্ধাক্ষরের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির স্থায়িত্বকাল কমবেশি হয়ে ধরা পড়ে আমাদের কানে। এ কারণে প্রতীয়মান হয় ধ্বনির যে স্থিতিকাল, তার সবটাই যেনো স্বরধ্বনির, ব্যঞ্জনের কোনো ভূমিকা নেই সেখানে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই ভুল ধরা পড়ে। তাতে দেখা যাবে, ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত পাশপাশি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে চলেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবিতায় বা স্বাভাবিক কথাবার্তায় ব্যঞ্জনধ্বনির স্থিতিকালের (length of duration) শব্দ মধ্যবর্তী যেসব সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটির প্রথমাংশে তা হলো — ক্র (ক্), গ্র (গ্), খ (খ্), ত্র (ত্), জ্র (জ্), দ্র (দ্), ধ্, ন্, প্র, ব্র (ব্), ভ্র, ম্র (ম্), শ্র, ক্ল, গ্ল, ম্ল।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনের প্রথমটিতে ক্ক, ক্খ, গ্গ, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, জ্ঝ, ট্ট, ড্ড, ড্ঢ, ত্ত, ত্থ, দ্দ, দ্ধ, প্প, ব্ব, ব্ভ, শ্শ, ল্ল, ল্হ, র্র, র্হ, ন্ন, ন্হ, ম্ম, ম্হ।

মহাপ্রাণজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনের প্রথম নাসিক্য ধ্বনিটিতে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ। এ ছাড়া শব্দের অন্তর্গত দুই

স্বরধ্বনির পাশপাশি অবস্থিত অভিধানপ্রাপ্ত অযুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটিতে কৃত (রক্ত > রকৃত) ; দগ (উদ্গার) ; পৃত (রপ্ত > রপৃত) ; কদ (বাক্‌দণ্ড)।

উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি ক'রে এইসব সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয়ে থাকে। আবৃত্তিতে কবিতার প্রতিটি ধ্বনি সুস্পষ্টভাবে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে বলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বর্গীয় রুদ্ধাবস্থায় থাকায় তাদের উচ্চারণ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে বলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির স্থিতিকালের দৈর্ঘ্য পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনিটির দৈর্ঘ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, তার পরবর্তী ধ্বনির দ্বিগুণ আর দ্বিত্বপ্রাপ্ত অস্পৃষ্ট ধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্যও পরবর্তী ধ্বনিটির দ্বিগুণ না হলেও তার কাছাকাছি ; কারণ এর উচ্চারণে দেখা যায়, উচ্চারকেরা ফুসফুসতাড়িত বাতাস বের হয়ে যাবার পরও বেশ খানিকক্ষণ তদ্‌গত অবস্থায় থাকে। একইভাবে দেখা যাবে শব্দের মাঝে না হয়ে যদি শব্দের অন্তে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, তাহলে শব্দের অন্যস্থানে অবস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের তুলনায় তা আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতর হয়ে থাকে। যেমন আসুক, নামুক, যাক, মান্ ইত্যাদি শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে এই দীর্ঘতার পরিচয় অনায়াসে অনুমেয়।

ঝোঁক

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় stress, তারই নাম ঝোঁক। ধ্বনির দৈর্ঘ্য যেভাবে ধ্বনিকে গুণান্বিত করে, ঝোঁক ঠিক একইভাবে ধ্বনিকে গুণময় করে তোলে। এই ঝোঁককে আরো অনেক নামে ডাকবার প্রয়াস দেখা যায়। শ্বাসাঘাত, প্রশ্বন, প্রচাপন, বল ইত্যাদি। বক্তা যখন ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়ে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তখন কোনো কোনো শব্দ বা শব্দের অন্তর্বর্তী অক্ষরের উপর জোর পড়ে বেশি। অনেক সময় কেবলমাত্র একটি অক্ষর কিংবা শব্দ নয়, কয়েকটি অক্ষর বা কয়েকটি শব্দের উপর জোর পড়তে পারে। এই শ্বাস-ক্ষেপনের জোরটুকুর নামই ঝোঁক বা stress বা accent. বক্তার অনুভূতির তারতম্যের কারণে শ্বাস-ক্ষেপনের বেগেরও তারতম্য হতে পারে। এই ধ্বনি বা অক্ষরের (syllable) প্রচাপন গুণ যতো না শ্রুতিগ্রাহ্য, তার চেয়েও বেশি ক'রে বক্তার সক্রিয় প্রয়াসজাত ('—a subjective activity of the speaker')। তাই অনুভূতির প্রকাশক ভাষা ব্যবহারে চোখ-নাক-মুখ উঠনামা বা খিচবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর এমন অনেক ভাষা আছে যেখানে দেখা যাবে, শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন হলে শব্দের অর্থ পর্যন্ত পাল্টে যেতে পারে। অর্থাৎ একই শব্দের এক ধ্বনিতে ঝোঁক বেশি বা কম হলে তার যা অর্থ থাকবে এই ঝোঁক পরিবর্তিত হয়ে ঐ একই শব্দের অন্য ধ্বনির উপর পড়লে তার অর্থ যাবে পাল্টে।

Présent (´Prozent, n)	I´mport (impó: t,n)
Pre´sent (Prizént v)	Impórt (impo:´tv)
In´crease (ink´ri:s, n)	I´nsult (insult, n)
In´Creaso (in kri : s v)	In´sult (in sAlt, v)

এই রকম শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের পরিবর্তন যদি কোনো ভাষায় ব্যাপকভাবে দেখা যায় সেই ভাষাকে বলা হয় শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা বা 'stress languase' যেমন, ইংরেজি, গ্রিক, জার্মান, স্পেনিশ, সোয়াহিলি ইত্যাদি ভাষা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা।

এই শ্বাসাঘাত পরিবর্তন হওয়ার কারণ হলো অনুভূতির গভীরতা বা বৈপরীত্য (contrast) সৃষ্টি করে মনোভাবকে সুষ্ঠুভাবে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়া। বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে কোনো একটি শব্দের অর্থ যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে পার্শ্ববর্তী শব্দ বা শব্দাবলীর তুলনায় সেই শব্দের উপর ঝোঁক পড়ে বেশি। এভাবে বাক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে শব্দের নির্ধারিত শ্বাসাঘাত কখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়, কখনো স্থান পরিবর্তন করে, আবার কখনো বা বেশি করে পড়ে।

আমাদের ভাষায় অবশ্য শ্বাসাঘাতের এই স্থান পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন তেমন দেখা যায় না। তাই বাংলা ভাষা কোনো মতেই শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষার পর্যায়ে পড়ে না। এতে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন কেবল আবেগ-অনুভূতি তথা ভাষার অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দের অর্থকে কেবলমাত্র প্রাধান্য দেবার কারণেই এই ঝোঁক আমাদের ভাষার অলংকার এবং এই অর্থে গভীরতা বা প্রাধান্যের কারণে আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত কোনো কোনো অর্থ (ব্যাংগার্থ, রূপকার্থ, সৌন্দর্যার্থ) যদি প্রকাশ হয়েই পড়ে, তা বাংলা ভাষার সৌন্দর্যবর্ধক হবে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। যেমন, ভালোবাসা শব্দটির সাধারণ অর্থ প্রকাশ করলে এর প্রতিটি অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের যে স্বাভাবিক ঝোঁক, যখন ভালোবাসার অর্থ বিশ্বজনীনভাবে স্বীকার করে নিয়ে এর আনন্দময় গৌরব অর্থ প্রকাশ করা হবে, তখন ভা-এর উপর স্বাভাবিকভাবে ঝোঁক পড়বে বেশি এবং আবার যখন ভালোবাসার খারাপ অর্থ প্রকাশ করে নিষেধ করার অর্থ প্রকাশ পাবে তখন এই ঝোঁক পরিবর্তিত হয়ে পড়বে সা-এর উপর। সূক্ষ্মভাবে তা বিচার করলে এই অর্থগত পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। তবে তা ইংরেজি, জার্মান, স্পেনিশ ভাষার মতো নয় বলে বাংলা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়।

অবশ্য বাংলার আঞ্চলিক রূপে কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় আভিধানিক পর্যায়ে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রচলন লক্ষণীয়। খুব প্রবল না হলেও এই শ্বাসাঘাত একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতায় শ্যামবাজারীদের ভাষায় এই শব্দের প্রথম অক্ষরের ঝোঁক কানে বাজবার মতো। হাত, মাথা, মশাই, মোসাহেব, মনোরঞ্জন প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। স্বতন্ত্র শব্দের এরকম ঝোঁক বাক্যে এসে অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, অনেক সময় ভাবার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোনো শব্দে কোনো পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দের তুলনায় বেশি প্রবল হয়ে প্রাধান্য পেতে পারে। 'কোথা থেকে আসছো' এই বাক্যের ব্যবহারকালে তার পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষণীয়, সেখানে 'আসছো' শব্দের উপর ঝোঁক বেশি পড়বার কথা এবং 'কোথা থেকে', দ্রুত উচ্চারণে আন্বিত হয়ে 'কোত্থেকে' হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এভাবে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পরিবর্তনে ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে অর্থাৎ কথার সাথে মনের, মনের সাথে অনুভূতির, অনুভূতির সাথে বক্তার মানসিক অবস্থার সবটুকু ছবি ভাষায় এভাবে চিহ্নিত হয়ে চলেছে। 'কোথা থেকে আসছো' আর 'কোত্থেকে আসছো' দুটো বাক্যের অর্থগত পরিবর্তন তেমন না থাকলেও একটিতে বক্তার মানসিক চিত্রের স্বাভাবিকতা, অন্যটিতে গতিময়তা (fastness) নিঃসন্দেহে প্রকাশ পায়।

এভাবে বিচার করলে বাংলা ভাষা ইংরেজি বা জার্মান ভাষার মতো শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা না হলেও শ্বাসাঘাতের প্রচলনের অভাব এতে কোনো মতেই নেই। শুধু বাংলা কেনো, জাপানি, মারাঠি, হিন্দি ইত্যাদি যে ভাষাগুলো শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়, কিংবা যে কোনো ভাষা বা জীবন্ত মানুষের মুখের ভাষা, যাতে সেই জীবন্ত মানুষের প্রাণের স্পর্শ থাকবেই থাকবে, আর তাতে ক'রে ভাষার অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে মানবহৃদয় স্পন্দিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। অনড়, অচল মানুষও কথা বলার সময় প্রাণের আবেগজাত 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' ছড়িয়ে দেয় তার মনোভাবকে অন্যের কাছে, সেখানেও এক অন্তরের ছোঁয়া লাগার প্রশ্ন থাকে অন্য অন্তরে। এভাবে নিশ্বাস বায়ু সঞ্চারিত হয়ে আবেগ আকুল আবেদনে ভাষার শব্দকে, অক্ষরকে, ধ্বনিকে আশ্চর্যরকম স্পর্শিত ক'রে তোলে বলে ভাষা জীবন্ত মানুষের সাথী, সহচর এবং বন্ধু ; এবং সবচেয়ে প্রিয়তম সঙ্গী সারা জীবনের।

ধ্বনি তরঙ্গ

ধ্বনি তরঙ্গ যার ইংরেজি হচ্ছে intonation. Ida Ward ১৯৪৪ সালে 'The Phonetics of English' গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'Intonation in the term given to the rise and fall is the pitch of the voice in speeeh. Change in pitch is due to differing rates of vibration of the vocal cords.' অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের মুখে ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে যে ভাষার ব্যবহার হয় উচ্ছ্বাস কিংবা ভাবকে সুপরিস্ফুটিত ক'রে তুলবার জন্যে সেই ভাষায় যে ছন্দ রাগ, ক্রোধ, আবেগ, হিল্লোল বা ওঠনামার সৃষ্টি হয়, তারই নাম ধ্বনি তরঙ্গ। ভাবের অধীনে এসে বাক-প্রবাহে যে ধ্বনি তরঙ্গ ভঙ্গের সৃষ্টি করে ধ্বনি তরঙ্গ বলতে আমরা তাকেই বুঝি। নদীর দুটি রূপ আছে — এক হলো, যখন প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সাক্ষী হয়ে যখন সেও নিস্তরঙ্গ অবস্থায় বিরাজ করে ; আর অন্যটি হলো যৌবনমদে মত্ত হয়ে প্রকৃতির সেই শান্ত সমাহিত রূপের পরিবর্তে এক বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করার ফলে নদীবক্ষে সৃষ্ট হয় এক অশান্ত বুভুক্ষ চঞ্চলতার — আরেক অশান্ত রূপ।

ঠিক তেমনি ভাষার মধ্যেও দুটো রূপের সন্ধান দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যখন ভাষার ব্যবহার হয় তখন সেই ভাষা নিস্তরঙ্গ শান্ত নদী স্রোতের মতো ; কিন্তু আবেগ চঞ্চল আঘাতে, ক্রোধের অশান্ত ধাক্কায় এবং উন্মত্ত ভাব প্রকাশে এই একই ভাষা যে বিক্ষুব্ধ নদীপ্রবাহের রূপ পরিগ্রহ করে, ভাষার সে-ও এক রূপ। যে কথা বলায় প্রেমিকের হৃদয়-মন মথিত হয়ে এক অপরূপ নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি হতে পারে সেই ভাষার কেবল ধ্বনি তরঙ্গের পার্থক্যে তাদের দারুণ কলহের সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ঝগড়ার সময়, কলহের সময়, বিবাদের সময় যে ভাষার ব্যবহার হয়, তা স্বাভাবিক কথাবার্তার ভাষা থেকে কেবলমাত্র ধ্বনি তরঙ্গ বা intonation এর পার্থক্যবশতই সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধ্বনি তরঙ্গ বা intonation ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আঁকড়ে ধরে বিরাজ করছে, ভাষায় লিখিত তার চিহ্ন খুব বেশি প্রকাশিত না হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই একটি নাটক পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায়, দর্শনে তার আনন্দ বেড়ে যায় সহস্রগুণ। কেননা পড়বার সময় ধ্বনি তরঙ্গের অদৃশ্য উচ্চারণ পাঠকের মনে থাকলেও তার যথার্থ উচ্চারণ সম্বলিত মঞ্চায়িত নাটক অনেক গুণ

বেশি আনন্দ দিতে সক্ষম, কারণ জীবন্ত মানুষের মুখে 'একটানা নিশ্বাসের সাহায্যে শব্দগুলো লেখ্য পংক্তির মতো কিংবা বলাকার শ্রেণীর মতো লম্বমান রেখা টেনে এগিয়ে যায় না। নিশ্বাসের ভাঙাচোরায়, ভাবের ওঠানামায় শব্দগুলোও তরঙ্গিত হয়ে এগিয়ে চলে। বাক্-প্রবাহের এ স্পন্দনই ভাষার প্রাণ, তার জীবন্ত (anima-voce) রূপ।

... জীবন্ত মানুষের ভাষায় নিশ্বাসের কিংবা ভাষাবেগের নিয়মিত ওঠানামাজনিত সমমাপের ব্যবধান তথা rhythm বা ছন্দস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সমমাপের সংগঠিত এ ব্যবধান, অন্য কথায় rhythm বা ছন্দস্পন্দনই বাকস্রোতকে প্রাণবন্ত করে ধ্বনিতরঙ্গ বা intonation-এর সৃষ্টি করে।[১]

পৃথিবীর সব ভাষায় বাক-প্রবাহের বিশ্লেষণে দেখা যাবে, ধ্বনিগুলো কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, আবার কোথাও মাঝামাঝি স্বরগ্রামে বাক্যের সূচনা করেছে। অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং এই স্বরিত স্বরগ্রামে বাক্যগুলো ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে জীবন্ত মানুষের প্রিয়তম আসন অধিকার করেছে সর্বত্র। তাই যে কোনো ভাষার এই ধ্বনি তরঙ্গের বিশ্লেষণ ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার। একই বাক্য কেবলমাত্র প্রয়োগের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন অর্থবোধক মূলধ্বনির অতিরিক্ত মূলধ্বনি-ভিত্তিক (supra segmntal) একাধিক ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন —

(ক) সে স্কুলে গেছে।

(খ) সে 'স্কু—লে' গে-ছে?

(গ) সে 'স্কুলে' গেছে —

(ঘ) সে- 'স্কু লে' গেছে —

(ঙ) সে 'স্কুলে' গেছে—

এখানকার ক-বাক্যটি সাধারণভাবে স্বাভাবিক পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট বাক্যটির অর্থ প্রকাশক। খ-বাক্যে বক্তা সাধারণভাবে সন্দেহজনিত প্রশ্ন উত্থাপক। গ-বাক্যে স্কুলে যাওয়া যেনো এই বাক্যের কর্তার পক্ষে অস্বাভাবিক এই অর্থ প্রকাশ করছে। ঘ বাক্যেও খানিক আশ্চর্য-ভাব উহ্য থাকলেও তা মোটামুটি গ বাক্যের মতো কৌতূহল উদ্রিক্তময় এবং ঙ-বাক্যে কর্তা অন্য কোথাও নয়, স্কুলেই গিয়েছে এই অর্থের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এভাবে একটি বাক্যের কোনো একটি শব্দ বা অক্ষরবিশেষের উপর তার সন্নিহিত অন্যান্য পার্শ্ববর্তী শব্দ বা

---

১ মুহম্মদ আবদুল হাই। ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব:

অক্ষরের তুলনায় আপেক্ষিক জোর (emphasis, weight), ঝোঁক কিংবা দৈর্ঘ্যের আরোপে মূলধ্বনির অতিরিক্ত মূলধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলশ্রুতি নানাবিধ ধ্বনি তরঙ্গ।

বাংলা ভাষায়ও বক্তার মনোভাবের ওপর ভিত্তি করে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, ঠিক পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতোই। অবস্থাভেদে যেমন হয় তা উদাত্ত, কখনো বা অনুদাত্ত, আবার কোথাও কোথাও স্বরিত স্বরগ্রামে সূচিত হয় বাংলা বাক্য। অন্যান্য ভাষার অনুরূপ এর ব্যতিক্রম আমাদের ভাষায়ও প্রচুর রয়েছে। তবু সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষের বাক প্রবাহে বাংলা বাক্যের স্বরূপ নির্ণয় করলে দেখা যাবে, তা সাধারণত শুরু হচ্ছে মাঝামাঝি স্বরগ্রামে কিন্তু একটি জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে, তা হলো, এই মাঝামাঝি স্বরগ্রামে আমাদের বাক্য শুরু হলেও উঁচু, নিচু আর সমতল মিড়ের অবকাশ তাতে থেকে যায়। বাংলা বাক্যের পরিবেশ, অর্থ আর ভাবগত এই অগণিত তরঙ্গ–ভঙ্গির অবকাশ থাকলেও দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে মোটা ছয়েক অতিরিক্ত মূলধ্বনিভিত্তিক (supra segmental phoneme) রেখাভঙ্গি (contour) কে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে তার ভিত্তি। এই রেখা–ভংগি অবার আবর্তিত হয় যে চারটি স্বরগ্রামের মধ্যে, তা হলো উদাত্ত, অনুদাত্ত, নিম্ন–উদাত্ত, উচ্চ–অনুদাত্ত। এর প্রতিটিতে আবার আরোহণ, অবরোহণ, এবং সমতলমুখী রেখাভঙ্গির অবকাশ থেকেই যায়। এইভাবে বাক্য হয়ে ওঠে জীবন্ত মনুষের মনোভাবের সবচেয়ে বড় বন্ধু, সহচর এবং সঙ্গী। তাই লোকে বলে, 'কথায় চিঁড়ে ভেজে' — এই কথাটা মানুষের বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় অটুট করে তোলে ; আবার এই কথাই মানুষকে করে তোলে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

মিড়

মিড়ের ইংরেজি নাম pitch. উপরের আলোচনায় কথা শুরু করার সময়ে স্বরগ্রামের কোন্ কোন্ পর্যায়ে কোন্ শব্দ বা অক্ষরের ব্যবহার হয় তা খানিকটা আভাষ দেয়া হয়েছে এবং সেখানে শব্দের উঁচু পিচ (high tone), নিচু–পিচ (low tone), মধ্য–পিচ (level tone) সম্পর্কেও খানিকটা আভাষ দেয়া হয়েছে। তাই pitch বা মিড় হচ্ছে, গানের সুরের তালে তালে ওঠানামার মতোই ভাষায় বাক্যে শব্দ বা অক্ষরের ওঠানামার মাপ। ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করতে গিয়ে কিংবা তার প্রকৃতি বিচারে এই মিড় বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে থাকে। আর এ কারণেই মিড়কে ধ্বনিগুণের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

কথার স্বরগ্রামের (tone) অবস্থানের বিভিন্ন পর্যায় (উদাত্ত বা high, অনুদাত্ত বা low এবং স্বরিত বা mid) সম্পর্কে সংস্কৃতেও বহু আলোচনা রয়েছে। বিশেষত কাব্য বিচারের মাপকাঠি হিসেবে এর প্রয়োগ দেখা যেতো। সেখানেও কাব্যালংকারের চুলচেরা বিশ্লেষণে মিড়ের গুরুত্ব একেবারে কম ছিলো না।

Accession No. 18375

গ্রন্থপঞ্জি

১. Leonard Bloomfield : *Language*, 1993.

২. John B. Carrol *The Study of Language*, Harvard University Press, 1963.

৩. A. A. Hill : *Introduction to Linguistic Structures*, New York, 1958.

৪. C. F. Hockett : *A Course in Modern Linguistics*, N. Y. 1958.

৫. Leonard Robart Palmer : *An Introduction to Modern Linguistics*, London, 1939.

৬. W. S. Allen : *Phonetics in Ancient India*, Oxford University Press, 1953.

৭. H. A. Gleason : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, New York. 1955.

৮. Siddheswar Varma : *Critical Study in the Phonetic Observation of Indian Grammarians*, London, 1929.

৯. S. K. Chatterji : *The Origin and Development of the Bengali Language*, VII, Calcutta 1926.

১০. M. A. Hai and J. W. Bull : *The Sound Structures of English and Bengali*, Dacca University, 1961.

১১. Ida Ward : *The Phonetics of English*, 1960.

১২. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ১৯৬২।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বাংলা ভাষা পরিচয়*।

১৪. মুহম্মদ আবদুল হাই : *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, ৩য় সং, ১৯৭৫।

১৫. ড. সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত*।

১৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : *ব্যাকরণ মঞ্জুরী*।

১৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ১৯৭৩।

১৮. আহীদ মজুমদার : *ভাষাতত্ত্ব*।

১৯. রফিকুল ইসলাম : *ভাষাতত্ত্ব*।

২০. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড।

২১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা*।